# অমর ভারত

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়

প্রকাশক—
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার বি. এ., বি. টি.
সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
২২নং রমানাথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট, বেলুড়
পোঃ বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া ( পশ্চিম বঙ্গ )



প্রথম প্রকাশ—১৩৬০—১১০০

মূল্য আড়াই টাকা মাত্র

## পুস্তক প্রাপ্তির স্থান

১। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

২। মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৩। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
১০৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

৪। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রিণ্টার—শ্রীবামাচরণ মণ্ডল
রাণীশ্রী প্রেস
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা

# নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে সুদীর্ঘ সাতাইশ বৎসর অবস্থান কালে আমাকে ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের প্রধান প্রধান সহরে প্রবাস ও ধর্মপ্রচার করিতে হইয়াছে। মহীশূর, রেঙ্গুন, কলম্বো, লাহোর, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি সহরস্থ রামকৃষ্ণ আশ্রমে থাকিবার সময় ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ ইংরাজীতে ও বাংলায় লিখিয়া বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম তন্মধ্যে চৌদ্দটী প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইল। কোন্ প্রবন্ধ কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে রচিত হইলেও উহাদের সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন হয় নাই। এই প্রবন্ধ-সমূহে ভারতের অমরত্ব বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচিত। সাত, আট ও এগার অধ্যায়ত্রয় ১৩৬০ সালে রচিত। পরিশিষ্টে যে চারটী প্রবন্ধ প্রকাশিত তন্মধ্যে প্রথম দুইটী পূর্বে ও শেষ দুইটী সম্প্রতি লিখিত। ভারত-প্রশস্তিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু, ঋষি অরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, অরেল স্টাইন, মহম্মদ ইকবাল ও উইল ডুরাণ্টের অভিমত উদ্ধৃত। 'ভারত-তীর্থে' অমর ভারতের স্বরূপ সম্বন্ধে যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ স্বামীজির উক্তিনিচয় সংগৃহীত।

পরাধীন ভারতে অধিকাংশ প্রবন্ধাবলী রচিত হইলেও স্বাধীন ভারতে উহাদের মূল্য বিশেষ হ্রাস পায় নাই। রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেও আমরা অদ্যাপি সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পাই নাই; আমাদের পাশ্চাত্য-মোহ এখনও কাটে নাই। আরো পরিতাপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাব্রতী, সমাজ-সংস্কারক ও ধর্মপ্রচারক এখনো পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত, এবং ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী বর্জিত। পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও শিক্ষাদির প্রতি গভীর অনুরাগহেতু ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ।

সেইজন্য দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক জাগরণ আবশ্যক। সাংস্কৃতিক জাগরণ না আসিলে ভারতীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইবে না। ভারত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আমরা যতই হৃদয়ঙ্গম করিব ততই আমরা প্রকৃতিস্থ হইব, আত্মস্থ হইব, খাঁটী ভারতীয় হইব। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সাংস্কৃতিক জাগরণে কিঞ্চিৎ সহায়ক হইলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে!

এই পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশনে আমার প্রধান সহযোগী ছিল বেলুড় হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার বি. এ., বি. টি.। তাহার আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে বর্তমান ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ক্ষীণ দৃষ্টি লইয়া এই পুস্তক প্রণয়ন বা প্রকাশন সম্ভব হইত না। এখন এই গ্রন্থ বাংলার তরুণ-তরুণী কর্তৃক পঠিত ও আদৃত হইলেই আমার সব শ্রম সার্থক হইবে। ইতি—

স্নানযাত্রা দিবস<br>আষাঢ়, ১৩৬০

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ<br>বেলুড়

# সূচী


| বিষয় | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ভারত-প্রশস্তি | ... | .... | ।৵০ |
| এক—ভারত-তীর্থ | .... | .... | ১ |
| দুই—প্রবুদ্ধ ভারত | ... | ... | ১৪ |
| তিন—ভারতের জাতি ও রাষ্ট্র | .... | .... | ৪৪ |
| চার—হিমালয় ও ভারত সংস্কৃতি | ... | ... | ৫৩ |
| পাঁচ—ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞান | .... | .... | ৬১ |
| ছয়—ভারতের সঙ্গীত | .... | .... | ৬৮ |
| সাত—বৈদিক ভারত | .... | .... | ৮০ |
| আট—ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণ | .... | ... | ৯৬ |
| নয়—ভারতের সাধনা | ... | ... | ১০৭ |
| দশ—ভারতের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য | .... | .... | ১১৮ |
| এগার—ভারতের ভবিষ্যৎ | .... | .... | ১৭২ |
| পরিশিষ্ট | | | |
| এক—পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার | .... | .... | ১৮৩ |
| দুই—পাণিহাটী তীর্থে | .... | ... | ১৯৪ |
| তিন—ক্ষিপ্রেশ্বরী দেবীদর্শনে | .... | .... | ২০৭ |
| চার—ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ | .... | ... | ২১৭ |

# ভারত-প্রশস্তি

( ১ )

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি।
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি॥
ধরিতে দরিদ্র বেশ শিখায়েছ বীরে।
ধর্ম-যুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে॥
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগ-যুক্ত চিতে॥
সর্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার॥
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে॥
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল।
সম্পদের পূণ্য কর্মে করেছ নির্মল॥
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে।
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

( ২ )

ভারত ছিল আমাদের জাতির মাতৃভূমি। সংস্কৃত ছিল ইউরোপের ভাষাসমূহের জননী। আমাদের দর্শনেরও জননী ছিলেন ভারতবর্ষ।

আরবদের মাধ্যমে আমাদের অধিকাংশ গণিত ভারত হইতে আনীত। খ্রীষ্টান ধর্মে যে সকল নৈতিক আদর্শ বিমূর্ত বুদ্ধের মাধ্যমে তাহাদের জননীও ভারত। গণতন্ত্র ও স্বায়ত্ত শাসনের আদি উৎস প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ। ভারত মাতা নানা দিক দিয়া আমাদের সকলের জননী।

—মার্কিন মনীষী উইল ডুরাণ্ট

( ৩ )

উত্তরে মধ্য এশিয়া হইতে দক্ষিণে উষ্ণ মণ্ডলবর্তী ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এবং পারস্যের সীমান্ত হইতে চীন ও জাপান পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রাচীন এশিয়ার ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতই উহার সভ্যতার বিকিরণ কেন্দ্র। এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশে বিক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতিসমূহের উপর ভারতীয় ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য গভীর রেখা করিয়াছে।

—স্যার অরেল স্টাইন

( ৪ )

ভারত আমার, ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র।<br>
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থ-ক্ষেত্র॥<br>
দিয়াছ মানবে জগৎজননী দর্শন উপনিষদে দীক্ষা।<br>
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম ভক্তি ধর্ম শিক্ষা॥

ভগবদ্‌গীতা গায়িল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে
ভগবৎপ্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে ॥
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম।
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল সোঽহং ধর্ম ॥
আর্য ঋষির অনাদি গভীর উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র।
নহ কি মা তুমি সে ভারত ভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র ?
তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্মে চলে যাব শির করিয়া উচ্চ।
যাঁদের গরিমময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ ॥
ভারত আমার ভারত আমার সকল মহিমা হউক খর্ব।
দুঃখ কি মা যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব ॥
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ লুপ্ত হয় এ মানব বংশ।
যাদের মহিমময় এ অতীত তাদের কখনো হবে না ধ্বংস ॥
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ।
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ ॥
এ দেব-ভূমির প্রতি তৃণ পরে আছে বিধাতার করুণা দৃষ্টি।
এ মহাজাতির মাথার উপর করে দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি ॥
ভারত আমার ভারত আমার কে বলে তুমি মা কৃপার পাত্রী।
কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ॥

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

( ৫ )

মেরা সোনেকী হিন্দুস্থান।
তুঁ হামারা দিলকি রোশনি, তুঁ হামারা জান ॥
চারু চন্দা তপন তারা উজল আশমান।
তেরি ছাতি পর ডোরত ক্যায়সে হাওয়াসে সোনেকি ধান ॥
তেরি কুঞ্জমে ফুটত ফুলুয়া, পক্ষী গাওয়ত গান।
তেরি ক্ষেত্রপর শ্যামল তরুয়া ছায়া করত দান ॥
যুগযুগান্ত তেরি তপোবন পর কতহুঁ ধর্ম বাখান।
বিমান কম্পই উঠত গীতিহু গভীর ওঙ্কার তান ॥
অবহি ভারত পর হস্ত গত বিহীন বীর্য যশমান।
সোহি দরশ কিয়া দিনহুঁ রাতিয়া ঝুরত মেরা নয়ান ॥

—জনৈক হিন্দি কবি

( ৬ )

ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।
তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা ॥
( সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ) ॥
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে, আমার জন্মভূমি ॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে
( ও তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে )

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র-পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
( এমন ) ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ॥
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী।
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে ॥
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ।
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমি ধরি ॥
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।
এমন দেশেটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

( ৭ )

সারে জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা।
হাম বুলবুলেঁ হ্যায় ইস্‌কি, ইয় গুলিস্থান হামারা ॥

পর্বত উয়ো সবসে উঁচে হামসায় আশমান কা।
উয়ো সন্তরি হামারা, উয়ো পাসবাঁ হামারা ॥
গোদিমে খেলতি হ্যায় ইসকি হাজারোঁ নদীয়াঁ।
গুলসান হ্যায় জিসকি দমসেঁ, রসকি জাহাঁ হামারা ॥
মজব নহি শিখাতা আপসমে বইর রখনা।
হিন্দী হ্যায় হাম বতন হ্যায় হিন্দুস্থান হামারা ॥

—মহম্মদ ইকবাল

( ৮ )

ভারতে বিশিষ্ট ভাবধারা চরম সত্যের সহিত সুদীর্ঘ সংযোগের ফলে উৎপন্ন। জৈন বা মুসলমান বেদ ও উপনিষদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করে না; কিন্তু উভয়ে বৈদিক সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। হিন্দুর ন্যায় জৈন ও মুসলমান সমাজে পারিবারিক প্রীতির সম্যক্ সমৃদ্ধি, সামাজিক পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং বিবেক ও প্রবণতার মধ্যে নৈতিক সংঘর্ষের অধীনে সমগ্র জীবন সমর্পণের স্বীকৃতি ভারতে পরিদৃষ্ট হয়। এক কথায়, ভারতের সর্বজাতি ধর্মশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত। কারণ, গীর্জার সম্বন্ধ প্রধানতঃ হৃদয়ের সহিত। যখন মিশর পিরামিড গড়িতেছিল তখন ভারত তুল্য শক্তি বেদাধ্যয়নে এবং ঔপনিষদ দর্শন সৃজনে প্রয়োগ করিয়াছিল। যে সংস্কৃতি এত প্রাচীন তাহা বর্তমান কাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে এবং নিজ ভূমিতে উহার প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছে এবং নিজ ভারতীয় সমাজকে এমন ভাবে ও আদর্শে পরিপূরিত করিয়াছে যে, অন্যান্য দেশে তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত। সুগভীর হৃদয়বত্তা

এবং সুসংস্কৃত আচরণ ভারতীয় ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব। এই সুবিশাল মহাদেশের উচ্চতম শ্রেণীর সুসভ্য ব্যক্তি হইতে নিম্নতম আদিম অধিবাসী পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর, সর্বজাতির ও সর্বধর্মের লোকের মধ্যে ইহা অল্প বা অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

—ভগিনী নিবেদিতা

( ৯ )

যুগে যুগে ভারতে অসংখ্য মহাপুরুষ, মুনি-ঋষি, ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা, কবি, স্রষ্টা, বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত এবং স্মৃতিকার আবির্ভূত হইয়াছেন। ভারতে কখনো মহারাজা, রাজ্যশাসক, সৈন্য, বিজেতা, বীর, প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষ, পরিকল্পনাকারী মন এবং সৃজনশীল দৃষ্টিশক্তির অভাব হয় নাই। ভারত যুদ্ধজয় ও রাজ্যশাসন করিয়াছে, বাণিজ্য-বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে এবং তাহার সভ্যতা সম্প্রসারণ, সমাজ সংগঠন, রাজনীতি প্রণয়ন ও শ্রেণীসৃজন করিয়াছে। মহাজাতি সমূহের যে বাহ্য কর্মশীলতা দেখা যায় তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভারতে বিদ্যমান। তৃণবৎ নির্জীব এবং ইচ্ছাশক্তিহীন মূক বা নিস্তেজ স্বাপ্নিক মানুষ এই সকল মহৎ কার্য বা পরিকল্পনা বা রাজ্যজয় বা শাসনতন্ত্র নির্মাণ বা সাম্রাজ্য স্থাপন করে নাই; অথবা কাব্য, শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হয় নাই; অথবা পরবর্তী যুগে বীরদর্পে প্রবল সাম্রাজ্য শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান বা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করে নাই।....ভারতের এমন একটি গুপ্ত শক্তি আছে যাহা কোন জাতি অদ্যাপি লাভ করে নাই। সেই বিশ্বাস, সেই সংকল্প তাঁহার মধ্যে জাগ্রত করাই ভারতের বর্তমান প্রয়োজন। ঈশ্বর তাহার

মধ্যে আর একবার জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। তাহার মুক্তিসাধনে মহাত্মাগণ ব্যাপৃত। যে আন্দোলন প্রথমতঃ রাজনৈতিক আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার পর্যবসান আধ্যাত্মিক জাগরণেই হইবে। ভারত এখনও আত্মস্থ। জগৎ তাহার মুক্তিবাণী ভারত হইতেই প্রাপ্ত হইবে। এই ভারতশক্তির প্রথম কর্মশালা বাংলা দেশ।

—**ঋষি অরবিন্দ**

( ১০ )

[ **ভারতের মানচিত্র দেখাইয়া** ]

শিক্ষক—হের বৎস, সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র, আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই, মাতৃস্তন্যে যথা
এ দেশের ফলে জলে পালিত আমরা
কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত।

(প্রণামান্তে) ছাত্র—ঐ যে চিত্রের শিরে ঘন মসীরেখা
পুরব পশ্চিম ব্যাপী রয়েছে অঙ্কিত
কি নাম উহার, দেব, বলুন আমারে।

শিক্ষক—নহে তুচ্ছ মসীরেখা, ঐ হিমাচল
ভারতের পিতৃরূপী। জনক যেমন
স্নেহদানে তনয়ারে পালেন আদরে
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে
জাহ্নবী যমুনা রূপা স্নেহধারা দানে
পালিছেন সযতনে। ঐ হিমাচল

ভারতের তপঃক্ষেত্র ; কত সাধুজন
বিরচি' আশ্রম সেথা পূজি' ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর। সম্মুখেতে তব
বিজয়-মুকুট সম এ অদ্রির শিরে
শোভে ঐ গৌরীশৃঙ্গ। দেখ বামদিকে
ঐ বদরিকাশ্রম ; মহামুনি ব্যাস
বসি' যে আশ্রম মাঝে রচিলা পুলকে
অমর ভারত কথা। অদূরে তাহার
শোভিছে কেদারনাথ ; আচার্য শঙ্কর
জীবনের মহাব্রত করি' উদ্‌যাপন
লভিলা সমাধি যেথা। এই হিমাচল
সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি যুগ যুগ
হইয়াছে পুণ্য ভূমি। কর নমস্কার।

(প্রণামান্তে) ছাত্র—ঐ যে চিত্রের বামে পঞ্চ রেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার ?

শিক্ষক—ঐ পঞ্চনদ, বৎস, এই পুণ্য ভূমি
আর্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি' বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্ন দেশে তার
দেখ রাজপুত ভূমি মরুময় স্থান।

কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদীকূলে
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস, অমর ভাষায়
বীরত্ব-কাহিনী, শত আত্মবিসর্জন ;
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি।

ছাত্র—ওই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধসম
শোভিতেছে গিরিরেখা, কি নাম উহার ?

শিক্ষক—এই বিন্ধ্যাচল, বৎস! উত্তরে উহার
আর্যভূমি আর্য্যাবর্ত ; উহার দক্ষিণে
আছিল দণ্ডকারণ্য। রঘুকুলমণি
পালিবারে পিতৃসত্য জটাচীর ধরি'
কাটাইলা কাল যেথা। পুণ্যপ্রবাহিনী
গোদাবরী কল কল মধুর নিনাদে
সীতারাম জয় গীত গাহিয়া পুলকে
এখনো বহেন যথা। পবিত্র এ দেশ
সীতারাম পদস্পর্শে, কর নমস্কার।

(প্রণামান্তে) ছাত্র—গুরুদেব, কৌতুহল বাড়িতেছে মনে
অতৃপ্ত শ্রবণ-যুগ, কৃপা করি তবে
কোথা বঙ্গভূমি আজ দেখান আমারে।

শিক্ষক—ওই বঙ্গভূমি, বৎস! হিমাদ্রি আপনি
মুকুট আকারে, হের, শোভে শিরোদেশে
ধৌত করি পদতল বহেন জলধি
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী-জলে
সুজলা, সুফলা শ্যামা। ভূষারূপে তার

হের ঐ নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যেথা
হইলেন অবতীর্ণ ; সাঙ্গপাঙ্গ লয়ে
বিতরিয়া হরিনাম পবিত্রিলা ধরা
অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্কতনু ঐ অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে। নিম্নদেশে তার
সাগর সঙ্গম ঐ, পতিতপাবনী
তারিতে সাগরবংশ অবতীর্ণা যথা
মূর্তিমতী দয়ারূপে। পবিত্র এ দেশ
কর প্রণিপাত তুমি। বিধাতার কাছে
মাগ এই বর বৎস মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে।

ছাত্র—বিশাল এ চিত্র, দেব, কৃপা করি তবে
দেখান দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে।

শিক্ষক—আছে শত শত, বৎস! কি বর্ণিব আমি
বর্ণিলে জীবন কাল না ফুরাবে তবু
রত্নপ্রসূ মা মোদের। দেখিয়াছ তুমি
দেবতাত্মা হিমাচল, পাদমূলে তাঁর
দেখ শীর্ণকায়া ওই বহিছে রোহিনী
হিমাদ্রি দুহিতা সতী। তটদেশে তার
আছিলা কপিলাবস্তু পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে। দেখ বাম দিকে

অর্ধচন্দ্রকায়া ঐ জাহ্নবীর কূলে
শোভিতেছে বারাণসী, হরিশ্চন্দ্র যথা
পত্নীপুত্রে আপনায় করিয়া বিক্রয়
পালিলেন নিজ সত্য। দেখ শিপ্রাকূলে
অতীত-গৌরব-স্মৃতি-শিলা ধরি' বুকে
শোভিতেছে উজ্জয়িনী, বিক্রমের পুরী
বাজায়ে মধুর বীণা কালীদাস যথা
গাইলা অমর গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখনো উঠিছে, বৎস! দেশ-দেশান্তরে।
কি আর অধিক কব? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের।
নয়নে অমৃত দৃষ্টি, কণ্ঠে মধুবাণী,
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়;
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ
তেমতি জানিও, বৎস, ভারত-ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জন পদ
পুণ্যময় মহাতীর্থ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু মাঝে, এর প্রতি জল কণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত
সামান্য এ দেশ নয়, বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে। কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ, বৎস, কর্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ
বৃথায় জনম তব। কি বলিব আর।

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

# অমর ভারত

## এক

## ভারত-তীর্থ*

ভারত পুণ্যভূমি, তীর্থস্থান। স্বদেশী বিদেশী যে কেহ এই ভারত-তীর্থে অবস্থান করিবে, সে যদি পশুত্বের ভূমিতে না নামিয়া থাকে, সে নিশ্চয়ই পৃথিবীর উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ মানবগণের জীবন্ত ভাবরাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। যে মহাপুরুষগণের তপস্যায় ভারত তীর্থে পরিণত হইয়াছে, তাঁহারা ইতিহাসে অবিদিত আছেন এবং যুগ যুগ ধরিয়া ধরাবাসী নর-পশুকে নর-দেবতা করিবার জন্য প্রাণ-পণ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ভাব-তরঙ্গে এই দেশের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ। এই দেশ নীতি, ধর্ম ও দর্শনের মাতৃ-ভূমি।

যাহা মানুষকে নিরন্তর জীবন-সংগ্রামে শক্তিদান করে এবং যাহা মানুষকে পশুভাব বর্জন ও সদানন্দ অজর অমর আত্মস্বরূপ অনুভব করিতে প্রেরণা দেয় তাহার অনন্ত উৎস এই মহাতীর্থ। এই দেশে মানুষের সুখ-পাত্র যেমন পূর্ণ, তাহার দুঃখ-পাত্র তেমনি বা ততোধিক পূর্ণ। ইহার ফলে মানুষ সর্বপ্রথম এখানে উপলব্ধি করিল যে, সুখ-দুঃখ প্রহেলিকা, ভ্রান্তিমাত্র। এখানেই সর্বপ্রথম মানুষ যৌবনের প্রভাতে, বিলাসের ক্রোড়ে সুনাম-শিখরে এবং শক্তির প্রাচুর্যেও সম্মোহ-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া ফেলিল। এই মহাদেশের সুবিশাল জন-সমুদ্রে সুখ ও দুঃখ, সবলতা ও দুর্বলতা, সম্পদ্ ও দারিদ্র্য, হর্ষ ও অমর্ষ, হাস্য ও ক্রন্দন, জীবন ও মৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-স্রোতের সুতীক্ষ্ণ সংঘাতে পরম প্রশান্তি ও গভীর নীরবতার মধ্যে সন্ন্যাসের সিংহাসন উত্থিত হইল। জন্ম-মৃত্যুর জটিল সমস্যার সমাধান এই প্রাচীন দেশেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। জীবন-রহস্যের

* স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে সংকলিত।

এইরূপ সমুচিত সমাধান পৃথিবীর অন্যত্র পূর্বেও হয় নাই; ভবিষ্যতেও হইবে না।

জীবন-তৃষ্ণার চরম তৃপ্তি মানুষ ভারত-তীর্থেই প্রথম লাভ করিয়াছে। এখানে, এবং একমাত্র এখানেই মানুষ সর্বাগ্রে জানিতে পারিল যে, এমন কি জীবনও মিথ্যা এবং সনাতন সত্যের ছায়ামাত্র। ইহাই সেই দেশ, যেখানে *ধর্ম ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে রূপায়িত হয় এবং ইহার সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হয়।* যেমন অন্য দেশে দুর্বলতর ভ্রাতা-ভগ্নীদিগকে বঞ্চিত করিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ ও বিষয়-ভোগের লালসায় মানুষ উন্মত্ত হয়, তেমনি এই দেশের নর-নারীগণ ধর্মসাধনার্থ সর্বস্ব ত্যাগ ও জীবন উৎসর্গ করে। এখানেই, কেবল এখানেই মানব হৃদয় প্রীতিভরে আকাশবৎ এত সম্প্রসারিত হইল যে, ইহা শুধু সর্বমানবকে নহে, পশু, পক্ষী ও এমন কি উদ্ভিদাদি সর্বভূতকে আত্মবৎ ভালবাসিল। এখানেই মানুষ অবগত হইল যে, দৃশ্যমান বিরাট বিশ্ব অভগ্ন, অভিন্ন। হে পুণ্যদেশ আর্য্যাবর্ত! তুমি কখনো অধঃপতিত হও নাই। শত শত রাজদণ্ড খণ্ডিত ও ধূলিসাৎ হইয়াছে, রাজ-শক্তি বার বার হস্তান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু ভারতে সম্রাট বা সিংহাসন মুষ্টিমেয় নরনারীকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছে। উচ্চতম হইতে নিম্নতম সর্বশ্রেণীর নরনারী জাতীয় জীবনের ধর্ম-স্রোত অনুসরণ করিয়াছে। এই ধর্মস্রোত কোন যুগে মন্দীভূত, কোন যুগে বা বেগবান্; কোন যুগে ক্ষীণকায়, কোন যুগে বা স্ফীতদেহ। সমুজ্জ্বল শতাব্দী-সমূহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিস্মিত হৃদয়ে ভারত-তীর্থের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি, আমার মাতৃভূমি কখনো ধর্মহীন হয় নাই। আবহমান কাল হইতে অদ্যাবধি ইহা দৃপ্ত পদে স্বীয় মহিমায় লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর। উহার অগ্রগতি কোন পার্থিব বা স্বর্গীয় শক্তি দ্বারা বাধিত হইবে না। মানবের মধ্যে সুপ্ত দেবত্ব বিকাশ সাধনেই ভারত চিরকাল বদ্ধপরিকর।

ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তি-সংঘাত ও সর্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তা-শীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস অর্থাৎ রাজ-রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম-

ক্রোধ-ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ংকাল পরিক্ষুব্ধ এবং তাঁহাদের সুচেষ্টা কুচেষ্টায় সাময়িক বিচলিত সমাজিক চিত্র প্রাচীন ভারতে হয়ত একেবারে নাই। কিন্তু ক্ষুৎ-পিপাসা, কাম-ক্রোধাদি বিতাড়িত, সৌন্দর্য-তৃষ্ণা ক্লিষ্ট, মহান্ অপ্রতিহত বুদ্ধি, নানাভাব পরিচালিত একটি অতি বিস্তীর্ণ জনসংঘ সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্‌কাল হইতেই নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী প্রতি ছত্রে, তাহার প্রতি পাদবিক্ষেপ রাজাদি পুরুষ বিশেষ বর্ণনাকারী পুস্তকনিচয় অপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটীকৃত ভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয় পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন আজ জীর্ণশীর্ণ এবং বাতাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। এই জাতি মধ্য এশিয়া, উত্তর ইউরোপ বা সুমেরু সন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে শনৈঃ পদসঞ্চারে পবিত্র ভারত ভূমিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, বা এই তীর্থভূমিই তাঁহাদের আদিম নিবাস তাহা এখন জানিবার উপায় নাই।

যে জাতির মধ্যে সভ্যতার উন্মীলন হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট সেখানে তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ বংশধর, মানসপুত্র তাঁহাদের ভাবরাশির, চিন্তারাশির উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ-কালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্বচনীয় সূত্রে ভারতীয় চিন্তা-রুধির অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে।

অতি প্রাচীন কালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরানী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকিন্দর শাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহা জলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধ ভূভাগ ঈশাদি নামাখ্যাত অধ্যাত্ম তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত উক্ত প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্বার এই দুই মহাশক্তির সম্মিলন কাল উপস্থিত। কিন্তু এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ইতিহাসের প্রাচীনতম কাল হইতে পৃথিবীর সর্বদেশের মধ্যে ভারতকেই ধর্মস্থান, তীর্থক্ষেত্র বলা হয়। বহুযুগ যাবৎ ভারত আদৌ অন্য দেশ জয় করিতে যাত্রা করে নাই। এই দেশের লোক কখনও মহযোদ্ধা ও যুদ্ধপ্রিয় হয় নাই। এলিজাবেথের যুগের ইংলণ্ড ও তৎকালীন ভারতের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়, তখনও ইংলণ্ড কত অসভ্য ও ভারত কত সুসভ্য ছিল। ইংলণ্ডবাসী এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির মধ্যে শিল্প-প্রতিভা বিকশিত হয় নাই। অবশ্য, তাহাদের সুন্দর কবিতা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সেক্সপিয়রের পদ্য কি অদ্ভুত! ভারতের শিল্প অতুলনীয় ও আদর্শবাদী। ভারতের সঙ্গীত পুরা সাত স্বর পর্য্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়াছিল। সঙ্গীত, নাট্যকলা, ভাস্কর্য্যেও ভারত অগ্রণী ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতও ঋষিবিদ্যা। উহা শ্রেষ্ঠ শিল্প। যাঁহারা উহার সমঝ্‌দার তাঁহাদের নিকট উহা উৎকৃষ্ট উপাসনা।

জাতীয় জীবনের একটী যুগ দেখাইবার জন্য আমি যে কোন ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ (আহ্বান) করি, যখন ভারতে জগৎ আলোড়নে সমর্থ ধর্মবীরগণের অভাব হইয়াছিল! ভারতের কার্য্য চিরকালই আধ্যাত্মিক এবং ইহা যুদ্ধের জয়-ঢাক বাজাইয়া বা সৈন্যদলের জয়-যাত্রা করিয়া সম্ভব হয় না। সুকোমল শিশির-বিন্দু যেমন বিনা শব্দে কুসুম-কলিকার উপরে পতিত হয় এবং কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়; অথচ উহা পৃথিবীর সুন্দরতম পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করে তেমনি ভারতের প্রভাব সমগ্র বিশ্বের উপর অশ্রুত ও অদৃষ্ট ভাবে পড়িয়াছে। উক্ত প্রভাবের প্রকৃতি অতি কোমল বলিয়া স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে অনুকূল অবস্থার অপেক্ষা করে, যদিও ইহা জন্মভূমির সীমানার মধ্যে কখনো নিষ্ক্রিয় হয় নাই। সেই জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি জানেন যে, যখন যখন সাম্রাজ্য-লিপ্সু টার্টার, পার্শী, বা গ্রীক বা আরব এই দেশকে বহির্জগতের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে তখনই এখান হইতে বিপুল আধ্যাত্মিক ভাব-বন্যা অন্যান্য দেশকে প্লাবিত করিয়াছে। সেই একই অবস্থা বর্তমান কালে আমাদের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। ইংরাজ জাতি জল-স্থলের উপরে যে অপূর্ব রাজপথ প্রস্তুত করিয়াছে তাহার ফলে ভারত বহির্বিশ্বের সহিত পুনরায়

সংযুক্ত এবং একই মহৎ কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। আরম্ভ অল্প হইলেও ভবিষ্যতে ইহা বিরাট আকার ধারণ করিবে। ইহার দ্বারা প্রত্যেক সভ্য দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী ভারতের ভাবধারা গ্রহণপূর্বক ধন্য হইবে।

আদান ও প্রদান প্রকৃতির চিরন্তন নীতি। যদি ভারত আবার জগতের সম্মুখে মাথা তুলিতে চায় তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ্ বহির্জগতে জাতিপুঞ্জের মধ্যে মুক্ত হস্তে বিতরণ কর্তব্য। তৎপরিবর্তে অন্য দেশ যাহা প্রদান করিবে তাহা গ্রহণ করিলে ভারত উপকৃত হইবে। প্রসারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু। প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু। যখন আমরা অন্য জাতিকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলাম তখনই আমাদের আত্মহত্যা সুরু হইল। যতদিন না আমরা সম্প্রসারণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি ততদিন আমাদের ক্ষয়িষ্ণুতা বন্ধ হইবে না। অতএব, জগতের সর্বজাতির সহিত আমাদের মেলামেশা দরকার। যে হিন্দু ভারতের বাহিরে যাইয়া বিদেশে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি প্রচার করে সে স্বদেশস্থ শত শত সেবক অপেক্ষা অধিকতর মহৎ কার্য্য করে। কারণ উক্ত প্রচার দ্বারাই ভারতের জাতীয় জীবনের আয়ু বৃদ্ধি হয়।

প্রবুদ্ধ ভারত রাজপুত বীরগণের রক্তে ও বীর্য্যে গঠিত, মিথিলার ঐতিহাসিক বিদ্যাকেন্দ্র হইতে সমাগত জনৈক ব্রাহ্মণের নির্মম নৈয়ায়িকতায় স্ফুত্রিত, শংকরাচার্য এবং তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যদলের ভাবধারায় সংঘবদ্ধ এবং মালব রাজদরবারের শিল্প ও সাহিত্য কর্তৃক শোভিত হইয়া প্রাচীন ভারতের ধ্বংসাবশেষ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবে। বৌদ্ধ যুগে ভারতে বিদেশীগণকে আর্যভাবাপন্ন করার যে ব্যাপক চেষ্টা দেখা যায়, তাহার ফলে দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়। তৎপরে শংকরাচার্য আসিয়া বৌদ্ধ ভারতকে বৈদিক ভাবাপন্ন করিলেন। উত্তরে কুমারিল্ল এবং দক্ষিণে শংকর ও রামানুজ কর্তৃক বৌদ্ধ যুগের যে প্রতিক্রিয়া আন্দোলন আরম্ভ হইল তাহার ফলে হিন্দুধর্মে বহু সম্প্রদায় ও অসংখ্য ক্রিয়াকলাপ সৃষ্ট হইল। বিগত সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া ভারতে বৈদিক প্রভাব প্রবল হইয়াছে এবং কখনো কখনো সংস্কার কার্য ব্যতীত স্বাঙ্গীকরণই চলিয়াছে। উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া প্রথমে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড

পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিল। কিন্তু উহাতে ফল আশানুরূপ না হওয়ায় বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষৎ প্রচারে ব্রতী হইল। সেইজন্য কুমারিল্লের পরে শংকরের আবির্ভাব ঘটিল। যাহার ফলে ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র এবং কৃষ্ণের গীতা এবং উপনিষদাবলী ভারতীয় ধর্মসমাজের শীর্ষদেশে স্থান পাইল। শংকরের আন্দোলন দর্শনমূলক ও সংস্কৃত ভাষার বাহনে হইয়াছিল বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিল না। সেইজন্য রামানুজের আবির্ভাব প্রয়োজন হইল। তাঁহার প্রচেষ্টায় বৈদিক ধর্ম হিন্দু সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইল।

ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ বুঝিতে হইলে উত্তর ভারতের আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মের প্রতিক্রিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। মালব সাম্রাজ্যের সাময়িক মহিমার পরবর্তী যুগে উত্তর ভারতে কিয়ৎকালের জন্য তামস যুগ আসিল। আফগানিস্থানের গিরিবর্ত্ম দিয়া যখন লুণ্ঠনকারী মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিল তখন তাহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। দাক্ষিণ ভারতে শংকর ও রামানুজের আধ্যাত্মিক জাগরণের ফলে হিন্দু জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যসমূহ সৃষ্ট হইল। যখন উত্তর ভারত আরব্য সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত মধ্য এশিয়ার মোগল বিজেতাদের পদানত হইল তখন ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মুসলমান-গণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দক্ষিণ ভারত বিজয়ে প্রাণপণ করিয়াছিল। কিন্তু কোথাও চিরস্থায়ী জয়লাভ করিতে পারে নাই। তুকারাম ও শিবাজী-গুরু রামদাস প্রভৃতির মুক্তিগীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া দক্ষিণ ভারতের উপত্যকা, পর্বত ও সমতল ভূমি হইতে অশ্বারোহী হিন্দুসৈন্যগণ দুর্নিবার পরাক্রমে মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। উত্তর ভারত মোগল আমলে রামানন্দ, কবীর, দাদু, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি ধর্মগুরুগণের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিল। মধ্যযুগীয় ভক্তিধর্মের আন্দোলন সামাজিক সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিল। উক্ত আন্দোলনের ফলে ইসলাম বিজয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রতিহত হইল।

উত্তর ভারতে আর এক ধর্মগুরু আসিলেন, যাঁহার সৃজনী প্রতিভা ও ধর্মশক্তি অসীম ও অতুল ছিল। তিনি ছিলেন দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ।

ধর্মবলে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহার শিষ্যগণ বলিতেন, এক পর সওয়া লাখ চড়াউ, যব গুরু গোবিন্দ নাম শুনাউ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গুরু গোবিন্দ সিংহের নাম বলে সে সওয়া লক্ষ মানুষের শক্তি লাভ করে। শিখগণ যে রাজনৈতিক সংঘ স্থাপন করিলেন তাহার ফলে রণজিৎ সিংহ কর্তৃক শিখ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। সর্বযুগে ভারতেতিহাসে দেখা যায়, ধর্মজাগরণের পরে রাজনৈতিক আন্দোলন আসিয়াছে। রামদাসাদি ধর্মগুরুগণের প্রভাবে মহারাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্য স্থাপিত এবং শিবাজী কর্তৃক হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যানগর বা মালব রাজ্যে যে উজ্জ্বল বুদ্ধিমত্তা প্রকটিত তাহা ছত্রপতি শিবাজী বা মহারাজা রণজিৎ সিংহের রাজ-দরবারে দেখা যায় না। উক্ত সম্রাট্দ্বয়ের প্রভাবে মোগল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইল; কিন্তু হিন্দু রাজ্য আর বিস্তার লাভ করিতে পারিল না।

প্রাচীন ভারতে জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল ছিল সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান; কিন্তু রাজনৈতিক নহে। পুরাকালে এই দেশে রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তি ধর্ম ও সংস্কৃতির অধীন ছিল। মুনি-ঋষিগণের বিদ্যাস্থানকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিত। বৈদিক যুগে দেখা যায়, পাঞ্চালগণ, কাশ্যগণ ও মৈথিলীগণের সমিতি ধর্ম ও দর্শনের কেন্দ্ররূপে সুবিদিত ছিল। বিভিন্ন আর্যজাতির রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই সকল কেন্দ্র হইতে প্রেরণা লাভ করিত। মহাকাব্য মহাভারতে আছে, কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ রাজ্যলিপ্সার ফলে সৃষ্ট হয়। ইহাতে বিবদমান দুই দল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারত-তীর্থে অধর্মনাশ ও ধর্মজয় সাধিত হইয়াছিল।

দরিদ্রদের দুরবস্থাই ভারতে সর্বনাশের মূল কারণ। পাশ্চাত্যে দরিদ্ররা শয়তান। তাহাদের তুলনায় ভারতীয় দরিদ্ররা দেবতা। সেইজন্য আমাদের দরিদ্রের উন্নয়ন অপেক্ষাকৃত সহজ। শিক্ষাদান এবং তাহাদের নষ্ট ব্যক্তিত্ব পুনরুদ্ধারই তৎপ্রতি আমাদের একমাত্র সেবা। অদ্যাবধি তাহাদের জন্য এই ভাবে কিছু করা হয় নাই। পুরোহিত শক্তি ও বিদেশী শাসন তাহাদিগকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে। অবশেষে ভারতের দরিদ্রগণ ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ! তাহাদিগকে মাতৃভাষা ও

সংস্কৃত শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাদের চক্ষুরুন্মীলন করিতে হইবে। তাহাদের চতুর্দিকে বিরাট বিশ্বে কি ঘটিতেছে তাহাও তাহাদিগকে জানাইতে হইবে। তখন তাহারা স্বীয় মুক্তি সাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু তাহাদিগকে শিক্ষাদান অতি কঠিন কার্য্য। বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা অর্থোপার্জনই তাহারা বেশী পছন্দ করে পেটের দায়ে। যদি পর্বত মহম্মদের কাছে না আসে, মহম্মদই পর্বতের কাছে যাইবেন। দরিদ্রগণ যদি বিদ্যালয়ে না আসে, তাহাদের কুটীরে কুটীরে যাইয়াই প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হইবে।

আমাদের সমাজের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। এই বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহিত আমি একমত। কিন্তু কিরূপে ইহা আরম্ভ কর যায়? সংস্কারকদের ধ্বংসমূলক কার্য্যপদ্ধতি ব্যর্থ হইয়াছে। আমার মতে আমরা অতীতে মন্দ ছিলাম না। আমাদের আধুনিক সমাজ মন্দ নহে, ভালই; কিন্তু আমি ইহাকে আরো ভাল করিতে চাই। মিথ্যা হইতে সত্যে, মন্দ হইতে ভালতে আমরা যাইব না। সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে, উচ্চতম সত্যে আমরা যাইব। আমরা ভাল আছি; কিন্তু আরো ভাল হইব। ইহাই আমার সংস্কার-নীতি। এই ভাবে সংস্কার করিলে ভারতীয় সমাজের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। মিশনারী ও ধর্মত্যাগীদের ভ্রান্ত পথে আমরা চলিব না। আমরা স্বপথে, ধর্মপথেই চলিব। মুসলমানদের দৌরাত্ম্যে মোগল যুগে ভারতের প্রগতি একেবারে বন্ধ ছিল। কারণ তখন প্রগতির প্রশ্ন অপেক্ষা জীবন-মরণের সমস্যাই প্রবল হইয়া উঠিল। মুসলমান অত্যাচারে আমাদের অগ্রগতি বহু শতাব্দী স্থগিত ছিল। এখন সেই নিষ্পেষণ অপসৃত হওয়ায় সমাজ সংগঠন ভাল ভবে চালাইতে হইবে। ভারতের নিম্নশ্রেণী অবহেলিত ও অত্যাচারিত হওয়ায় সাত শতকের মুসলমান রাজত্বে ছয় কোটী হিন্দু মুসলমান হইয়াছে এবং এক শতকের খ্রীষ্টান শাসনে বিশ লক্ষ হিন্দু খ্রীষ্টান হইয়াছে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা নিজস্ব ভাব আছে। বাহিরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, ভাষা মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য করিতেছে এবং সংসারের স্থিতির

জন্য আবশ্যক। যেদিন সেই আবশ্যকতাটুকু চলিয়া যাইবে সেদিন সেই জাত বা ব্যক্তি মৃত হইবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য এবং ঘরে বাহিরে উৎপাত সহিয়া বাঁচিয়া আছি তাহার অর্থ আমাদের একটা জাতীয় স্বভাব আছে এবং তাহা জগতের জন্য এখনো আবশ্যক।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা জাতির মধ্যে আমাকে বেড়াইতে হইয়াছে। তাই জগতের কতকটা আমি দেখিয়াছি। সব জায়গায় দেখিয়াছি, প্রত্যেক নেশনের মধ্যে তাহার মেরুদণ্ডস্বরূপ একটা চরম আদর্শ রহিয়াছে। কাহারও মধ্যে রাজনীতিই সেই চরম আদর্শ, কাহারও মধ্যে বা সামাজিক উৎকর্ষ, আবার কাহারও মধ্যে বা মানসিক উৎকর্ষ। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দেশে অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের জন্মভূমি ভারত-তীর্থ আদি কাল হইতে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়াছেন। সেই পরমার্থই তাহার পীঠস্থান, তাহার মেরুদণ্ড। সেই পরমার্থরূপ পাষাণ ভিত্তির উপরই তাহার বিশাল জীবন-প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে। আমি এখন বিচার করিতেছি না, কিরূপ আদর্শের মধ্যে একটা নেশন বা জাতির প্রাণশক্তি নিহিত থাকা ভাল—পারমার্থিক আদর্শের মধ্যে, না রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে। কিন্তু একথা পরিষ্কাররূপে স্বীকার্য যে, ভালর জন্যই বল, আর মন্দের জন্যই বল, ভারতের প্রাণশক্তি ধর্মের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। তুমি ইহাকে আর পরিবর্তন করিতে পার না; ইহাকে নষ্ট করিয়া তৎপরিবর্তে প্রাণশক্তির জন্য অপর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পার না। ভালই হউক, বা মন্দই হউক, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের অভ্যন্তরে পারমার্থিক আদর্শই প্রবিষ্ট রহিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ধর্মের দীপ্ত স্রোত এই দেশে বহিয়া যাইতেছে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, ভারতাকাশ বহু যুগ যাবৎ ধর্ম-সাধনায় পরিব্যাপ্ত। ভালর জন্যই বল, আর মন্দর জন্যই বল, আমাদের জীবনের প্রারম্ভ ও পরিণতি ঐ সমস্ত ধর্মাদর্শের সাধনক্ষেত্র। ইহার ফলে ধর্মসাধনা জাতীয় দেহের রক্তে প্রবেশ করিয়াছে। উহা প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, এবং আমাদের মজ্জার সঙ্গে, জীবনীশক্তির সঙ্গে একীভূত

হইয়া গিয়াছে। এই অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্মশক্তিকে স্থানচ্যুত করিতে হইলে প্রতিক্রিয়ায় কি গভীর শক্তি তোমাকে প্রয়োগ করিতে হইবে, ভাবিয়া দেখ। হাজার হাজার বৎসরে যে খাত ধর্মপ্রবাহের দ্বারা কর্তিত হইয়াছে, ভাবিয়া দেখ, তোমাকে আবার উহা পূর্ণ করিতে হইবে। তুমি কি ভাব যে, হিম তুষারগর্ভ গঙ্গোত্রীতে আবার ভাগীরথী ফিরিয়া যাইবে এবং পুনরায় নূতন পথে প্রবাহিত হইবে? তাহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি নিশ্চিত জানিও, ভারত-তীর্থের পক্ষে পরমার্থ সাধনরূপ প্রাচীন জীবন খাতটি পরিহার করা অসম্ভব এবং রাজনৈতিক বা অন্যভাবে আবার জীবনপ্রবাহের সূত্রপাত করা অসম্ভব। ইহাই ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব।

ভারতীয় নেশনে বেদমহিমা ও অবতারবাদ অস্থি-মজ্জাগত। সন্ন্যাসই ভারতের সনাতন পতাকা। সন্ন্যাসের নিকট সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ তুল্য হইয়া যায়, 'ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে।' ভারত উক্ত পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে, সর্বপ্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। তাহাদিগকে ভারত যেন বলিতেছে, "সাবধান! ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অনুসরণ কর, নতুবা মরিবে।" ভারতবাসিগণ, এই ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ করিও না, উহা জগতের সমক্ষে তুলিয়া ধর। এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষা করিতে যাইয়া যদি বীভৎস গোঁড়ামী আশ্রয় করিতে হয়, যদিও ভস্মমাখা ঊর্ধবাহু জটাজুট-ধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয় সেও ভাল। কারণ যদিও এই সকল অভ্যাস অস্বাভাবিক তথাপি যে মনুষ্যত্বহারিণী ভোগবিলাস বর্তমান ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে সেই ভোগবিলাসের স্থানে ত্যাগাদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমাদিগকে ত্যাগাদর্শ, ধর্মপথ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। প্রাচীন কালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে এই ত্যাগই ভারত জয় করিবে।

সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে ভারত তমোগুণ-সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিল।

সেইজন্য ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব দেখা যায়। পাশ্চাত্যে সেইরূপ সত্ত্বগুণের অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরের তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণস্রোত প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সংমিশ্রণের ও সম্মিলনের ফলে ভারতের ভবিষ্যৎ অতীত অপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইয়া গড়িয়া উঠিবে।

ভারতে আমাদের উন্নতিপথে দুইটি প্রবল বিঘ্ন বিদ্যমান। জাহাজের সঙ্কীর্ণ জলপথের দুই পার্শ্বে সমুদ্রগর্ভস্থ সাইলা ও চেরিব্‌ডিস পর্বতদ্বয়ের মত এই বিষম বিঘ্ন দুইটি আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। তন্মধ্যে একটি জীর্ণ হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামী ও অন্যটি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা। যদি এই দুইটির একটিকে ভারতের জন্য মনোনীত করিতে হয় আমি প্রাচীন হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামীর পক্ষেই মত দিব, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার পক্ষে নহে। কারণ যিনি সঙ্কীর্ণ প্রাচীন হিন্দুয়ানীর ভক্ত তিনি কতকটা অজ্ঞানান্ধ হইতে পারেন, তাঁহার মতামত অপরিপক্ক হইতে পারে; কিন্তু তাহার একটা মনুষ্যত্ব, একটা প্রতিষ্ঠাভূমি, একটা বলবত্তা আছে। তিনি আপন পায়ে ভর দিয়া দণ্ডায়মান। আর যিনি পাশ্চাত্য ছাঁচে রূপান্তরিত হইয়াছেন তিনি মেরুদণ্ডবিহীন। তিনি যখন যেমন সুযোগ পাইয়াছেন নানা বিসদৃশ ভাব ও আদর্শ আহরণপূর্ব্বক আপনার মধ্যে পুঞ্জীকৃত করিয়াছেন। সেই ভাবগুলিও আবার তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত বা পরিপাক অথবা পরস্পর সমঞ্জসীভূত বা সমন্বিত করিতে পারেন নাই। তিনি স্বীয় পদে ভর দিয়া দাঁড়ান না এবং তাঁহার মস্তিষ্কও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া এক ভাব-কক্ষ হইতে অন্য ভাব-কক্ষে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার সংসাধনার পশ্চাতে কোন্ প্রেরণা-শক্তি বিদ্যমান? নিশ্চয়ই ইংরাজ সমাজের প্রশংসাসূচক পৃষ্ঠ-পীড়ন, অথবা পাশ্চাত্যভাবাপন্নগণের জড়বাদমূলক হস্তমর্দন ইহার কারণ।

সমগ্র প্রাচীন ভারতের পরমার্থনিষ্ঠা ও সত্ত্বশুদ্ধি প্রত্যেক হিন্দুর মধ্যে

আশৈশব অন্তর্নিহিত আছে। উক্ত মূল ছন্দেই তাহার জীবন-গাথাকে গ্রথিত করিতে হইবে। উহারই সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে নিজের ঐশ্বর্য্য, মান-যশকে, স্বীয় পাশ্চাত্য বিদ্যা-বিজ্ঞানাদির শিক্ষাকে আনয়ন করিতে পারিলে আদর্শ হিন্দু চরিত্রের আদি রহস্য সমাধান করা হইল। অতএব এক দিকে সেই প্রাচীন হিন্দুয়ানীর গোঁড়া ভক্ত—যিনি সমস্ত ভারতের প্রাণশক্তির উৎস পরমার্থনিষ্ঠাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন এবং অন্য দিকে পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত নব্য ভারতীয়, যাঁহার করপুট পাশ্চাত্য 'কেমিক্যাল' বা মেকি সোণাজহরাদিতে ভরা বটে; কিন্তু যিনি ভারত-শক্তির উদ্ভব স্থান ধর্মনিষ্ঠার সহিত সংযোগ হারাইয়াছেন, এই উভয় পক্ষের মধ্যে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, সকলেই একমত হইয়া পূর্বোক্ত হিন্দুয়ানীর গোঁড়া ভক্তকে মনোনীত করিবেন। কারণ, ইহার মধ্যে একটা আশা-সূত্র রহিয়াছে। ইনি সনাতন ভারতীয় জীবনাদর্শটী বজায় রাখিয়াছেন এবং ইঁহার জীবন-সৌধের একটী দৃঢ় ভিত্তি আছে। এই জন্য জীবন-সংগ্রামে, আদর্শ-সংঘর্ষে ইনি বাঁচিয়া যাইবেন; কিন্তু অপর ব্যক্তির মৃত্যু সুনিশ্চিত। ঠিক যেমন একটী মনুষ্য-দেহ সম্বন্ধে দেখা যায় যে, যদি সেই দেহে প্রাণ-সঞ্চারের কেন্দ্র-শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে যদি সেই দেহ-যন্ত্রের মূল ক্রিয়া বজায় থাকে তবে অন্যান্য ক্রিয়া সাময়িক আঘাত বা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইলেও দেহের জীবন-সংশয় ঘটে না এবং দেখাও যায় যে, উক্ত অবান্তর ক্রিয়াসমূহের অবস্থান্তর প্রায়ই ঘটে, ঠিক সেই ভাবে বুঝিতে হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সমষ্টি-দেহ-যন্ত্রের মূল ক্রিয়াটী অব্যাহত থাকিবে ততদিন ভারতের ধ্বংস হইবে না। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, যদি বর্তমান ভারত পরমার্থতন্ত্রতা পরিহারপূর্বক তৎপরিবর্তে জড়ভ্রান্তি বিবর্ধিনী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে জীবনাদর্শরূপে বরণ করে তবে পরিণামে তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই ভারত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কারণ তখন ভারতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে। জাতির জীবন-সৌধ যে ভিত্তির উপর উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা শূন্যগর্ভ হইয়া যাইবে। ভিত্তিহীন সৌধ কি বেশী দিন দাঁড়াইয়া থাকে? ইহার ফলে ভারতের সকল দিকেই ধ্বংসলীলায়

বিস্তার ঘটবে। যতদিন ভারত ধর্ম-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে উহা ততদিন অজর, অজেয় ও অমর।

ত্যাগ ও সেবাই ভারতের সার্বজনীন জাতীয় আদর্শ। এই দুই দিকে ভারতকে সবল ও সমৃদ্ধ করিলে বাকী সব দিক ঠিক হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষে নেশনরূপ সমষ্টিবদ্ধতার অর্থে বুঝিতে হইবে, বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের একত্র সমাবেশ। ইহা সুনিশ্চিত যে, ভারতের পক্ষে নেশন বলিতে এমন বহু মানুষের সমবায় বুঝাইবে, যাহাদের হৃদয়-তন্ত্রী একই পারমার্থিক সুরে একযোগে ঝঙ্কৃত হয়। আধুনিক ধর্মহীন সমাজ-সংস্কারকগণ বাঁচিয়া থাকুক। কিন্তু আমাদের সমাজে এমন সমস্যা আছে, যাহার অর্থই তাহারা বা তাহাদের পাশ্চাত্য গুরুগণ বুঝিতে পারে নাই; উহার সমাধান করা ত দূরের কথা! ধর্মালোক ব্যতীত ভারতের কোন সামাজিক সমস্যা মীমাংসিত হয় না। ধর্মই ভারতকে তীর্থত্ব দান করিয়াছে। সুতরাং ধর্মানুরাগই ভারতে আসল স্বদেশ-প্রেম। ধর্মের সাধন, সংরক্ষণ ও সম্প্রচারই প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবন-ব্রত। কি জীবন-ব্রত ধারণ করিয়া হিন্দু গৃহে প্রত্যেক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়? মনু সংহিতায় আছে, 'ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে।' অর্থাৎ ধর্মের রত্নভাণ্ডার রক্ষার্থে। আমি বলি, এই ভারত-তীর্থে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যে শিশুই জন্মগ্রহণ করে এই ধর্মরূপ রত্ন-ভাণ্ডারের সংরক্ষণ তাহার জীবন-ব্রত। ইহা ব্যতীত জীবনের আর সমস্ত ব্যাপার উল্লিখিত প্রধান উদ্দেশ্যেরই সাধনাধীন।

হে ভারত, ভুলিও না, তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী। ভুলিও না, তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না, তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়-সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে। ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না, তোমার সমাজ সেই বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র। ভুলিও না, নীচ জাতি মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী। দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ

ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল, দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর। মা, আমায় মানুষ কর।"

## দুই

# প্রবুদ্ধ ভারত *

বিগত মহাযুদ্ধের প্রলয়ানলে পৃথিবী দগ্ধীভূত ও মৃতপ্রায়। সমিদ্ধ সমরাগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপে ভারত সন্তপ্ত ও সংজ্ঞাহীন। অসংখ্য ভারতবাসীর মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে, "ভারত বাঁচিবে কি? ভারত এই কাল-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারিবে কি?" প্রবুদ্ধ ভারতের জাগরণমন্ত্রের ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারত কি মরিবে? তাহা হইলে পৃথিবী হইতে সকল আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে, সকল নৈতিক উৎকর্ষ অপসৃত হইবে, ধর্মের প্রতি সকল মাধুর্যাত্মক প্রীতি বিনষ্ট হইবে, উচ্চাদর্শের প্রতি সকল অনুরাগ অন্তর্হিত হইবে এবং এই সকলের স্থলে কাম-কাঞ্চনরূপ দেবদেবী যুগলের রাজত্ব স্থাপিত হইবে। সেই রাজ্যের পুরোহিত হইবে অর্থ; দুর্নীতি, পরাক্রম ও প্রতিযোগিতা হইবে পূজার উপচার ও মানবাত্মা হইবে বলিদত্ত।" অতীত ভারত অপেক্ষা অধিকতর মহিমাময় ভবিষ্য ভারতের এক জ্বলন্ত ও জীবন্ত

* মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৫৪

চিত্র স্বামিজী তাঁহার যোগজ দৃষ্টি-সহায়ে দর্শন করিয়াই এই অভয় বাণী দিয়াছেন।

গ্রীস, রোম প্রভৃতি অনেক প্রাচীন উন্নত দেশ ধরাতল হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ভারত অদ্যাপি জীবিত। বহু শতাব্দীর মৃত্যু-ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া আজও ভারত সগর্বে দণ্ডায়মান। ভারত অমর। ভারতের অমরত্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মই ভারতের প্রাণ। ভারতের সংস্কৃতি ধর্মমূলক। মানব সভ্যতায় ভারতের বিশিষ্ট অবদান আছে। জগতের জন্যই ভারতকে বাঁচিতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকার ফিল্ড মার্শ্যাল স্মাটস্ সাহেব মহাত্মা গান্ধীকে একদা বলিয়াছিলেন, "ভারতের জাতিকে আমরা ভয় করি না, ভারতের সংস্কৃতিকেই ভয় করি।" অন্যান্য দেশের সভ্যতা মরণশীল; আর ধর্মের অক্ষয় ভিত্তিতে ভারতীয় সংস্কৃতি স্থাপিত বলিয়া ইহা অমর। অরুণোদয়ের পূর্বে যেমন ধরণী ঘনান্ধকারে সমাবৃত হয়, মলয়ানিল প্রবাহের পূর্বে যেমন গ্রীষ্মের উত্তাপ বাড়িয়া উঠে, নব পত্রোদ্গম হইবার অগ্রে যেমন বৃক্ষ শীর্ণ ও পত্রহীন হয়, ভবিষ্য ভারতের আবির্ভাবের পূর্বে তেমনি আধুনিক ভারত মুমূর্ষু প্রতীত হইতেছে। নব জন্ম লাভের গর্ভযন্ত্রণায় বর্ত্তমান ভারত মূর্চ্ছিত। মধ্যযুগের অবসান এবং নবযুগের সন্ধিক্ষণে আধুনিক ভারত উপস্থিত। এই সঙ্কট সময়ে ভীত হইবার কোন কারণ নাই; প্রয়োজন অসীম ধৈর্যের, ও অনন্ত দূরদৃষ্টির। আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, ভারতের প্রাণপাখী এখনও সঞ্জীবিত। ধর্মরসের মৃত-সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া ভারত মৃত্যু জয় করিয়াছে। যুগ-যুগান্তর বিমৃত্যুর উপাসনা করিয়া ভারত অমর হইয়াছে।

মেজর জর্জ ফিল্ডীং ইলিয়ট ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন আমেরিকার 'লুক' (Look) নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "ভারতই বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ভারত যে জাতির করতলগত হইবে, সেই জাতিই পৃথিবীতে প্রভুত্ব করিবে। ভারত সর্ব সম্পদে সমৃদ্ধ। ইহার লোহার খনি এবং হাইড্রো-ইলেকট্রিক্ শক্তি যুক্তরাজ্যের পরেই সুবিশাল। ইহার কয়লা ও মাঙ্গ্যানিজ অপরিমেয়। পৃথিবীর আর্ধক বকসাইট (যাহা হইতে এ্যালুমিনিয়াম

তৈয়ারী হয়) ভারতেই আছে। তুলা উৎপাদনে ইহা আমেরিকার সমকক্ষ এবং পাট, চিনি ও চামড়া প্রভৃতিতে উহা জগতের অগ্রণী।" শত শত বৎসর বিদেশীয় লুণ্ঠনের পরেও প্রবুদ্ধ ভারত পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম দেশ। ভারতের ঐহিক সম্পদ, ইহার আধ্যাত্মিক সম্পদের ন্যায়ই জগতের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতই একমাত্র স্বয়ংপূর্ণ মহাদেশ। ভারত মর্ত্যধামের স্বর্গ। অধ্যাপক আজোয়ানী[১] বলেন, "ভীষণ দারিদ্র্য সত্ত্বেও ভারতের নরনারী সর্বাপেক্ষা দানশীল, অতিথি-সৎকারপরায়ণ ও সমুদার। অন্যান্য দেশের আদর্শ-প্রতীক সিংহ, ভল্লুক বা ঈগল পাখী; আর ভারতের প্রতীক গাভী। সুশান্ত ও ক্ষমাশীল গাভী যেমন দুগ্ধ দানে শত্রুর ক্ষুধা দূর করে, ভারতও তেমনি মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও অন্যান্য জাতির সেবা করিয়াছে। জগৎ ভারতের নিকট সমধিক ঋণী। অন্যান্য জাতি কঠিন আইন সৃষ্টি করিয়া বিদেশীকে দূরে রাখিয়াছে। অন্যান্য দেশ টারিফ ও অন্যান্য নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উত্তোলনপূর্বক স্ব স্ব সম্পদ্ ও উৎপন্ন দ্রব্য রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু ভারত ধর্মমাতার ন্যায় বিপন্ন ও গৃহহীনকে আশ্রয় দান করিয়াছে।" পার্শিগণ আরবীয় মুসলমানগণের অত্যাচারে স্বদেশ পারস্য পরিত্যাগপূর্বক ভারতে বসবাস করিতেছে। পূর্ব পূর্ব খ্রীষ্টানগণ অন্যত্র স্থান না পাইয়া ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গৃহনির্মাণ করিয়াছে। ইহুদিগণ অন্য দেশে বিতাড়িত হইয়া ভারতে সপ্রেম অভ্যর্থনা পাইয়াছে। বণিক্ ও বিদেশিগণ ভারতে সর্বদা অতিথিবৎ সম্মানিত ও সৎকৃত হইয়াছে। কলম্বাস্ ভারত আবিষ্কার করিতেই আসিয়াছিলেন। পূর্বাবিষ্কৃত জল-পথ ছাড়িয়া নতুন পথে ভারত অন্বেষণের ফলে তিনি আমেরিকা পাইলেন। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই সভ্য জগতের দৃষ্টি ভারতের উপর নিবদ্ধ।

ভারতের অসীম ঐশ্বর্য্য ও অতুল সম্পদই ভারতকে অমর করিয়াছে। লোকসংখ্যাতেও ভারত জগতের শীর্ষস্থানীয়। মানব জাতির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ভারতে বাস করে। এই বিষয়ে চীনের পরেই ভারতের স্থান। পৃথিবীর

১ Immortal India—By L. H. Ajwani, Karachi.

ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে, "হে ঈশ্বর, কৃপা করে আমার কর্ম কমিয়ে দাও। তা না হলে নিশিদিন যে মন তোমাতে লেগে থাকবে সে মনের বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে; সে মনে বিষয়-চিন্তা করা হচ্ছে। শুদ্ধ ভক্তের থাক আলাদা। ঈশ্বর বস্তু, আর সব অবস্তু। এই বোধ পাকা না হলে শুদ্ধা ভক্তি হয় না। এ সংসার অনিত্য, দুই দিনের জন্য। আর যিনি এ সংসারের কর্তা তিনিই সত্য, নিত্য—এই বোধ দৃঢ় না হলে শুদ্ধা ভক্তি হয় না। জনকাদি প্রত্যাদিষ্ট হয়ে নিষ্কাম কর্ম করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেউ কেউ মনে করে, শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা ভাবে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স পড়তে হয়। (সকলের হাস্য)। তারা বলে, ঈশ্বরের সৃষ্টি না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? আগে সায়েন্স, না আগে ঈশ্বর?

বঙ্কিমচন্দ্র—হাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয় জগতের বিষয়। একটু এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানব কেমন করে? তাই আগে পড়াশুনা করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐ তোমাদের এক কথা! আগে ঈশ্বরকে জান, তারপর তাঁর সৃষ্টিকে বুঝবে। তাঁকে লাভ করলে দরকার হলে সবই জানতে পারবে। যদি যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে পার যো সো করে, তাহলে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে যদু মল্লিকের ক'খানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, ক'খানা বাগান—এও জানতে পারবে। যদু মল্লিকই সব বলে দেবে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি আলাপ না হয়, বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়, তাহলে ক'খানা বাড়ী, কত কোম্পানীর

কাগজ, কখানা বাগান এসব খবর কি করে জানবে? তাঁকে জানলে সব জানা যায়। বেদে আছে, 'তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।' তিনি জ্ঞাত হলে এই সমস্ত জ্ঞাত হয়। কিন্তু তাঁকে জানার পর সামান্য বিষয় জানার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যতক্ষণ না লোকটিকে দেখা যায় ততক্ষণ তার গুণের কথা বলা যায়। সে যেই সামনে আসে তখন ওসব কথা বন্ধ হয়ে যায়। লোকে তাকে নিয়েই মত্ত হয়, তার সঙ্গে আলাপ করে বিভোর হয়। তখন তার গুণগান আর চলে না।

আগে ঈশ্বরলাভ, তারপর জগতের জ্ঞান। বাল্মীকিকে রামমন্ত্র জপ করতে দেওয়া হল। কিন্তু তাকে বলা হল, মরা মরা জপ কর। 'ম' মানে ঈশ্বর, আর 'রা' মানে জগৎ। আগে ঈশ্বর, তারপর জগৎ। এককে জানলে সব জানা যায়। একের পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে অনেক হয়ে যায়। এককে পুঁছে ফেললে শূন্যের দাম কিছু থাকে না। এককে নিয়েই অনেক। এক আগে তারপর অনেক। আগে ঈশ্বর, তারপর জীবজগৎ। জীশু খ্রীষ্ট বলতেন, 'প্রথমে স্বর্গরাজ্যের সন্ধান কর। তা হলে অন্য সব বস্তু তোমার লাভ হবে।'

তোমার দরকার ঈশ্বরকে জানা। তুমি অত জগৎসৃষ্টি, সায়েন্স ফায়েন্স করছ কেন? তোমার আম খাবার দরকার। বাগানে কত আমগাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ কোটি পাতা, এসব খবরে তোমার কাজ কি? তুমি আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। এ সংসারে মানুষ এসেছে ভগবান লাভের জন্য। সেটি ভুলে নানা বিষয়ে মন দেওয়া ভাল নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র—আম পাই কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। প্রার্থনা আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয়ত এমন কোন সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন, যাতে খুব সুবিধা হয়ে গেল। কেউ হয়ত বলে দেয়, এমনি এমনি কর, তা হলে ঈশ্বকে পাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র—কে ? গুরু! তিনি নিজে ভাল আম খেয়ে আমায় খারাপ আম খেতে দেন। (হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন গো! যার যা পেটে সয়। সকলে কি পোলোয়া কালিয়া খেলে হজম করতে পারে ? বাড়ীতে মাছ এলে মা সব ছেলেকে পোলোয়া কালিয়া দেয় না। যে দুর্বল, যে পেট-রোগা তাকে মাছের ঝোল দেয়। তা বলে কি মা সে ছেলেকে কম ভালবাসে ?

গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দই গুরু। তাঁর কথা শিশুর মত বিশ্বাস করলে ঈশ্বর লাভ হয়। শিশুর কি সরল বিশ্বাস! মা বলেছে, 'ও তোর দাদা হয়,' অমনি শিশু বিশ্বাস করল, 'ও আমার দাদা।' শিশুর পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস। শিশু হয়ত বামুনের ছেলে, আর দাদা হয়ত ছুতোর বা কামারের ছেলে। শিশু বিনা বিচারে বিশ্বাস করে। মা বলেছে, ও ঘরে জুজু আছে। শিশুর পাকা বিশ্বাস হল, ও ঘরে জুজু। শিশুর মত গুরু বাক্যে বিশ্বাস চাই। স্যায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারী বুদ্ধি, বিচার বুদ্ধি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস আর সরলতা থাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। কপট হলে ঈশ্বরলাভ হবে না। সরলের কাছে তিনি খুব সহজ, কপট থেকে তিনি অনেক দূরে। কিন্তু শিশু মাকে না দেখলে দিশেহারা হয়, সন্দেশ মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও কিছুই চায় না। শিশু

কিছুতেই ভোলে না. আর বলে, 'না, আমি মার কাছে যাব।' সেইরূপ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই। আহা! সে কি অবস্থা! সংসারে যার বিষয়-সুখ, বিষয়-ভোগ আলুনি লাগে; টাকা মান, দেহ-সুখ, ইন্দ্রিয়-সুখ যার ভাল লাগে না সেই আন্তরিক ভাবে 'মা' 'মা' করে ডাকতে পারে। তারই জন্য মা সব কাজ ফেলে দৌড়ে আসে।

এইরূপ ব্যাকুলতা চাই। যে পথেই যাও—হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টান, বৈষ্ণব, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও ঐরূপ ব্যাকুলতা সার কথা। তিনি তো অন্তর্যামী। ভুল পথে গেলেও ভয় নাই, যদি ব্যাকুলতা থাকে। তখন তিনি ভাল পথে টেনে নেন। আর সব পথেই ভুল-ভ্রান্তি আছে। সব্বাই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে; কিন্তু কারুর ঘড়ি ঠিক চলে না। তা বলে কারুর কাজ আটকায় না। ব্যাকুলতা থাকলে সাধুসঙ্গ জুটে যায়। সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে নেওয়া যায়।

ব্রাহ্ম সমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল গান করছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গান শুনতে শুনতে ভাবাবেশে হঠাৎ দণ্ডায়মান হলেন। তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় একেবারে সমাধিস্থ, বিন্দুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই। সমবেত ভক্তবৃন্দ তাঁকে বেষ্টন করে দাঁড়ালেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমাধিস্থ অবস্থা ইতিপূর্বে কখনো দেখেন নি। তিনি ব্যস্তভাবে ভীড় ঠেলে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গেলেন এবং নিষ্পলক নয়নে তাঁকে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্য জ্ঞান এল। ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হয়ে শ্রীচৈতন্যবৎ নৃত্য করতে লাগলেন। সে কি অদ্ভুত নৃত্য! সে কি দিব্য দৃশ্য! বঙ্কিমাদি ইংরাজি-পড়া ভদ্রলোকগণ ঠাকুরের নৃত্য দেখে বিস্মিত হলেন।

কিঞ্চিৎ পূর্বে ঠাকুর যে ভগবৎপ্রসঙ্গ করছিলেন তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখালেন। নৃত্য শেষ হলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হয়ে ভগবানকে প্রণাম করলেন এবং বললেন, "ভগবৎভক্ত, ভগবান, জ্ঞানী, যোগী, প্রেমিক সকলের চরণে প্রণাম।" ঠাকুর আসন গ্রহণ করলে বঙ্কিমাদি ভক্তবৃন্দ তাঁর চার দিকে উপবেশন করলেন। পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ভগবৎপ্রসঙ্গ চল্‌ল।

বঙ্কিমচন্দ্র—মহাশয়, ভক্তি কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুলতা চাই। ছেলে মেয়ে যেমন মাকে না দেখতে পেয়ে মার জন্য কাঁদে সেই রকম ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। অরুণোদয় হলে পূর্ব দিক লাল হয়। তখন বোঝা যায়, সূর্যোদয়ের আর দেরী নাই। সেরূপ যদি ঈশ্বরের জন্য কারো প্রাণ ব্যাকুল হয় তখন বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এই ব্যক্তির ঈশ্বরলাভে আর দেরী নাই।

একজন গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মহাশয়, বলে দিন, ঈশ্বরকে কেমন করে পাব।" গুরু বল্‌লেন, এসো আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তাকে সঙ্গে করে একটা পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। দুই জনেই জলে নামল। এমন সময় হঠাৎ গুরু শিষ্যকে নিয়ে জলে চুবিয়ে ধরল। খানিক পরে ছেড়ে দিতে শিষ্য মাথা তুলে দাঁড়াল। গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, "জলের মধ্যে কি রকম বোধ হচ্ছিল।" শিষ্য বল্লে, প্রাণ যায় বোধ হচ্ছিল, প্রাণ আটু পাটু কচ্ছিল। তখন গুরু বল্‌লেন, ঈশ্বরের জন্য যখন প্রাণ ঐরূপ ছট্‌ফট্‌ করবে তখন জানবে, তাঁর দর্শনের আর দেরী নাই। তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে? জলে একটু ডুব দাও। গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে,

জলের উপর হাত পা ছুঁড়লে কি হবে। আসল মাণিক বেশ ভারী হয়, জলে ভাসে না, তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। আসল মাণিক পেতে হলে জলের নীচে ডুব দিতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র—মহাশয়, কি করি? পেছনে শোলা বাঁধা আছে, ডুবতে দেয় না। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামে কাল-পাশ কাটে। ডুব দিতে হবে, তা না হলে রত্ন পাওয়া যাবে না। কবীরের একটা গান শোন।—

ডুব ডুব ডুব রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্ন-ধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন জন।
কবীর বলে, শোন শোন শোন ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধুর কণ্ঠে এই গান গেয়ে ভক্তবৃন্দকে মুগ্ধ করলেন। ভক্ত-সভায় ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হল। বঙ্কিমাদি ভক্তবৃন্দ সেই পূত স্রোতে অবগাহন করে ধন্য হলেন। সঙ্গীত সমাপ্ত হলে শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পূর্ববৎ ভগবৎপ্রসঙ্গ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেউ ডুব দিতে চায় না। আবার কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর ঈশ্বর করে শেষ কালে কি পাগল হয়ে যাব? যারা ঈশ্বরের প্রেমে প্রমত্ত তাদের সম্বন্ধে তারা বলে, ওরা বেহেড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারা এটি বোঝে না যে, সচ্চিদানন্দ অমৃতসাগর। আমি

নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মনে কর, এক খুলি রস আছে। আর তুই মাছি হয়েছিস্। তুই কোন্ খানে বসে রস খাবি ?" নরেন্দ্র বললে, আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বললুম, 'কেন ? মাঝখানে গিয়ে ডুবে খেলে কি দোষ ?' নরেন্দ্র বললে, তাহলে যে রসে ডুবে মরে যাব। আমি বললাম, "বাবা, সচ্চিদানন্দ রস তা নয়। এ রস অমৃত। এতে ডুবলে মানুষ মরে না। এতে পড়লে মানুষ অমর হয়। তাই বলছি, 'ডুব দাও। কিছু ভয় নাই, ডুব দিলে অমর হবে।'

এখন বঙ্কিমচন্দ্র বিদায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন এবং নম্রভাবে বললেন, "মহাশয়, আমাকে যত আহাম্মক ঠাউরেছেন আমি তত নয়। একটি প্রার্থনা আছে। অনুগ্রহ করে আমার কুটীরে একবার পায়ের ধূলা দেবেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তা বেশ তো। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে হবে।" বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরকে নিবেদন করলেন, "সেখানেও অনেক ভক্ত আছে।" ইহা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, "কি গো! কি রকম সব ভক্ত সেখানে ? যারা 'গোপাল' 'গোপাল' 'কেশব' 'কেশব' বলেছিল তাদের মত কি ?" ঠাকুরের কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন। এক ভক্ত ঠাকুরকে উল্লিখিত গল্পটি বলতে অনুরোধ করলেন। তাঁর অনুরোধে ঠাকুরও নিম্নোক্ত গল্পটি সরস করে বললেন।

এক স্থানে কোন স্যাকরার দোকান ছিল। তারা পরম বৈষ্ণব; গলায় মালা পরে ও কপালে তিলক কাটে। তারা হরিনামের ঝুলি হাতে নিয়ে মুখে সর্বদা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম জপ করে। তারা এত ভক্ত যে, তাদিগকে সাধু বলাই চলে। তবে পেটের দায়ে সংসারের

জন্য তারা স্যাকরার কাজ করে। তারা পরম ভক্ত শুনে অনেক খরিদ্দার তাদের দোকানেই আসে। লোকের বিশ্বাস, এই দোকানে সোনা-রূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্দার সেই দোকানে গিয়ে দেখে যে, স্যাকরা মুখে হরিনাম করছে, আর হাতে গয়না গড়ছে। খরিদ্দার সেই দোকানে গিয়ে বসল। একজন স্যাকরা বলে উঠল, কেশব! কেশব! কেশব। কিছুক্ষণ পরে আর একটি স্যাকরা বলতে লাগল, গোপাল! গোপাল! গোপাল। সামান্য কথাবার্তার পর আর একজন চীৎকার করে বলল, হরি! হরি! হরি। গয়না গড়ার কথা যখন প্রায় ফুরিয়ে এল তখন আর একজন বলল, হর! হর! হর। স্যাকরাদের ভক্তিভাব দেখে খরিদ্দার তাদের কথামত টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হল এবং ভাবল, এরা কখন ঠকাবে না।

কিন্তু আসল কথা হল অন্য রকম। খরিদ্দার আসার পর যে বলেছিল 'কেশব' 'কেশব' তার মানে—এরা সব কে? যে বললে, 'গোপাল' 'গোপাল' তার মানে—এরা দেখছি গরুর পাল। যে বললে, 'হরি' 'হরি' তার মানে—যখন এরা গরুর পাল তবে হরি অর্থাৎ এদের সোনারূপা হরণ করি। আর যে বললে, 'হর' 'হর' তার মানে, এরা যখন গরুর পাল দেখছ তখন এদের সর্বস্ব হরণ কর। স্যাকরারা পরম ভক্ত হয়েও ভাবের ঘরে এমনি চুরি করেছিল। ভাবের ঘরে চুরি থাকলে, মন-মুখ এক না হলে ধর্ম হয় না।

ঠাকুরের গল্প শুনে সকলে উচ্চ হাস্য করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অন্য-মনস্ক হয়ে বিদায় নিলেন। দরজার কাছে গিয়ে তাঁর মনে হল, চাদর ফেলে গেছেন। কোন ভদ্র লোক চাদর খানি নিয়ে ছুটে গিয়ে তাঁর হাতে দিলেন। কিছু দিন পরে ঠাকুর গিরীশ ও শ্রীমকে সানকি

ভাণ্ডারায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় পাঠিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। ঠাকুরকে আবার দেখবার ইচ্ছাও তিনি তখন প্রকাশ করেন। কিন্তু কার্যগতিকে তিনি ঠাকুরের কাছে আর যেতে পারেন নি, কিংবা ঠাকুর আর তাঁর বাড়ীতে আসেন নি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর শনিবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পঞ্চবটিতলায় ভক্তসঙ্গে সানন্দে বসে ছিলেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত 'দেবী চৌধুরাণী'র কিয়দংশ তিনি শুনে ছিলেন। তিনি চাতালের উপর সমাসীন ছিলেন। কেদার চট্টোপাধ্যায়, রাম দত্ত, নিত্য গোপাল, তারক ঘোষাল, সারদাপ্রসন্ন, সুরেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি তাঁর চতুর্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীম 'দেবী চৌধুরাণী' পাঠ করে শুনালেন। তা শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের বিষয়ে অনেক কথা বলেছিলেন।

---

## তিন

# শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদও লাভ করেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবা-বিবাহ আইন সরকার কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। তিনি অসাধারণ

সাহিত্যিক ছিলেন এবং বাংলায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে কলিকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজ, বিদ্যাসাগর স্কুল ও বিদ্যাসাগর স্ট্রীট হয়েছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। ঘাটালে তাঁর পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে কলেজ এবং স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৫৯ সাল শ্রাবণ মাসে (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই আগস্ট) শনিবার বৈকালে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কলিকাতা নগরীর বাদুড় বাগান পল্লীতে বর্তমান বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে বিদ্যাসাগরের বাটী অবস্থিত। উক্ত বাড়ীতেই এই দুই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্য ও কথামৃতকার শ্রীম (মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত) ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের বিদ্যা ও দয়ার কথা শুনে ছিলেন। তিনি একদিন স্বশিষ্য শ্রীমকে বললেন, "আমাকে কি বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে? তাকে দেখতে আমার বড় সাধ হয়।" শ্রীম এই কথা বিদ্যাসাগরকে বললেন। ইহা শুনে বিদ্যাসাগর একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করেন, "কি রকম পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন?" শ্রীম'র মুখে ঠাকুরের আসল বর্ণনা শুনে বিদ্যাসাগর আনন্দিত হন এবং এক শনিবার বৈকালে চারটার সময় তাঁকে সঙ্গে করে স্বীয় গৃহে আনতে বলেন।

তদনুসারে উল্লিখিত দিবসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকা গাড়ীতে চড়ে শ্রীম, ভবনাথ ও হাজরাকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে উপস্থিত হন। ঠাকুর ঘোড়াগাড়ী হতে ফটকের সম্মুখে নামলেন। শ্রীম তাঁকে পথ দেখিয়ে বাটীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। দোতলায় উঠতে উঠতে ঠাকুর বালকবৎ জামার বোতামে হাত দিয়ে শ্রীমকে বললেন, "আমার জামার বোতাম খোলা রয়েছে। এতে কিছু দোষ হবে না তো?" শ্রীম নম্র ভাবে নিবেদন করলেন, "আপনি ওর জন্য ভাববেন না, আপনার কিছুতে দোষ হবে না। আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।" শ্রীম'র কথায় ঠাকুর নিশ্চিন্ত হলেন। ঠাকুরের গায়ে লংক্লথের জামা, পরিধানে লাল পেড়ে ধুতি ও পায়ে বার্ণিশ-করা চটি জুতা।

পরিহিত বস্ত্রের আঁচলটি তাঁর কাঁধে ফেলা ছিল। ঠাকুর দোতলায় উঠে বিদ্যাসাগরের ঘরে প্রবেশ করলেন। বিদ্যাসাগর ঠাকুরকে দেখে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা তিনি ষোল সতের বৎসর বড় ছিলেন। তাঁর পরণে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতা ও গায়ে হাত-কাটা ফ্লানেল জামা ও গলায় উপবীত। পরমহংস ও বিদ্যাসাগরের মিলন দিব্য দৃশ্য সৃষ্টি করল। ঠাকুর বাম হাত টেবিলের উপর রেখে ভাবাবেশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে বিদ্যাসাগরকে দেখতে লাগলেন। এমন সময় বাড়ীর ছেলেরা ও আত্মীয়-বন্ধুরা এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়ালেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে বেঞ্চের উপর বসলেন। বেঞ্চটিতে হেলান দিবার ব্যবস্থা ছিল। ঠাকুর ভাবাবেশ সম্বংণার্থ মাঝে মাঝে বলে উঠলেন; "জল খাব।" এই কথা শুনে বিদ্যাসাগর ব্যস্ত ভাবে একজনকে জল আনতে বললেন এবং শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু খাবার আনলে ইনি খাবেন কি? শ্রীম সম্মতি জানালে বিদ্যাসাগর বাড়ীর ভেতর গিয়ে কিছু মিঠাই নিয়ে এলেন এবং ঠাকুরকে খেতে দিলেন। ভবনাথ ও হাজরা প্রভৃতি যাঁরা ঠাকুরের সঙ্গে গিয়ে ছিলেন তাঁরাও কিছু কিছু মিঠাই খেলেন। মিষ্টি মুখ করে শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হলেন। দেখতে দেখতে এক ঘর লোক হল; কেউ বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল, হদ্দ নদী দেখেছি; এবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে খানিকটা নোনা জল নিয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! তুমি ক্ষীর-সমুদ্র!

ঠাকুরের কথা শুনে সমবেত সকলেই আনন্দে হাসতে লাগলেন।

তখন বিদ্যাসাগর বললেন, "তা বলতে পারেন বটে।" বিদ্যাসাগর নির্বাক্ হয়ে রইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় ভগবৎপ্রসঙ্গ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কর্ম সাত্ত্বিক, সত্ত্বের রজ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায় তা রাজসিক বটে। কিন্তু এই রজগুণ সত্ত্বের রজ; এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন ঈশ্বর-তত্ত্ব শিক্ষাদানার্থ। তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছ। এও ভাল। নিষ্কাম ভাবে করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ দান করে নামের জন্য। কেউ দান করে পুণ্যের জন্য। তাদের দান নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তুমি তো আছই।

বিদ্যাসাগর—মহাশয়, কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আলু-পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়। তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া!

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তা নও গো। যাদের শুধু পাণ্ডিত্য আছে তারা দরকচা পোড়া। তাদের না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে; কিন্তু তার নজর থাকে ভাগাড়ে। যাদের শুধু পাণ্ডিত্য আছে, দয়াদি নাই তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকে। তারা শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে। তাদের আসক্তি অবিদ্যার সংসারে গভীর। দয়া, ভক্তি ও বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

বিদ্যাসাগর নীরবে ঠাকুরের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনলেন। সকলেই এক দৃষ্টে তাঁর কথামৃত পান করে ধন্য হলেন। যেখানে ঠাকুর থাকতেন ও ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন সেখানে স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্ট হত। ঠাকুরের উপস্থিতিতে ও ভগবৎপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের বৈঠকখানা তীর্থ

ক্ষেত্রে পরিণত হল। বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত, ষড়দর্শনজ্ঞ। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। ব্রহ্ম মায়াতীত। এই জগতে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া দুইই আছে। ইহলোকে জ্ঞান-ভক্তি আছে; আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে; সৎও আছে আবার অসৎও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে। কিন্তু ব্রহ্ম সৎ ও অসতের অতীত। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ে, কেউ বা জাল করে। কিন্তু প্রদীপ নির্লিপ্ত। সূর্য্য শিষ্টের উপর আলো দেয়, আবার দুষ্টের উপর আলো দেয়। যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এই সব তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম অনাসক্ত। সাপের মুখে বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়, সাপের কিন্তু কিছু হয় না। ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্ দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে, মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারিত হয়েছে। এই সব তাই এঁটো হয়ে গেছে। কিন্তু একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই। সেটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, তা আজ পর্য্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগর (বন্ধুদের প্রতি)—বা! বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক বাপের দুটী ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শেখবার জন্য ছেলে দুটীকে বাপ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এল। এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে।

বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “বাপ, তুমি ত সব পড়েছ। ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি?” বড় ছেলেটী বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগল। বাপ চুপ করে রইলেন। যখন তিনি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁট মুখে চুপ করে রইল। তার মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বল্লেন, ‘বাপু, তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না।’

মানুষে মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছল। এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আর এক দানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগল। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে সমস্ত পাহাড় মুখে করে নিয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। তারা জানে না যে, ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অতীত। যে যত বড় হউক না কেন তাঁকে কি করে জানবে? শুকদেবাদি না হয় ডেঁও পিঁপড়ে, চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক!

বেদ পুরাণে যা বলেছে. সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে? সে মুখ হাঁ করে বলে, “ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল!” ব্রহ্মের কথাও সেই রকম। বেদে আছে, তিনি আনন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ! শুকদেবাদি এই ব্রহ্ম-সাগরের তটে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মবারি দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। একমতে আছে, তাঁরা এই সাগরে নামেন নাই। এই সাগরে নামলে আর ফিরবার জো নাই। সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্মদর্শন হয়। সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু, তা মুখে বলবার শক্তি থাকে

না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। (সকলের হাস্য)। সমুদ্রের জল কত গভীর তাই খপর আনতে। খপর আনা আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবে?

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন, "সমাধিস্থ ব্রহ্মজ্ঞানী কি আর কথা কন না?" শ্রীরামকৃষ্ণ ইহার উত্তর দিলেন (বিদ্যাসাগরাদিকে লক্ষ্য করিয়া)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শংকরাচার্য্য লোক-শিক্ষার জন্য বিদ্যার আমি রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিতে আবার কাঁচা লুচি পড়ে তখন আর একবার ছ্যাঁক, কলকল করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দানের জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়। যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন ভন করে। ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনো গুণ গুণ করে। পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্ ভক্ শব্দ হয়। কলসী পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য)। তবে আর এক কলসীতে যদি জল ঢালাঢালি হয় তবে আবার শব্দ হয়।

ইহার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভগবৎপ্রসঙ্গ করলেন তাতে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অপূর্ব সমন্বয় সূচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়-মূর্তি। তিনি স্বীয় জীবনে সাধনা দ্বারা যাহা উপলব্ধি করেছেন তাহাই উপদেশ দিতেন। এই সম্বন্ধে বীরভক্ত

হনুমানের উক্তি প্রাসঙ্গিক। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেছিলেন—

দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহম্ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥

অনুবাদ—হে রাম! দেহবুদ্ধির দৃষ্টিতে আমি তোমার দাস, জীববুদ্ধির প্রাবল্যে আমি তোমার অংশ এবং আত্মবুদ্ধির আলোকে তুমিই আমি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়-বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কত খাটতেন। তাঁরা সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেতেন। একলা সারা দিন নির্জনে ধ্যানজপ করতেন এবং রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমুল খেতেন। দেখা, শোনা ও ছোয়া—এসব বিষয় থেকে তাঁরা মনকে আলাদা রাখতেন। তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ করতেন।

কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এই অবস্থায় সোঽহং বলা ভাল নয়॥ সবই করা যাচ্ছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোন মতে যাচ্ছে না তাদের 'আমি দাস', 'আমি ভক্ত' এই অভিমান ভাল। ভক্তি-পথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। জ্ঞানী নেতি নেতি বলে, বিষয়-বুদ্ধি সব ত্যাগ করে। তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপে ধাপে উঠে ছাদে পৌছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি, তিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন এবং আরো কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিষে তৈরী, সেই ইট, চুণ,

মোগল সম্রাট্‌ আওরঙ্গজেব তাঁহার কন্যাকে অল্প বস্ত্র পরিধানের জন্য একবার তিরস্কার করিয়াছিলেন। রাজকুমারী পিতাকে বলিলেন যে, তাহার শরীরে সাড়ীটি সাত বার জড়ান আছে। দক্ষিণ ভারতের কালিকটে যে কাপড় তৈয়ারী হইত তাহা ইংলণ্ডের বাজারে তদ্দেশীয় কাপড়কে সৌক্ষ্ম্য ও সৌন্দর্যে পরাস্ত করিয়াছিল। এই জন্য ১৭০১ খৃষ্টাব্দে আইন করিয়া ইংলণ্ডে উক্ত কাপড়ের আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বহু পূর্ব হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৩ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কাপড় প্রত্যেক বৎসর ভারত হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত। যন্ত্রযুগ প্রবর্তনের পরে বাণিজ্যস্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইল, এবং ইংলণ্ডের কাপড় ভারতে প্রবেশ করিল।

ভারতেও যন্ত্রযুগের প্রভাব পড়িল। ইহার ফলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। আজ বোম্বাইতে ৬৯টি কাপড়ের কল এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে ৩৯০টি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ৪৫৯টি কলে চার লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। কাপড়ের কলের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র আমেদাবাদ। আমেদাবাদ ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার। ভারতীয় কলগুলিতে প্রত্যেক বৎসরে চারি শত কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হয়। ভারতে যত কাপড়ের দরকার হয় ইহা তাহার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ। ভারতে প্রত্যেক বৎসর ৬২৫ কোটি গজ কাপড ব্যবহৃত হয়। হস্তচালিত তাঁতগুলিতে চল্লিশ লক্ষ লোক কাজ করিয়া বৎসরে ২৫০ কোটি গজ কাপড় তৈয়ারী করে। বাকী ৭৫ কোটি গজ কাপড় ইংলণ্ড ও জাপান হইতে আমদানী হয়। ভারতে তুলার অভাব নাই। দেশে যত কাপড়ের আবশ্যক, সবই অনায়াসে দেশেই প্রস্তুত হইতে পারে। বাংলা, বিহার, আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত ভারতের সকল প্রদেশেই তুলা জন্মে। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে সকল দেশ অপেক্ষা অধিক তুলা উৎপন্ন হয়, এবং তাহার পরেই ভারতের স্থান। ভারতজাত তুলার প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ লক্ষ বেল বিদেশে রপ্তানী হয়। তন্মধ্যে ১৫ লক্ষ বেল জাপানে এবং বাকী অন্য দেশে রপ্তানী হয়। জাপান এই দেশ হইতে তুলা কিনিয়া কাপড়

প্রস্তুত করিয়া ভারতে এত সস্তা দামে বিক্রয় করে যে, বোম্বাই বা আমেদাবাদের কল তাহা পারে না। ভারতীয় তুলা অদীর্ঘ বলিয়া পাতলা কাপড় তৈয়ারীর জন্য আমেরিকা, মিশর ও আফ্রিকা হইতে দীর্ঘস্থায়ী তুলা আমদানী করিতে হয়। আমাদের দেশে যত কাপড়ের প্রয়োজন হয় তাহার এক-অষ্টমাংশ বিদেশ হইতে আসে। ভারতীয় কৃষকগণ চারি মাস বিনা কাজে বসিয়া থাকে। ঐ সময় চরকা ও তাঁত চালাইলে বিদেশীয় বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিতে পারা যায়। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী চরকা প্রচলনে এত উৎসাহী ছিলেন। গড়ে প্রত্যেক ভারতীয় মাত্র সাড়ে ১৬ গজ কাপড় ব্যবহার করে। একটু চেষ্টা করিলে প্রত্যেকেই স্বীয় ব্যবহার্য কাপড়ের উপযোগী সূতা স্বহস্তে কাটিতে পারেন। এতদিন জতুর দ্বারা ক্যাম্বিস তৈয়ারী হইত। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন যুদ্ধ বাধিল তখন জতুর সরবরাহ বন্ধ হইল। ভারতীয় তুলার দ্বারা ভারতেই ক্যাম্বিস প্রস্তুত হইতে লাগিল। সেই সময় ইংলণ্ড ৪৬ লক্ষ টাকা মূল্যের তুলার ক্যাম্বিস ভারতে অর্ডার দিয়াছিল। তুলার সহিত জুট মিশাইয়া গানি ব্যাগ ও প্যাকিং কাপড় ভারতে প্রস্তুত হইতেছে।

আমাদের দেশে যে সকল খনি আছে, তাহাতে অতুল সম্পদ ভূপ্রোথিত। লোহা, কয়লা, অভ্র, সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ ভারতের মাটীতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এই সকল পদার্থ প্রস্তুত করিয়া দেশে ২৮ কোটি টাকা প্রত্যেক বৎসর আয় হয়। এই কার্যে ৩ লক্ষ ৫ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত। কয়লার খনিও আমাদের দেশে বহু আছে। কয়লাকে কালো হীরক বলে; কারণ, উভয় পদার্থের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কার্বন বিদ্যমান। পূর্ব্বে কয়লা কেবল মাত্র জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হইত। এখন কয়লা হইতে তপ্ত বাষ্প সৃষ্টি করিয়া ট্রেন ও জাহাজ চালান হয়। কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। আলকাতারা হইতে নানা প্রকার রঙ, ঔষধ এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতে প্রায় চারি কোটী টাকা মূল্যের উক্ত প্রকার রঙ ও ঔষধ এই দেশে আমদানী

হয়। অথচ বাঙলা ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে যে আলকাতারা প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশই ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঝরিয়ার কয়লাখনিসমূহে তিন কোটি গ্যালন আলকাতারা নষ্ট করা হয়। ঐ আলকাতারাতে মোটর স্পিরিট ও বিভিন্ন হাল্কা তেল আছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন বিশ্বব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তখন ইংলণ্ড যে সকল রঙ ব্যবহার করিত তাহার শতকরা ৯০ ভাগ জার্মানিতে প্রস্তুত হইত। ব্রিটেনবাসিগণ বুঝিল যে, কোন দ্রব্যের জন্য অপর দেশের উপর নির্ভর করা নির্বুদ্ধিতা। তাহারা স্বদেশে রঙ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল এবং ১৯৩৯ খ্রীঃ যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল, ইংলণ্ড রঙ সম্বন্ধীয় দ্রব্যের শতকরা ৯০ ভাগ স্বীয় দেশে প্রস্তুত করে এবং মাত্র দশ ভাগ বিদেশ হইতে আনে। ভারতও স্বীয় খনিজ দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিতে শিখিতেছে। এই দেশে এত কয়লা খনিসমূহ হইতে তোলা হয় যে, আমরা এই দ্রব্যে পৃথিবীতে নবম স্থান অধিকার করিয়াছি। প্রত্যেক বৎসর ভারতে ১ লক্ষ ৬২ হাজার শ্রমিক ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন কয়লা ভূগর্ভ হইতে তোলে। এই কয়লার নবম-দশম অংশ বাঙ্গালা ও বিহারের খনিসমূহ হইতে উত্তোলিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস, দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে অনেক কয়লার খনি আছে। কাশ্মীর রাজ্যেও কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লোকে বলে, ছয় হাজার কোটি টন কয়লা ভারতের খনি-সমূহে বিদ্যমান। যে ভাবে কয়লা তোলা হইতেছে এই ভাবে তুলিলে দুই হাজার বৎসর আমাদের প্রয়োজন দেশীয় কয়লাতেই চলিবে। লোহা, মাঙ্গানিজ ও ক্রোমাইট দ্বারা যন্ত্র নির্মিত হয়। এই সকল দ্রব্যের খনি ভারতেও অবস্থিত। যে দেশ লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুত করিতে অসমর্থ সেই দেশ বর্ত্তমান যুগে দাঁড়াইতে পারে না। কয়লার ন্যায় লোহাও বাংলা ও বিহারে সমধিক বর্তমান। উত্তর ও মধ্য ভারতে পৃথিবীর বৃহত্তম লোহার খনি কয়েকটি আছে। এই সকল খনিতে তিন শত কোটি টন কয়লা আছে। ইহা বিশেষজ্ঞগণের অনুমান। ভারতীয় কয়লা গুণেও সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাঙ্গানিজ থাকিলেও সোভিয়েট রাশিয়া

অধিকতম মাঙ্গানিজ প্রস্তুত করে এবং তাহার পরেই ভারত। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ৪ লক্ষ ৯২ হাজার টন মাঙ্গানিজ ভারতে প্রস্তুত হইয়াছিল; তন্মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক অংশ মধ্যপ্রদেশসমূহে।

ভারতের খনিজ দ্রব্য প্রায় সমস্তই ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে প্রেরিত হয়। এই রপ্তানি প্রত্যেক বৎসর ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৯১৪ খ্রীঃ যত দ্রব্য রপ্তানি হইত তাহার ১৫ গুণ অধিক এখন হইতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল দ্রব্য অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। খনি হইতে প্রাপ্ত দ্রব্য বিদেশে পাঠাইতে হয় আমাদের ব্যয়ে এবং বিদেশে প্রস্তুত হইয়া অধিক মূল্যে এই দেশে বিক্রীত হয়। যদি মাঙ্গানিজ প্রস্তুত করিবার কারখানা এই দেশে থাকিত তবে ইহা উচ্চ মূল্যে বিদেশে বিক্রীত হইত। অভ্র আর একটী খনিজ দ্রব্য, যাহা ভারতে প্রচুর পরিমাণে আছে। যুদ্ধে অভ্র বিশেষ প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর অভ্রের দুই-তৃতীয়াংশ ভারত সরবরাহ করে। বিহার প্রদেশে অধিকাংশ অভ্র পাওয়া যায়। অভ্রও আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। তাম্র, টিন, এ্যালুমিনিয়ম, ক্রোমাইট, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি ভারতে যথেষ্ট আছে। বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণের তার তাম্র দ্বারা তৈয়ারী হয়। টিনে বিস্কুট, ফল ও অন্যান্য আহার্য দ্রব্য রাখার জন্য বাক্স নির্মিত হয়। এ্যালুমিনিয়াম হাল্‌কা ও মজবুত বলিয়া উহাতে রন্ধনের পাত্রাদি ও এরোপ্লেন তৈয়ারী হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য হইতে মুদ্রা নির্মিত হয়। দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে সমুদ্রতীরে কন্যাকুমারীর চতুর্দিকে বালিতে ইলমেনাইট এবং মোনার্জাইট প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। বিহারে প্রচুর সল্টপিটার আছে। এই দ্রব্য হইতে পূর্ব্বে বারুদ ও বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত হইত। ইহা জমির সাররূপেও ব্যবহৃত হয়। জমিকে উর্বর করিতে হইলে নাইট্রোজেন আবশ্যক হয়। ফসফেট্‌ জমির উত্তম সার। উহা আমাদের দেশে অল্পই আছে। ভারতীয় সমুদ্র হইতে যথেচ্ছ লবণ পাওয়া যায়। লবণ হইতে আলকালী প্রস্তুত হয়। আলকালী শিল্পের বীজ। ইহা কাগজ, চামড়া, কাচ, সাবান প্রভৃতি তৈয়ার করিতে

আবশ্যক হয়। ১৯৩৭-৩৮ খ্রীঃ বিদেশ হইতে এক কোটি টাকা মূল্যের আলকালী দ্রব্য ভারতে আমদানি করা হয়।

কাথিয়াবাড় প্রদেশে দ্বারকা তীর্থের অদূরে মিঠাপুরে একটি বড় কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত কারখানাতে সোডা এ্যাস, কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। পেট্রোলিয়ামও ভারতে কম নাই; আসামে সামান্য পেট্রোল আছে। বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই তরল খনিজ দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। পাঞ্জাবে বিতস্তা নদীর তীরে একটি পেট্রল খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে প্রচুর পেট্রল পাওয়া যাইতেছে। পাইরাইটের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় সালফার ভারতের সর্ব্বত্র অবস্থিত। চর্ম্মরোগের ঔষধরূপে, শস্যক্ষেত্রে পোকা মারিবার জন্য, পশুর চামড়া ও রবার ও কাগজ মজবুত করিবার জন্য এবং গৃহনির্ম্মাণ কালে সিমেণ্টে মিশ্রিত করিবার জন্য সালফার প্রয়োজন। সালফিউরিক এসিড রসায়ন শিল্পের মূল দ্রব্য। ইংলণ্ডে ইহার মূল্য প্রতি টন ৩০ পাউণ্ড হইতে ২ পাউণ্ডে নামিয়াছে। বিলাতী দ্রব্য দেশে সস্তা দামে আমদানি হওয়ায় ভারতের যে সামান্য শিল্প চলিত তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। ভারতে যে সকল খনিজ দ্রব্য আছে, অথচ যাহা কোন কাজে লাগান হইতেছে না, ২ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সেই সকল দ্রব্য প্রত্যেক বৎসর ইউরোপ হইতে এই দেশে আমদানী হয়। যে পাইরাইটের সঙ্গে সালফার স্বাভাবিক অবস্থায় মিশ্রিত থাকে তাহা পাঞ্জাবের সিমলা, বিহারের সাহাবাদে এবং বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিহারে তাম্র প্রস্তুত করিবার সময় বিশ টন সালফার ডাইঅক্সাইড প্রতিদিন বাতাসে মিশিয়া যায়, তাহার কোন সদ্ব্যবহার হয় না। কানাডা ও ফিনলাণ্ডে উক্ত বাষ্প সালফারে পরিণত হয়।

প্রাচীন কালে সব কাজ মানুষ নিজেই করিত এবং শ্রমসাধ্য সব কাজ যথা পাথর ভাঙ্গা, গাছ কাটা, ও ভার বহা প্রভৃতি ক্রীতদাস বা পশুর দ্বারা করাইত। পাটনা হইতে দিল্লী যাইতে সম্রাট অশোক বা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের

সময় যত সময় লাগিত ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেও তত সময় লাগিত। তখন রেলগাড়ী বা মোটরকার, বা এরোপ্লেন বা জাহাজ ছিল না। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাষ্প-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। এই অদ্ভুত আবিষ্কারের ফলে যন্ত্র-বিজ্ঞানে যুগান্তর আসিল। এখন দেড় হইতে দুই লক্ষ অশ্বশক্তির বাষ্প-যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এক অশ্বের শক্তি বিশ মানবের শক্তির সমান। যে যন্ত্রের ৫০ হাজার অশ্বশক্তি আছে, তাহা ৫০ হাজার অশ্ব বা ১০ লক্ষ মানুষ টানিতে পারে। ১৮৮০ খ্রীঃ তৈল-এঞ্জিন আবিষ্কৃত হইল। বাষ্প-যন্ত্রে যেমন রেলগাড়ী ও জাহাজ চলার সুবিধা হইয়াছিল তৈল-যন্ত্রে তেমনি মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেন চলা সহজ হইল। বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হওয়াতে যান-বাহনের আরও সুবিধা হইল। তারের দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তিকে দুই-তিন শত মাইল দূরে পাঠান যায়। আমেরিকার নায়েগ্রা জলপ্রপাতে প্রস্তুত বৈদ্যুতিক শক্তি ৪৫০ মাইল দূরে নিউইয়র্ক শহরে আনীত হয়। জাহাজ, মোটর-কার ও এরোপ্লেন প্রভৃতি বাহন যন্ত্র কয়লার উপর নির্ভর করে। ভারতে বৈদ্যুতিক শক্তির এক-তৃতীয়াংশ জল-শক্তির দ্বারা প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজে ও বোম্বাইতে বড় বড় হাইড্রো-ইলেকৃটিক কারখানা আছে। বৃহত্তম কারখানাটি বোম্বাইতে, উহা টাটা কোম্পানির। পশ্চিমঘাট পাহাড়ের শীর্ষে জল ধরিয়া এই কারখানা চালিত হইতেছে। তথায় পর্বতশীর্ষ হইতে ১৬০০ ফুট নিম্নে পাদদেশে জল প্রবল বেগে পতিত হইয়া ২ লক্ষ ৩০ হাজার অশ্বশক্তির বিজলী উৎপন্ন করে। উক্ত বিজলীর দ্বারা বোম্বাই সহরে আলো জ্বলে, ৬৯টী কাপড়ের কলের মধ্যে ৫৩টি চালিত হয়, ট্রাম চলে এবং বোম্বাই হইতে পুণা পর্য্যন্ত এক দিকে এবং ইগাতপুরী পর্য্যন্ত অন্য দিকে ইলেকট্রিক ট্রেণ যাতায়াত করে। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক কারখানা কাবেরী নদীর তীরে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। উক্ত কারখানায় যে বিজলী প্রস্তুত হয় তাহার দ্বারা মহীশূর রাজ্যের কোলার নামক স্থানে অবস্থিত সোনার খনিসমূহ চালিত হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রায় ৬ লক্ষ অশ্বশক্তির বিজলী প্রস্তুত হয়। ১৯১৫ খ্রীঃ এই দেশে

যত বিজলী উৎপন্ন হইত তদপেক্ষা ১৫ গুণ অধিক এখন হইতেছে। পূর্ব ভারতে জলশক্তি হইতে বিজলী তেমন প্রস্তুত হয় না। সেই জন্য উক্ত অঞ্চলে কয়লা হইতে বিজলী হয়। কলিকাতায় ও জামসেদপুরে যে বিজলী প্রস্তুত হয় তাহা কয়লা হইতে হয়। বিহারে গয়া এবং জামুনিয়াতন্দে দুইটি বিজলীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত দুই স্থানের প্রত্যেকটিতে ২০ হাজার অশ্বশক্তি বিজলী সৃষ্ট হয়। ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ লক্ষ অশ্বশক্তি বিজলী খরচ হয়। ইহা আদৌ আশ্চর্য নহে; কারণ, ভারতে যত বিজলী খরচ হয় তাহার ১০ গুণ ইটালীতে, ১৬ গুণ ফ্রান্সে, ২০ গুণ ব্রিটেনে, ২৪ গুণ রাশিয়াতে, ৩৭ গুণ জার্মানিতে এবং ৭৭ গুণ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে খরচ হয়। বিষয়টি আরও বিশদ ভাবে নিম্নোক্ত প্রকারে বলিতেছি। প্রত্যেক এক হাজার লোকের জন্য নরওয়েতে ৭০০ অশ্বশক্তির বিজলী, কানাডাতে ৬০০, সুইজারল্যাণ্ডে ৫০০, সুইডেনে ২০০, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১০০ এবং ভারতে মাত্র ১ অশ্বশক্তি বিজলী ব্যয়িত হয়। কিন্তু জলশক্তিতে ভারত পৃথিবীর মধ্যে কানাডা এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পরবর্তী। ভারতে ২ কোটী ৭০ লক্ষ অশ্বশক্তি, কানাডাতে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ অশ্বশক্তি আছে। আমাদের দেশে বিজলীর যে উৎস আছে তাহার মাত্র এক-পঞ্চাশ অংশ ব্যবহৃত হয়; কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জাপান স্ব স্ব বৈদ্যুতিক উৎসের ১/৩ অংশ, এবং জার্ম্মাণী ও সুইজারলাণ্ড ১/২ অংশ ব্যবহার করে। আরনল্ড লুপটন তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থে[১] ভারতের বৈদ্যুতিক উৎসের সম্ভাবনার একটি মনোরম আলেখ্য দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং একজন অভিজ্ঞ ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ভারতের জলশক্তি গণনা করিয়া বলেন, "হিমালয় ও অন্যান্য পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০০ মাইল। উহা হইতে মিনিটে ১ কিউবিক ফুট জল ১ হাজার ফুট নীচে পড়িয়া ২ অশ্বশক্তি বিজলী উৎপন্ন করে। এইরূপে ১৫ কোটি অশ্বশক্তি স্বাভাবিক জলপ্রপাতও নদী হইতে প্রস্তুত হইতে পারে।"

---

[১] Happy India by Arnold Lupton দ্রষ্টব্য

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কৃষিকার্যের জন্যও বিজলী ব্যবহৃত হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত দেশে ২০ লক্ষ শ্রমিক জমিতে কাজ করিত। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ লক্ষ শ্রমিক এবং ২৫ লক্ষ অশ্বশক্তি বিজলী কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫০ লক্ষ শ্রমিক এবং ৫০ লক্ষ অশ্বশক্তি বিজলী কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫ লক্ষ শ্রমিক ও ২৫০ কোটি অশ্বশক্তি বিজলী কৃষিকার্য্যে প্রযুক্ত হয়। আমাদের দেশে বিজলীর যে সম্ভাবনা আছে তাহা কাজে লাগিলে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন লইয়া আমরা নাইট্রোলিন প্রস্তুত করিতে পারিতাম। জমিকে উর্ব্বর করিতে নাইট্রোলিনের মত রাসায়নিক দ্রব্য আর নাই। বিজলী প্রস্তুত করিতে হইলে বহু যন্ত্রপাতি আবশ্যক। ঐ সকল যন্ত্র ইউরোপ এবং আমেরিকা হইতে আমদানী হয়। সেই জন্য ১৯৩৮-৩৯ খ্রীঃ ভারতের ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সৌর শক্তিকেও কাজে লাগাইবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টিত হইতে হইবে। বর্ত্তমানে বিদেশে একটি ছোট বৈদ্যুতিক মোটর সূর্য্যালোকের দ্বারা চালিত হয়। ভূগর্ভে যে উত্তাপ আছে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। ইটালীতে লাদারেলা নামক স্থানে ভূগর্ভ হইতে যে গরম তাপ বহির্গত হয় তাহা হইতে ৪০০ অশ্বশক্তি বিজলী প্রস্তুত হয়।

ভারত পৃথিবীর উৎকৃষ্ট লৌহভাণ্ডার। কিন্তু আমরা সব লৌহ কাজে লাগাইতে পারি না বলিয়া প্রত্যেক বৎসর ১৩-১৪ কোটি টাকা মূল্যের লৌহ যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে এই দেশে আমদানী করিতে হয়। লৌহ প্রস্তুত করিতে না পারিলে এই দেশে যন্ত্রপাতি তৈয়ার করা অসম্ভব। ইহা বুঝিয়া জামসেদজী টাটা লোহার কারখানা সর্বপ্রথম ভারতে স্থাপন করেন। ছোটনাগপুরের সাকচী নামক স্থানে উক্ত কারখানা অবস্থিত। সাকচী নামক ক্ষুদ্র গ্রামটি কয়েক বৎসরের মধ্যে বৃহৎ সহরে পরিণত হইয়াছে। উল্লিখিত কারখানায় এখন প্রায় দেড় লক্ষ লোক কাজ করে। উহার পার্শ্ববর্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে কয়লা, লোহা, তামা, এলুমিনিয়ম, অভ্র, চুনা পাথর এবং ডলোমাইট প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, এবং ছোটনাগপুরের পাহাড়ীরা খুব কষ্টসহিষ্ণু এবং

কর্মক্ষম শ্রমিক। ঐ সকল সুবিধা থাকায় সাক্‌চীর কারখানা দ্রুতবেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পিট্‌সবার্গে যেমন আমেরিকার বৃহত্তম ইস্পাতের কারখানা আছে, তেমনি ভারতের বৃহত্তম লোহার কারখানা সাক্‌চীতে। উহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তম এবং পৃথিবীর বৃহত্তম বারটি কারখানার মধ্যে অন্যতম। উক্ত কারখানায় ৫০ হাজার শ্রমিক ১৯৩৯ খ্রীঃ হইতে প্রত্যেক বৎসর ১২ লক্ষ টন কাঁচা লোহা এবং ১০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত করে। লোহার সঙ্গে কার্বন এবং ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া উক্ত কারখানায় ইস্পাতও তৈয়ারী হয়। ইংলণ্ড দীর্ঘকাল যাবৎ লোহা ও ইস্পাতের ব্যবহার করিতেছে। উক্ত দেশে সেভার্ণ নদীর উপর ১৭৭৯ খ্রীঃ প্রথম লোহসেতু নির্মিত হয়। ১৫০ বৎসরের মধ্যে লোহা হইতে সাইকেল, টাইপ রাইটার, রেল ইঞ্জিন, মোটর ইঞ্জিন, এবং জাহাজ প্রভৃতি নানা যন্ত্র তৈয়ার হইতেছে। ভারত এখনও এই বিষয়ে ইংলণ্ডের বহু পশ্চাদ্বর্তী, জার্মেনি স্বদেশীয় খনি হইতে প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ টন লোহা প্রস্তুত করে এবং ফ্রান্স ও সুইডেন হইতে আরও লোহা আনিয়া ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন ইস্পাত তৈয়ার করে। ভারতে প্রায় বিশ লক্ষ টন লোহা প্রস্তুত হয়; কিন্তু এখন আমরা ১০ লক্ষ টনের বেশী ইস্পাত তৈয়ারী করিতে পারি না; অথচ লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার ভারতে বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এই বিষয়ে বর্তমানে অনেক দেশের পশ্চাদ্‌বর্তী। দিল্লীতে যে লোহস্তম্ভ আছে তাহা পনের শতাব্দী প্রাচীন এবং সুলতানগঞ্জে পিত্তলনির্মিত যে বুদ্ধমূর্তি বিদ্যমান তাহাও খুব পুরাতন। আমরা যখন ধাতুর ব্যবহারে এত অগ্রণী ছিলাম তখন ইউরোপীয়গণ ইস্পাত হইতে কেবলমাত্র ছোরা ও ছুরি প্রস্তুত করিতে পারিত। জার্মেণি ভারত অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেশ হইয়াও কত অধিক ইস্পাত তৈয়ার করিতেছে। সুখের বিষয় এই যে, জামসেদপুরে আরেকটি কারখানা খোলা হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যহ ১ হাজার টন ইস্পাত প্রস্তুত হয়। টাটা কোম্পানী আশা করেন, দুই বৎসর পরে সাড়ে বার টন ইস্পাত প্রস্তুত

হইবে। তাহারা ১৯৩৯ খ্রীঃ মাত্র দশ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত করিতেন। এই দেশে যতই লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত হইবে, ততই রেল ইঞ্জিন, মোটর ইঞ্জিন, জাহাজ, এরোপ্লেন, মোটর লাংগল প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুত হইবে। টাটা কোম্পানীর যে কৃষিবিভাগ আছে, তাহাতে বৎসরে বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ কুঠার, দেড় লক্ষ হাতুড়ি, এবং ৯ লক্ষ কুদাল প্রস্তুত হয়। তাঁহারা রেল গাড়ীর চাকা প্রভৃতিও তৈয়ার করিতেছেন। লৌহ শিল্পে টাটা কোম্পানী ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে।

পরাধীনতাই ভারত-শক্তি বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়। স্বাধীনতার অভাবে ভারতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুখের শোচনীয় অভাব হইয়াছে। শিক্ষার হার ভারতে শতকরা ১০, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৯৫, ব্রিটেনে ১০০, জার্মেনিতে ১০০, এবং জাপানে ৯৫ জন। স্বাস্থ্যের অভাবে ভারতবাসী স্বল্পায়ু। ভারতবাসীর আয়ু গড়ে ২৭ বৎসর, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৯৫, ব্রিটেনে ও জার্মেণিতে ৬২, এবং জাপানে ৪৩ বৎসর। সুখ-সাচ্ছন্দ্যের অভাবে ভারতবাসীর জীবন দুঃখপূর্ণ এবং দুর্বহ হইয়াছে। আত্মহত্যার সংখ্যা ভারতে দশ লক্ষের মধ্যে ৫০, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৫০, ব্রিটেনে ১২৫, জার্মাণিতে ২৭৫ এবং জাপানে ২০০জন। ধর্মপ্রাণ ভারতে এত দুঃখ, দারিদ্র্য ও দৈন্য সত্ত্বেও আত্মহত্যা কম কেন? ভারতবাসী অল্পে সন্তুষ্ট ও শান্তিপ্রিয়। অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও ভারত পল্লীপ্রাণ থাকিবে। এখনও শতকরা ৯০ জন ভারতবাসী পল্লীতে বাস করে এবং শতকরা ৭০ জন কৃষির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। পল্লীর-শ্রী বর্ধনে এবং কৃষির উন্নতি বিধানে ভারত যতই যত্নপর হইবে ততই ভারত শক্তিশালী হইবে। এই দেশে অধুনা কুটীর-শিল্প সমৃদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে গ্রামবাসীর অভাব সহজে দূর হইবে। কুটীর-শিল্পে প্রাচীন ভারত অতিশয় উন্নত ছিল। নেপালের হাতে-তৈয়ারী কাগজ এক হাজার বৎসর টিকিতে পারে। ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। 'ভারত আবার জগৎ মাঝারে শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' শিল্পে ও শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে ও সমৃদ্ধিতে, ধর্মে ও বিজ্ঞানে, সর্ব বিষয়ে ভারত আবার আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র-সংঘে শ্রেষ্ঠ হইবে।

ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য উদিতপ্রায়। দেশ-প্রেমিক কবি সত্যই গাহিয়াছেন, 'এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।' কিন্তু পরাধীন ভারতে আমাদের জন্ম। তাই স্বাধীন ভারতে মরিবার বড় সাধ। জগদীশ্বর আমার এই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।

ভারত অমর। ভারতের অমরত্ব ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্যার যদুনাথ সরকার[১] দেখাইয়াছেন যে, এই বিশাল ভারত যুগে যুগে ঐক্যবদ্ধ হইয়া অমরত্ব রক্ষা করিয়াছে। ভারতের নানা প্রদেশ, ভাষা, জাতি ও ধর্মের বৈচিত্র্যের পশ্চাতে সনাতন ঐক্য বর্তমান। স্যার হারবার্ট রিসলে তাঁহার গ্রন্থে[২] স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "ভৌগোলিক, সামাজিক, ভাষা, প্রথা, ধর্ম্ম, ও ব্যবহারের যে বিবিধ বৈচিত্র্য ভারতকে বৈদেশিক পর্যবেক্ষকের চক্ষে আশ্চর্য করিয়া তুলিয়াছে, সেই বৈচিত্র্যের পশ্চাতে জীবনগত, সংস্কৃতিমূলক যে সাম্য ও ঐক্য বিদ্যমান তাহা অখণ্ড, তাহা অবিভাজ্য। বাস্তব পক্ষে যে উন্নত ভারতীয় চরিত্র, সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তিত্ব বহু যুগ ধরিয়া গঠিত হইয়াছে তাহা ভাগ করা যায় না। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ইহা সমভাবে বিদ্যমান। ভারত এক, ভারত অমর। প্রবুদ্ধ ভারতে সেই প্রাচীন চরিত্রই বিকশিত হইবে।

---

১ স্যার যদুনাথ সরকার প্রণীত India through the Ages দ্রষ্টব্য।

২ People of India—by Sir Herbert Risley (২য় সংস্করণ, ২৯৯ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

তিন

# ভারতের জাতি ও রাষ্ট্র *

বিগত অর্ধ শতাব্দীরও অধিক স্বাধীনতা-আন্দোলনের ফলে দেশীয় লোকনায়কগণের মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে—'ভারতে কি জাতি বা কি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে?' মিঃ জিন্নার মতে পাকিস্থান, মিঃ সাভারকরের মতে হিন্দুস্থান এবং গান্ধীজীর মতে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় স্বাধীন রাষ্ট্রই এই দেশে স্থাপিত হইবে। সম্প্রতি দেরাদুন রোটারি ক্লাবে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে কয়েকটী সারগর্ভ ও মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্তমান ভারতকে হিন্দুস্থানে ও পাকিস্থানে বিভক্ত করিলে দেশের সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইবে না। কারণ জিন্নার জামাই জনৈক পার্শী এবং পেশোয়ারের ডাঃ খানসাহেবের জামাই জনৈক খ্রীষ্টান। উভয়ের পৌত্রাদির জন্য অন্য একটী 'স্থান' আবশ্যক। স্যার যদুনাথ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখাইয়াছেন যে, সমগ্র ভারতে সংস্কৃতিমূলক এক অখণ্ড ঐক্য বিদ্যমান। অতীত ভারতে কি জাতি ও কি রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছিল এবং বর্তমান ভারতে কি জাতি ও কি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার সমধিক সম্ভাবনা—এই জটিল বিষয়ের আলোচনা সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে করা হইতেছে। অতীতের আদর্শ নিশ্চিত হইলেই বর্তমানের আদর্শ আপনিই ধরা দিবে। বর্তমান অতীতের প্রতিচ্ছবি মাত্র। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মানব সমাজের অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

জাতি এবং রাষ্ট্রের স্বরূপ কি—এই বিষয়ে বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পর হইতে বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। জি. পি. গুস, জে. এল. ষ্টক্স, ইস্রেল জ্যাংউইল, জিমারিন, মুইর, এস. হার্বাট এবং বানার্ড জোসেফ প্রমুখ নবীন

* সংহতি, ফাল্গুন, ১৩৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত

মনীষীগণ রাষ্ট্র-তত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়া স্ব স্ব সিদ্ধান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে ব্লুণ্টশ্লি, ম্যাট্‌সিনি, প্লেটো, লাইটেন ও জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণের অবদানও বিপুল। ভারতেও এই বিষয়ের আলোচনা কিছু কম হয় নাই। অধ্যাপক হেইস ( Prof. Carlton J. H. Hayes ) সাহেবের মতে রাষ্ট্র ( ষ্টেট ) ও জাতির ( নেশনের ) স্বরূপ ভিন্ন। ষ্টেট প্রধানতঃ একটী রাজনীতিমূলক সংহতি ; কিন্তু জাতির মূল ভিত্তি সংস্কৃতি। রুশ, জার্মান, গ্রীক, জাপানাদি জাতির উৎপত্তি আকস্মিক নহে। ইহাদের মূলে আছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থিতি। এই অর্থে রাজনৈতিক একতা ব্যতীত জাতির অস্তিত্ব সম্ভব এবং ষ্টেটও একাধিক জাতির সংমিশ্রণে সংগঠিত হইতে পারে।

'রাষ্ট্র' শব্দটীর ইংরেজী প্রতিশব্দ 'ষ্টেট'। গত ইউরোপীয় মহাসমরের পর বিজয়ী জাতিগণ পরাজিত জার্মানীকে পঙ্গু করিবার জন্য মধ্য ইউরোপের রাজ্যগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'ষ্টেটে' বিভক্ত করিয়া দেয়, এবং লীগ অব নেশনস্‌কে উহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে। যথা জার্মেনী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও পোলাণ্ড —এই চারি দেশের কিয়দংশ লইয়া জেকোশ্লোভাকিয়া ষ্টেট সৃষ্ট হয়। জেক্‌ ভাষা ও জেক্‌ ধর্ম হইল এই ষ্টেটের ভাষা ও ধর্ম। এই ষ্টেটে জেক শাসন প্রচলিত হইলে সকলকে জেক ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। এইরূপ করিতে স্বীকার না করাকে দণ্ডার্হ অপরাধরূপে সরকার আদেশ করিলেন। 'লীগ অব নেশনস্‌'এর এই নিয়ম হইতে সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে, রাষ্ট্রে জাতিই প্রধান শক্তি এবং জাতি (রেস্‌) ধর্ম, দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি—রাষ্ট্রের এই পঞ্চাঙ্গ আবশ্যক মত অনুসরণ করা উচিত। উক্ত ষ্টেটগুলি রাজনৈতিক সংহতি মাত্র, নেশন নহে। সেই জন্য উহাদের জীবন দীর্ঘ হয় নাই। জাতি, ধর্ম, দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি—এই পঞ্চাঙ্গ পরিপুষ্ট না হইলে কোন নেশন স্থায়ী হয় না।

এই ষ্টেটসমূহে সংখ্যালঘিষ্ঠ ( minority ) জাতিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য 'লীগ অব নেশনস্‌' অধুনা প্রসিদ্ধ 'মাইনরিটি ট্রীটিজ' ( minority

treaties) নামক নিয়ম সৃষ্টি করেন। যে দলের সংখ্যা সমগ্র লোক সংখ্যার শতকরা কুড়ির কম হয়, তাহারা উক্ত নিয়মাধীনে বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। আর্থার হেণ্ডারসন (Henderson) * এই নিয়মকে 'পাবলিক ল অব দি ওয়াল্ড' (Public Law of the World) রূপে ঘোষণা করিয়াছেন। পল ফউচিল (Paul Fauchille) ৯-১২-২৫ তারিখে লীগ অব নেশনস্-এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে সত্যই বলিয়াছেন যে, এই সমস্যা বিপদ-সঙ্কুল। কারণ সংখ্যালঘিষ্ঠদের সংরক্ষণ অপেক্ষা শক্তি বৃদ্ধিই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। শক্তি বৃদ্ধির ফলে তাহাদের ভেদজ্ঞান বর্ধিত হইবে এবং এই ভেদজ্ঞান ষ্টেটের ধ্বংস সাধন করিবে। পল ফউচিলের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে। স্যার অষ্টিন চেম্বারলেন সত্য গোপন করিয়া স্বার্থ সিদ্ধির লোভে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর লীগ অব নেশনস্-এর কাউন্সিলে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এই নিয়ম সংখ্যালঘিষ্ঠদের সংরক্ষণ ও সুবিধার দ্বারা ষ্টেটের প্রধান জাতিতে অন্তর্ভুক্ত করিবে। কিন্তু চেম্বারলেনের কথা সত্য হয় নাই। কোথায় আজ জেকোশ্লোভাকিয়া ষ্টেট! উক্ত নিয়ম ঐ ষ্টেটকে সংহত করিতে সমর্থ হয় নাই। হাঙ্গেরীগণ হাঙ্গেরীতে, ও সুডেটান্‌গণ জার্মানীতে সংলগ্ন হওয়ায় উক্ত ষ্টেট 'পুনর্মূষিক' হইয়াছে। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রমুখ প্রাচীন জাতিগণ স্বীয় স্বীয় রাষ্ট্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করে নাই। ব্রিটিশ সরকার ইংলণ্ডে এই নিয়ম প্রয়োগ না করিয়া ভারতে যে ইহা প্রয়োগ করিতেছেন তাহার একমাত্র কারণ সাম্রাজ্যলিপ্সা। এই নিয়মানুসারে ওয়েলস্, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি পরিপুষ্ট করা উচিত। কিন্তু তাহা না করিয়া ইংলণ্ড এই সব ক্ষুদ্র দেশের ভাষাকে লুপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় ভাষা স্থানীয় লোকগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালাইতেছেন কেন? ধর্ম ও ভাষা যদি রক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য হয়, তবে ইংলিশকে হিন্দুস্থানে প্রচারের জন্য এত প্রচেষ্টা কেন এবং মোটা বেতনভোগী একজন বিশপকে কলিকাতায় রাখিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মপ্রচারের মতলবই

* লীগ অব নেশনস্-এর মাসিক বিবরণ—জানুয়ারী ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ।

বা কি? লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থে * এই সমস্যার সারগর্ভ সমালোচনা ও যুক্তিসঙ্গত সমাধান করিয়াছেন।

এখন আমরা জাতি বা নেশন তত্ত্বটী আলোচনা করিব। জাতির ইংলিশ 'প্রতিশব্দ' নেশন এবং লাটিন প্রতিশব্দ 'নেশিও'। অধ্যাপক জিমারিন বলেন যে, জাতীয়তা বস্তুটী অনুভবের দ্বারা বুঝা যায়, বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। একটা রেসের ( Race ) অতীত ও অনাগত আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও সামাজিক প্রথা প্রভৃতি অসংখ্য ভাবের সমষ্টি এই জাতি। রেমানের মতে জাতীয়তা বাহিরের বস্তু নহে, ইহা অন্তরের একটি ভাব পদার্থ। শুধু তাহাই নহে; ইহার একটি সুন্দর আধ্যাত্মিক স্বরূপ আছে। এস. লেভি তাঁহার 'Out of Bondage' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, "জাতীয়তা বস্তুটী জাতির অমর সম্পদ। বিদেশী শত্রু আসিয়া দেশের সব কিছুই ধ্বংস করিতে পারে; কিন্তু এই বস্তুটী নষ্ট করিতে পারে না। এই বস্তুটী পুনরায় আবার ভবিষ্য জাতির জীবনে, সাহিত্যে, শিল্পে, প্রথায় ও রুচিতে আত্মপ্রকাশ করিবে।" পারস্য দেশে ইসলামের অত্যাচারে পার্শী ধর্ম ও সংস্কৃতি লুপ্ত হয় এবং পার্শীগণ দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আজ আবার তাহাই পারস্যে মাথা তুলিয়াছে এবং ইসলামকে প্রভাবান্বিত করিয়া পত্রপুষ্পে শোভিত হইতেছে। ইহুদি দার্শনিক আহাধাআম ( Ahadha'am ) সেই জন্য বলেন যে, একটি জাতির অধিকাংশ লোক যদি জাতীয়তাহীন হয় এবং মুষ্টিমেয় লোকও যদি এই বস্তুকে সংগোপনে রক্ষা করে, তবে ইহা কালক্রমে সমৃদ্ধ হইয়া পূর্ববৎ একটী জাতি সৃষ্টি করিবে। ইহুদীগণ এক সময় স্বদেশ প্যালেষ্টাইন হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল; কিন্তু ইহুদিগণ বিদেশেও স্বদেশ-প্রীতি ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই ইহুদি জাতির পুনর্গঠন এবং প্যালেষ্টাইনে তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। বিখ্যাত জার্মান রাজনীতিবিৎ ব্লুণ্টশ্লি বলেন যে, বিভিন্ন প্রথা,

* "India and the League of Nation's Minority Treaties."

পেশা ও প্রকৃতির লোকে যখন একটা সভ্যতার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও একতাবদ্ধ হয় এবং এক ভাষা ও সংস্কৃতির অধীন হয় তখনই উহা জাতিতে বা রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অধ্যাপক হোল কোম্বি, বার্জেশ, গেটেল ও ফাউলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এই ভাবে জাতীয়তার সংজ্ঞা দিয়াছেন।

ভারতে 'রাষ্ট্র' শব্দটী বেদের মতই প্রাচীন। ইংলিশ শব্দ 'নেশনের' যাহা অর্থ, 'রাষ্ট্র' শব্দে তাহা আছে। এই মহাভারতে এক সময় 'পৃথিব্যৈ সমুদ্রপর্যন্তায়া একরাট্' অর্থাৎ সমুদ্র হইতে সমুদ্র পূর্ব-পশ্চিমে এক রাষ্ট্র ছিল। 'পশুধান্যহিরণ্যসম্পদা রাজতে শোভতে' ইতি রাষ্ট্রম্। এই মহারাষ্ট্র পশু, ধান্য ও হিরণ্যাদি সম্পদে পূর্ণ ছিল। উক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত দেশ, জনপদ ও জাতি ছিল। 'ভর্তুর্দন্ত-কোষবৃদ্ধিং দিশতি দদাতি' ইতি দেশঃ। অর্থাৎ যাহা ভর্তার ( রাজার ) দন্ত ( শক্তি ) ও কোষ বৃদ্ধি করে তাহা দেশ। গৌতম তাঁহার 'ন্যায়-সূত্রে' বলেন, 'সমান-প্রসবাত্মিকা জাতি'; অর্থাৎ যাহাদের জন্ম একটী সাধারণ সংস্কৃতিতে হয় তাহারাই জাতি। জাতি বা দেশ ও জনপদ প্রায় সমানার্থক। 'জনস্য বর্ণাশ্রমলক্ষণস্য দ্রব্যোৎপত্তেঃ স্থানমিতি জনপদঃ।' বর্ণ ও আশ্রম ধর্মীগণ যে স্থানে সমৃদ্ধ হয় তাহাই জনপদ। মনুসংহিতাতে আছে, এই ভারতে এক মহাজাতি বা মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু যুগ বর্তমান ছিল। মনু মহারাজ বলেন—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥

অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানবগণ এই দেশে ( ভারত ) জাত অগ্রজ ( ব্রাহ্মণ ) গণের নিকট হইতে স্ব স্ব কর্তব্য শিক্ষা করিতে আসিবে। আদি কাল হইতে হিন্দুগণই এই দেশে বাস ও রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রী এম. এস. এ্যানে একটী পুস্তকের ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, "এই মহাভারত প্রধানতঃ হিন্দু জাতির উৎপত্তিস্থান ও আবাসভূমি। মহাভারত প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থান।" অধ্যাপক

এম. এস. গোলবলকার তাঁহার সুচিন্তিত গ্রন্থে * বলিয়াছেন যে, কোন বিদেশীর আক্রমণের পূর্বে হিন্দুগণ এই মহাদেশে অন্ততঃ আট দশ সহস্র বৎসর বাস ও রাজত্ব করিয়াছেন। রামায়ণে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার এক অদ্ভুত চিত্র আমরা পাই। হিন্দু রাজার স্বদেশভক্তি অতুলনীয় ও অতিপ্রাচীন। রাজা রামচন্দ্র রাবণবধান্তে যখন লঙ্কার অধিপতি হইলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন না করিয়া লঙ্কায় রাজত্ব করিতে বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন :—

অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে লক্ষ্মণ রোচতে।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

অর্থাৎ লক্ষ্মণ, লঙ্কা স্বর্ণময়ী হইলেও ইহাতে আমার রুচি নাই; কারণ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী। মহাভারতের যুগে হিন্দু সভ্যতা যে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরূঢ়া ছিল তাহা ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন। আর বৌদ্ধ যুগে হিন্দু সভ্যতা ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বিস্তৃত হয়। হিন্দু সভ্যতাই ত সুদূর প্রাচ্যকে সুসভ্য করে—ইহা ঐতিহাসিক ওয়াডেলের ( Waddell ) অভিমত। বৌদ্ধ সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতির বিকাশমাত্র। ব্রহ্মদেশের ভিক্ষু উত্তম নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে কাণপুরে ১৯৩৫ খ্রীঃ এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধগণও ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়া হিন্দু। ভগবান বুদ্ধ সত্যই বৃহত্তর বঙ্গের স্রষ্টা। হিন্দু সভ্যতায় রাষ্ট্রসৃজনী এবং জাতি-সংগঠনী শক্তি আছে। অশোক, হর্ষবর্ধন, বিক্রমাদিত্য, পুলকেশী ও গুপ্তবংশের সম্রাটগণ বৌদ্ধ যুগেই আবির্ভূত হন। বিজয়নগরের সম্রাটগণ, ছত্রপতি শিবাজী, রণজিৎ সিংহ, বাংলার প্রতাপাদিত্য, চিতোরের রাণা প্রতাপ প্রভৃতি হিন্দু সম্রাটগণ হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। যদি জয়সিংহ আওরঙ্গজেবের সেনাপতিত্ব গ্রহণপূর্বক হিন্দু সাম্রাজ্য ধ্বংস না করিতেন তাহা হইলে বর্তমান ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। আট শত

* We or Our Nationhood Defined.

বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধের পরেও হিন্দু সম্রাটগণ বিজয়ী হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শিবাজীর পুত্রকে বন্দী ও বধ করেন। শিবাজীর সময়ই হিন্দু পতাকা গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত হয়। ছত্রপতি শিবাজী সেনাপতি জয়সিংহকে আওরঙ্গজেবের সহায়তা না করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে আজও হৃদয় দ্রবীভূত হয়। বিদেশী ঐতিহাসিকগণ পাঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে হিন্দু শক্তির পুনরুত্থানকে এবং সিপাহি বিদ্রোহকে 'দস্যু-বিপ্লব' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য!

ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান। মহাভারত হিন্দুদেশ। কারণ হিন্দু জাতি, হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু ভাষা ও হিন্দু ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থল এই পুণ্য ভূমি। এই দেশে আবহমান কাল হইতে হিন্দু সভ্যতা রাজত্ব করিয়াছে। সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ এই মহাদেশ সেমিটিক সভ্যতা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পরও ইহা হিন্দুস্থানই আছে। ভবিষ্যতেও ভারত হিন্দুস্থান থাকিবে। হিন্দু সংস্কৃতি সনাতন, অবিনশ্বর। অন্য কোন সভ্যতা উহাকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। অন্য যে সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতিকে পরাভূত করিতে চাহিবে সে নিজেই পরাভূত হইবে। জেনারেল স্মাটস্ মহাত্মা গান্ধীকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগকে আমরা ভয় করি না; কিন্তু তোমাদের সভ্যতা (culture)কে আমরা খুব ভয় করি।" বৌদ্ধ যুগে শক, হুন প্রভৃতি বিদেশীগণ যে ধর্ম ও সভ্যতা আনিয়াছিলেন তাহার চিহ্নও ভারতে আর পাওয়া যায় না। পার্শীগণ এত কাল বাস করিয়া হিন্দুস্থানে হিন্দু-ভাবাপন্নই হইয়াছে। গুজরাটী আজ তাহাদের মাতৃভাষা। হিন্দু আচার-ব্যবহার তাহারা গ্রহণ করিয়াছে এবং হিন্দুদের সহিত তাহাদের বিবাহও চলিতেছে। পণ্ডিত জহরলালের জামাই জনৈক দেশীয় পার্শী। খ্রীষ্টানগণও ক্রমশঃ ভারতীয় ভাবে ভাবিত হইতেছেন। ইসলামের উপর হিন্দু প্রভাবের নামই সুফীবাদ। এই মুসলমানগণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ইচ্ছার মূলে আছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র! বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী এই দেশ হইতে অদৃশ্য হইলেই মুসলমানগণ ধীরে ধীরে ভারতীয় ভাবে অভিভূত হইবে। হিন্দু শব্দটী এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রাহ্ম, আর্য্য, শিখ, জৈন, বুদ্ধ ও পার্শী সকলেই হিন্দু।

কারণ ইহারা সকলেই হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত এবং হিন্দুদের সহিত ইঁহাদের বিবাহাদিও চলিতেছে। তাই বীর সাভারকার বলিয়াছেন :—

আসিন্ধু সিন্ধু-পর্য্যন্তা যস্য ভারত-ভূমিকা।
পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহার নিকট পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি তিনিই হিন্দু।

যাঁহারা হিন্দুস্থানকে মাতৃভূমি ও পুণ্যভূমিরূপে শ্রদ্ধা করেন না, তাঁহাদের স্বদেশ-প্রীতি অগভীর। নিম্নোক্ত উদাহরণ হইতে তাহা স্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে। স্বর্গীয় বিঠলভাই পাটেল বিদেশে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুশয্যায় এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সব কিছু যেন হিন্দুস্থানে প্রেরিত হয়; কারণ হিন্দুস্থান তাঁহার স্বদেশ। আর মৌলানা মহম্মদ আলীরও মৃত্যু হয় বিদেশে। তিনি মৃত্যুর পূর্বে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সব কিছু যেন মক্কাতে প্রেরিত হয়। কারণ হিন্দুস্থান তাঁহার প্রবাস স্থল, বিদেশ ভূমি এবং আরবই তাঁহার স্বদেশ!! এই ভাব স্বদেশ-ভক্তির প্রতিকূল। এইরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ভারতবাসী নহে, ভারত-প্রবাসী। হিন্দুস্থানে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ভারত-প্রবাসীগণের সহায়তা সম্ভব নয়। সেই জন্য ভারত-প্রবাসীগণ হিন্দু নহেন। যে সকল মহানুভব মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্য ধর্মাবলম্বী ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি ও পুণ্য ভূমিরূপে ভালবাসেন ব্যাপক অর্থে তাঁহারা হিন্দুই। তাই সাভারকর প্রমুখ হিন্দুনেতা বলিয়াছেন, "যে সকল আন্দোলন হিন্দু সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং তদনুযায়ী রাষ্ট্রগঠনে সাহায্য না করে তাহারা জাতীয় আন্দোলন নহে। তাহাদের দ্বারা দেশের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক হইবে।"

অতীতে স্বাধীন ভারতে হিন্দু জাতি ও রাষ্ট্রই ছিল এবং ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতেও প্রধানতঃ হিন্দু জাতি ও হিন্দু রাষ্ট্রই সংগঠিত হইবে। আমেরিকার জাতি গঠিত হইয়াছে ইউরোপের নানা জাতি লইয়া; কিন্তু তাহারা সকলেই আমেরিকাকে স্বদেশ জ্ঞান করেন। জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, দেশ ও ভাষা—

রাষ্ট্রে এই পঞ্চাঙ্গ ভারতে মূলতঃ হিন্দু। দেশ ব্যতীত রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব। ইহুদীগণ মাতৃভূমি প্যালেষ্টাইন হারাইয়া এবং পার্শীগণ জন্মভূমি পারস্যদেশ ত্যাগ করিয়া আর রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে নাই। স্বাভাবিক প্রাচীর বেষ্টিত এই ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান ও হিন্দুরাষ্ট্রের উপযুক্ত। মহাভারত হিন্দুজাতিরই উৎপত্তি ও বর্তমান আবাসভূমি। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতি এই দেশের মাটি, জল ও বায়ুতে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে। অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতি এদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না---ইতিহাসই তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। আফগানিস্থান এক সময় হিন্দুরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ ছিল। ইহার পূর্বনাম গান্ধার। প্রথমে ইহা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে এবং পরে ইসলামের অধীন হইয়াছে। বেলুচিস্থানের অবস্থাও এইরূপ। সুতরাং অধুনা হিন্দুস্থানে হিন্দুধর্মের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। হিন্দুধর্ম জাগ্রত থাকিলে অন্য ধর্ম ইহাকে গ্রাস করিতে পারিবে না। বর্তমান ভারতের সমস্ত ভাষাই হিন্দুভাষা। সিন্ধীভাষা ও উর্দুভাষা ফার্সী হরফে লিখিত হইলেও সংস্কৃত শব্দ এই ভাষাদ্বয়ে প্রচুর। সম্প্রতি জনৈক সিন্ধী পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সিন্ধী ভাষার শতকরা ৮০টী শব্দ সংস্কৃত। যেমন মুসলমানী গুজরাটী ভাষা, মুসলমানী বাংলা ভাষা, মুসলমানী হিন্দু ভাষা আছে তেমনি আবার হিন্দু-সিন্ধী ভাষা ও হিন্দু-উর্দুভাষাও আছে। ভাষা যতই সমৃদ্ধ হইবে ততই আরবী ও ফার্সী প্রভাব বিসর্জন করিবে। মহাত্মা গান্ধী সত্যই একবার লিখিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতভাবাপন্ন না হইলে কোন ভাষা হিন্দুস্থানে সমৃদ্ধ হইতে পারিবে না; বরং অবনত হইবে। ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

সুতরাং এই হিন্দুস্থানে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনই সম্ভব এবং সহজ; অন্য চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। স্বাধীন ভারতে যে রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা কালে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হইবে। কোন শক্তিই হিন্দুজাতিকে হিন্দুস্থানে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য।

## চার

# হিমালয় ও ভারত সংস্কৃতি *

শ্রীভগবান্ গীতা মুখে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি 'পর্বতানাং হিমালয়ঃ'। অর্থাৎ পর্বতসমূহের মধ্যে হিমালয়ই তাঁহার অন্যতম বিরাট রূপ। হিমালয়ের মহিমা ও বিশালত্ব হিন্দু মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে। ভারতের সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত হিন্দুগণ গিরিরাজকে আন্তরিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। মুসলমানের নিকট মক্কা যেমন বা খ্রীষ্টানের নিকট জেরুজালেম যেমন, হিমালয়ও হিন্দুর নিকট তদ্রূপ দেব-স্থল। ভারতীয় সাহিত্যের সামান্য আলোচনার দ্বারা জানা যায়, হিন্দু সাহিত্য বা পুরাণ শাস্ত্র হিমালয়কে জগতের কেন্দ্র এবং মহাদেবের সিংহাসনরূপে নির্দেশ করেন। হিন্দু শিল্প, ভাস্কর্য, ধর্ম ও স্থাপত্যকে, এক কথায় হিন্দু সংস্কৃতিকে কি ভাবে হিমালয় প্রভাবিত করিয়াছে তাহাই বর্তমান অধ্যায়ে আলোচ্য।

জনৈক আধুনিক হিন্দু মনীষী সত্যই বলিয়াছেন, 'হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ হিমালয়জাত। মানব জাতির এই প্রাচীনতম গ্রন্থের জন্মস্থান হিমাচল।' স্বামী বিবেকানন্দের মতে হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরাখণ্ডে বৈদিক ঋষি এবং ঔপনিষৎ সত্যদ্রষ্টাগণ নিবাস করিতেন। স্বামীজী একদা পাশ্চাত্যে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, 'কিরূপে ভারতের উষ্ণ জলবায়ুতে হিন্দুগণ এরূপ সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন?' তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে পনের হাজার ফুট উচ্চ হিমাচলে এই দার্শনিক চিন্তা উৎপন্ন।" ইংরাজ কলাতত্ত্ববিৎ হ্যাভেল মন্তব্য করিয়াছেন, "বৈদিক মন্ত্রের রচয়িতা ও সংকলয়িতা প্রাচীন আর্যগণ হিমালয় প্রদেশে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের হিমালয়স্থ ভবনের চতুর্দিকে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাঁহাদের উচ্চ চিন্তা ও

---

* মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৫৬ সাল।

সরল জীবনযাত্রার আদর্শ প্রভাবে তাঁহারা কোন মন্দির বা মূর্তি নির্মাণ করেন নাই। স্বর্গ ও মর্ত্যের নির্মাতা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তাঁহাদের সম্মুখে যে বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।"

প্রাচীন হিন্দুগণ হিমাচল হইতে যতই দূরে যাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহারা তাঁহাদের আদি পরিবেষ্টনীর গভীর স্মৃতি মনে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের ধর্মানুষ্ঠানের ও শিল্পের প্রতীকাদিতে এবং সাহিত্যে রূপায়িত করিলেন। হিমালয়ে তীর্থযাত্রা এবং চিরতুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যস্থিত তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে গমন ধার্মিক হিন্দুর জীবন-স্বপ্ন। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, অমরনাথ, ও পশুপতিনাথ, কৈলাস পর্বত ও মানস সরোবর প্রভৃতি দুর্গম তুষারতীর্থে গমন এবং তত্রস্থ দেবস্থানসমূহে তপস্যাদিতে প্রাণপাত হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। হিমালয়ে তীর্থযাত্রার প্রাচীনতম বর্ণনা পাওয়া যায় মহাভারতের অন্তিম পর্বে। উক্ত মহাকাব্যে আছে, কিরূপে পাণ্ডব ভ্রাতাগণ জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক দেবভূমি কৈলাসে প্রস্থান করেন। মহাভারতের মতে, পুণ্য পর্বত কৈলাসের এমন মাহাত্ম্য আছে যে, লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পক রথে কৈলাসে যাইয়া উহার নিম্নে একটি গর্ত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কৈলাস পর্বতকে লঙ্কায় লইয়া যাইয়া তাঁহার শত্রু রামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিবেন। পার্বতী গিরিকম্প অনুভবপূর্বক শিবের দুইহাত জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা করেন। কিন্তু মহাদেব দশানন রাবণের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ না হইয়া পদভারে রাবণকে স্বকৃত গর্তে আবদ্ধ করিলেন। তথায় রাবণকে সহস্র বৎসর কারাবদ্ধ থাকিতে হয় এবং কঠোর তপস্যার ফলে তিনি কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ করেন।

হিমালয় শীর্ষস্থ স্বর্গের কেন্দ্রস্থলে সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ষোল হাজার ফুট উচ্চে অদ্ভুত মানস সরোবর অবস্থিত। কথিত আছে, ইহার ঘন নীল সলিলে স্রষ্টার মন প্রতিবিম্বিত হয়। ভারতীয় প্রবাদ অনুসারে মানস

সরোবর আর্য্যাবর্তের নদীসমূহের উৎস-স্থল। সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার উৎপত্তি স্থানত্রয় ইহার অনতিদূরে অবস্থিত। এক অর্থে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ, কেন হিন্দুগণ ইহার প্রতি এত শ্রদ্ধান্বিত? বিষ্ণুপুরাণ মতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সিংহাসন পদ্মের বীজপাত্রের ন্যায় কৈলাস পর্বতের পার্শ্বে বিরাজমান। হিমালয় বর্ণনায় বায়ু-পুরাণ দীর্ঘ, শ্বেতবর্ণ, শিবপ্রিয় ধুতরা ফুলের ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দু প্রবাদ মতে, চিরতুষারাবৃত কৈলাস-শৃঙ্গ দেবযোগী শিব এবং গিরিসুতা পার্বতীর আবাসভূমি। আস্তিকগণ, এমন কি নাস্তিকগণও, চিরতুষার গিরিশৃঙ্গের গভীর নির্জনতায় পরমার্থ সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করেন। যখন তুষারাবৃত শৃঙ্গশ্রেণী উদীয়মান বা অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যালোকে প্লাবিত হয় তখন ভাবুকের মনে এই ভাব জাগ্রত হয় যে, সাক্ষাৎ মহাদেব মহাধ্যানে চিরমগ্ন। রাত্রিকালে জ্যোৎস্না-স্নাত তুষারশৃঙ্গসমূহ রজতগিরিতুল্য প্রতিভাত হয়। শিবধ্যানে উক্ত ভাব এই ভাবে প্রকাশিত, 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং' ইত্যাদি। সুদীর্ঘ হিমালয় শ্রেণীর বিশালত্ব, উচ্চতা প্রভৃতি দর্শনে ক্ষণকালের জন্য মন অভিমানমুক্ত ও বিস্ময়াবিষ্ট হয়। প্রকৃতি সৃষ্ট দিব্য গিরিশ্রেণী তে দেবগণ বাস করেন। সেইজন্য হিমালয় দর্শনে দর্শকের মনে এই সুন্দর দৃশ্যের পশ্চাতে যে পরমার্থ সত্তা বিদ্যমান, তাঁহার চিন্তা উদিত হয়। এই দিব্য দৃশ্যের কথা কালিদাস তাঁহার 'মেঘদূতে' বলেন, 'অভ্রংলিহ শৃঙ্গসমূহ পদ্মের ন্যায় আকাশ পরিপূর্ণ করে।' মহাকবি তাঁহার 'কুমারসম্ভবে' রাজা হিমবান্‌কে পৃথিবীর রাজকীয় স্তম্ভ এবং মেঘোপরি মানদণ্ডরূপে বর্ণনা করেন। জাপানী পর্যটক ইকো কুয়াগুচি তাঁহার 'তিব্বতে তিন বৎসর' শীর্ষক ইংরাজী পুস্তকে হিমালয়-স্মৃতি এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন!—'কৈলাস শৃঙ্গ চতুষ্পার্শস্থিত শৃঙ্গশ্রেণীর ঊর্ধ্বে এমন বিরাট ভাবে দণ্ডায়মান যে, আমার মনে হইল উহা পঞ্চ সহস্র শিষ্যকে শান্ত ভাবে উপদেশ দানে রত ভগবান্ বুদ্ধের বিরাট মূর্তি।' হিন্দুপুরাণ মতে, হিমালয় গিরিসুতা পার্বতী শিবপত্নী, পবিত্রতা ও ভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ সতী। আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধির হিন্দু আদর্শ ঘনিষ্ঠ ভাবে হিমালয়ের সহিত

বিজড়িত। একটি পৌরাণিক প্রবাদে আছে, গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে সগর-পুত্রগণের পাপ ধৌত করিবার জন্য কৈলাস-শিখরে শিবশিরে সপ্ত ধারায় পতিত। ভারত-শিল্পতত্ত্বজ্ঞ ইংরাজ মনীষী হ্যাভেল বলেন, 'কৈলাস-শিখরের সাতটি জলপ্রপাত দর্শনে গঙ্গার স্বর্গীয় উৎপত্তির কথা নিঃসন্দেহে কবি-মনে জাগ্রত হয়।' কালিদাস তাঁহার 'কুমারসম্ভব' কাব্যে বলেন—

মহেশ্বরজটাজুটবাসিনী পাপনাশিনী।
সগরান্বয়নির্বাণকারিণী ধর্মধারিণী॥
বিষ্ণুপাদোদকোদ্ভূতা ব্রহ্মলোকাদুপাগতা।
ত্রিভিঃ স্রোতোভিরশ্রান্তং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ১০—২৯।৩০

অনুবাদ—মহাদেবের জটাজুটে বাসকারিণী পাপনাশিনী সগর-বংশের নির্বাণদায়িনী ধর্মধারিণী গঙ্গা বিষ্ণুর পাদসম্ভূতা ব্রহ্মলোকে উৎপন্না হইয়া ত্রিধারায় অবিরত ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন।

পৃথিবীর এই দীর্ঘতম ও উচ্চতম পর্বতটিকে হিন্দুধর্ম দেবতুল্য জ্ঞান করেন ভারতীয় পুরাণে ও কাব্যে হিমালয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের মন্দিররূপে বর্ণিত হিন্দু ত্রিমূর্তির বিরাট বিগ্রহরূপে গিরিরাজ পূজিত। শৈবগণ হিমাচলকে বিরাট শিবরূপে শ্রদ্ধা করেন। বৈষ্ণবগণের নিকট নগাধিরাজ সাক্ষাৎ বিষ্ণু। সমগ্র হিন্দু ভারতের জন্য প্রকৃতি দেবী হিমালয়-রূপ বিশাল মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। এই দিব্য পর্বতের অনুকরণে হিন্দু স্থপতিগণ মন্দির নির্মাণ করেন। শৈব মন্দিরসমূহ কৈলাস-শিখরের প্রতীকরূপে নির্মিত। বিষ্ণু-মন্দির পৌরাণিক মেরু-পর্বতের প্রতীকস্বরূপ। স্বর্গ-মর্ত্যের সেতুস্বরূপ সুদীর্ঘ হিমালয়শ্রেণীর সমন্বয়মূর্তিরূপে মেরু পর্বত বিবেচিত। এমন কি, শিবমূর্তির ন্যায় বিষ্ণুমূর্তিও হিমালয়ের মূর্ত দেহরূপে কল্পিত। কৈলাসের তুষারশৃঙ্গ যেমন শিবের মুকুটরূপে বিবেচিত হয়, তেমনি কখন কখন সুমেরু শৃঙ্গ বিষ্ণুর শিরোমুকুটরূপে কল্পিত হয়। হিমালয় হিমাবৃত বলিয়া শিবমূর্তিও তুষার-ধবল। দূর হইতে দৃষ্ট তুষারশৃঙ্গ হিমরেখার নিম্নে প্রায়ই নীলহারযুক্ত প্রতীত হয় বলিয়া মহাদেব নীলকণ্ঠ।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে আছে, সপ্তর্ষি কৈলাসের দেব-তাপসের সহিত গিরিসুতা উমার পরিণয়ের সম্মতির জন্য হিমবানের নিকট আসিয়াছিলেন। উক্ত সপ্তর্ষির অন্যতম বলেন—

মনসঃ শিখরাণাঞ্চ সদৃশী তে সমুন্নতিঃ ॥
স্থানে ত্বাং স্থাবরাত্মানাং বিষ্ণুমাহুস্তথা হি তে ॥
চরাচরাণাং ভূতানাং কুক্ষিরাধারতাং গতঃ ॥ ৬—৬৬।৬৭

অনুবাদ—তোমার সমুচ্চ শিখরসমূহের ন্যায় তোমার মনও সমুন্নত। ইহা যুক্তিযুক্ত যে, তোমার পর্বতদেহকে বিষ্ণু বলা হয়। কারণ, তোমার এই বিশাল দেহে সংসারের সকল স্থাবর ও জঙ্গম বস্তু বিদ্যমান।

এই পুণ্য পর্বত হিন্দু-হৃদয়ে সমাধিমগ্ন দেবযোগীর চিত্র অঙ্কিত করে। এই সম্বন্ধে মহাকবি উক্ত পুস্তকে একই হিন্দু-মনোভাব এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। হিমালয়স্থ তপোবনে যোগাসনে মহাদেব এই ভাবে সমাধিস্থ—

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥
কপালনেত্রান্তরলব্ধমার্গৈর্জ্যোতিপ্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ।
মৃণালসূত্রাধিকসৌকুমার্য্যাং বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ ॥ ৩—৪৮।৪৯

অনুবাদ—সমাহিত মহাদেবকে বৃষ্টিহীন মেঘের ন্যায়, নিস্তরঙ্গ জলরাশির ন্যায়, এবং নির্বাতস্থলে অবস্থিত নিশ্চল প্রদীপের ন্যায় বোধ হইল। যে তেজোময় অঙ্কুর তদীয় ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নির্গত হইয়া কপালনেত্রের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে তদ্দ্বারা তিনি বালচন্দ্রের মৃণালসূত্র অপেক্ষাও অধিকতর সুকুমার কান্তিকে পরাভূত করিতেছেন।

হিমালয়ের প্রতীক হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড ও শিল্পকলাকে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে এখন আলোচনা করিব। হিন্দু জগতে শিল্প কখনও ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ইহা মনে রাখিয়া এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইংরাজ শিল্পতত্ত্ববিৎ হ্যাভেল ভারতীয় শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ববাদিসম্মত বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, "শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পের আদর্শ

জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রাত্যহিক কর্ম ও ব্যবহারকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করা। মার্কিণ মনীষী এমার্সনের মত খাঁটী হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, সৌন্দর্যকে ধর্মের জন্য অন্বেষণ না করিয়া যদি শুধু সৌন্দর্যের জন্য সৌন্দর্যকে অন্বেষণ করা হয়, তাহা হইলে ইহা অন্বেষণকারীকে অবনমিত ও দুর্নীতিপরায়ণ করে। হিন্দুর নিকট শিল্পসাধনা অন্যতম ধর্মানুষ্ঠান এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের উপায়। প্লেটানিক মনীষিগণের ন্যায় হিন্দু দার্শনিক পার্থিব সৌন্দর্যের সহায়ে ভাব-জগতে উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সচেষ্ট হন। সেই জন্য ভারতীয় শিল্পের আদর্শ ধর্ম-ভিত্তিতে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত।" প্রায়ই দেখা যায়, ভারতীয় শিল্প ও ধর্মে হিমালয়ের প্রতীক পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত। পৌরাণিক মতে এশিয়া মহাদেশ চতুর্দল পদ্মরূপে কল্পিত। কৈলাস পর্বতে ব্রহ্মার নগর উক্ত পদ্মের কোরক। এই বিশ্ব-পদ্মের কেন্দ্রস্থল কৈলাস। মিশরের প্রাচীন শিল্পে কমল উত্তর মিশরের সুদূর পর্বতের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত। হিমালয় হইতে যেমন গঙ্গাদি নদী প্রবাহিত, তদ্রূপ মিশরের ঐ সকল পর্বতে নীল নদীর উৎস নিহিত। হিমালয়ের তুষাররাশি উপরোক্ত পদ্মের দেদীপ্যমান পত্ররূপে কল্পিত। কারণ সমুদ্রে শায়িত নারায়ণের নাভি-কমলের বৃন্তে চারিটি পত্ররূপে হিমালয়ের পাদদেশস্থ সমতল ভূমিকে চিত্রিত করা হয়।

মহানির্বাণ তন্ত্রে পদ্ম-প্রতীক তত্ত্বের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যাত। উক্ত পদ্মের মূল ব্রহ্ম। এই দুর্বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে সমগ্র সৃষ্টি সমাগত। এই পদ্মের বৃন্তই বিশ্বপ্রসবিনী মায়া, পুষ্পই এই বিশ্ব, ফল মোক্ষ। হ্যাভেল বলেন, অন্যান্য ভারতীয় প্রতীকের ন্যায় পদ্ম-প্রতীকের স্থূল ও সূক্ষ্ম অর্থ আছে। পদ্মের মূল হ্রদ বা নদীর গভীর পঙ্কে নিহিত। ইহার দৃঢ় মূল পঙ্ক ভেদ করিয়া সলিলোপরি ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া স্বর্গের আলোকে সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত করে।

সমাধিতে মানবাত্মার স্ব-রূপ অবগতিরূপ আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য প্রকৃতির নিজস্ব প্রতীক এই জল-কমল। দেহের ও বিশ্বের বিকাশ ও বিলয়ের ক্রম সমান বলিয়া দেহস্থ চক্রগুলিকে যোগশাস্ত্রে পদ্ম বলা হয়। ভারতীয় শিল্পী, ভাস্কর ও চিত্রকরগণ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে বিশ্ব-কমলের

দার্শনিক ভাবটি পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। সাঁচি, বারহুত, বেসনগর, অজন্তা, কার্লি ও এলিফান্টার স্তম্ভসমূহে অতি চমৎকাররূপে উক্ত ভাব ক্ষোদিত আছে। ইলোরাস্থিত পর্বতে যে দেদীপ্যমান মন্দির ক্ষোদিত আছে তাহার নাম কৈলাস। উক্ত মন্দির এমন ভাবে নির্মিত যে, উহা দেখিতে কৈলাসশিখরসদৃশ এবং উপাসককে মহাদেবের হিমালয়স্থ মন্দিরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইলোরাস্থ জলপ্রপাত দর্শনে ভারতীয় মুনির মনে পুণ্য পর্বত কৈলাসের স্মৃতি উদিত হয়। সারনাথের অশোক-স্তম্ভ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে বিশ্ব-পদ্মেরই প্রতিমূর্তি। মানস সরোবরের সহিত উহার প্রতীকগত সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায় না। শিখর নামক উচ্চ মন্দিরচূড়াসমূহে পুষ্প-প্রতীকের ভাব ঘনীভূত। মন্দির-শিখর হিমালয়ের বিশাল শৃঙ্গরাজির প্রতীক।

ভারতীয় শিল্পতত্ত্ববিৎ হ্যাভেল বলেন, বৌদ্ধ সম্রাট্ কনিষ্কের বিখ্যাত ভস্মাস্থি-পাত্রও পদ্ম-প্রতীকের অনুগত। নেপাল, তিব্বত ও অন্যান্য দেশের বৌদ্ধ শিল্পেও একই প্রতীক প্রচলিত। বুদ্ধ, বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার বিরাট মূর্তিসমূহে বিশাল স্তম্ভের ভাবই প্রকটিত! হ্যাভেলের মতে নটরাজ, কৃষ্ণ ও কালীর নৃত্যরত মূর্তিসমূহে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিবের হিমালয়-মন্দিরের ভাবই অভিব্যক্ত। কৈলাস হইতে প্রবাহিত বলিয়া গঙ্গা হিন্দুর নিকট এত পবিত্র! যে হিমালয়-শিখরে মহাদেব বাস করেন তাহা স্মরণ করিবার জন্য শুধু দক্ষিণ ভারতের ভক্ত হিন্দুগণ নহে, সুদূর সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য দেশের হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ স্ব স্ব দেশের পুণ্যতোয়া নদীসমূহের নাম রাখিয়াছেন গঙ্গা। একই উদ্দেশ্যে উপরোক্ত দেশসমূহের হিন্দুগণ হিমালয়স্থ তীর্থসমূহের নামে স্ব স্ব দেশের তীর্থরাজির নামকরণ করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যায়, হিন্দু সংস্কৃতির শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন প্রভৃতি সকল উচ্চ বিভাগের জীবন ও প্রেরণার প্রধান উৎস হিমালয়। এই জন্যই অতি প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাপি কোটি কোটি হিন্দু ও বৌদ্ধ হিমালয়কে এত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। হিন্দু সংস্কৃতির প্রত্যেক শাখায় হিমালয়ের প্রভাব চিরন্তরে মুদ্রিত। সুতরাং ইহা বলা অতিরঞ্জন নহে, বা বিশ্বাস করা

কুসংস্কার নহে যে, বৈদিক ভাবধারা হিমালয়ের দিব্য ক্রোড়ে জাত ও পুষ্ট। যাঁহারা স্বচক্ষে হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী দেখিয়াছেন তাঁহারা অচিরে এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিবেন।

মহাকবি কালিদাস তাঁহার 'কুমারসম্ভব' কাব্যের প্রথমে আঠারটি শ্লোকে হিমালয়ের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটি শ্লোক নিম্নে সানুবাদ উদ্ধৃত হইল :—

সপ্তর্ষিহস্তবিচিতাবশেষাণ্যধো বিবস্বান্ পরিবর্তমানঃ।
পদ্মানি যস্যাগ্রসরোরুহাণি প্রবোধয়ত্যূর্দ্ধমুখৈর্ময়ুখৈঃ॥
লাঙ্গুলবিক্ষেপবিসর্পিশোভৈরিতস্ততশ্চন্দ্রমরীচিগৌরৈ।
যস্যার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং কুর্বন্তি বালব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ॥

অনুবাদ—হিমাচল এত সমুন্নত যে দিবাকরও ইহার শিখরের নিম্নদেশে ভ্রমণ করেন। অতএব উচ্চতর শিখরস্থ পদ্মসমূহের মধ্যে সপ্তর্ষিগণের হস্তোদ্ধৃত কমলরাজির অবশিষ্টগুলিকে সূর্য্যদেব উর্দ্ধমুখ কিরণ দ্বারা প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন। হিমালয় পর্বতসমূহের রাজা। তাঁহার সেই গিরিরাজ নাম সার্থক করিবার জন্য পর্বতবাসী চমরীসমূহ ইতস্ততঃ পুচ্ছ সঞ্চালনপূর্বক শারদীয় চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চামরসমূহ চারি দিকে বিস্তার করিয়া থাকে।

---

পাঁচ

# ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞান *

ভারতের দর্শন, সাহিত্য ও ধর্মের সহিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রহণ করিবার জন্য পশ্চিম আজ দ্বার খুলিয়াছে। আয়ুর্বেদ বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ ইতিমধ্যে ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছে। লণ্ডনে প্রকাশিত "হিন্দুপুর" নামক ইংরাজি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের লেখক শ্রী এস. এম. মিত্র ১৯০৫ খ্রীঃ লণ্ডনে প্রথম হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রচার করেন। তিনি ১৯১৩ খ্রীঃ লণ্ডন ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব্ মেডিসিনে আয়ুর্বেদের প্রতিনিধিস্বরূপে বক্তৃতাদি দেন। ১৯০৫ হইতে ১৯২৫ পর্যন্ত প্রায় বিশ বৎসর কাল তিনি ইংলণ্ড, আমেরিকা ও নরওয়ে প্রভৃতি দেশে ডাক্তার-পরিত্যক্ত বহু হতাশ রোগীকে কবিরাজী ঔষধে আরোগ্য করিয়া আয়ুর্বেদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন ও তথায় ১৯২৫ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন। তিনি "Anglo-Indian Studies" নামক অন্য একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছেন। ১৯১৬ খ্রীঃ বার্ণমাউথের বশকম্ব সহরে মিচেল নামক রসায়নবিৎ আয়ুর্বেদীয় ছাগলাদ্য ঘৃতকে হিমালয়ান ফুড নামে বিক্রয় ও ব্যবহার করিয়া বহু ক্ষয়রোগীকে আরোগ্য করেন। হিন্দু ঋষি চরকের ন্যায় গ্রীসদেশের আদি চিকিৎসক হিপোক্রেটাশও একজন সাধু পুরুষ ও চিকিৎসক ছিলেন। সার ভগবৎ সিংহজী এম. ডি. তাঁহার "A Short History of Aryan Medical Science" নামক পুস্তকে প্রথম প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য জগতের চিকিৎসা-শাস্ত্রের গুরু হিপোক্রেটাশের প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে আয়ুর্বেদ অধিকতর সমুন্নত হইয়াছিল। হিন্দু ঋষিদের নিকট চিকিৎসা-বিজ্ঞানও

---

* উদ্বোধন মাসিকের ১৩৪০ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য ডরোথিয়া বেগমের Some Aspects of Hindu Medical Treatment দ্রষ্টব্য।

বেদ---অপৌরুষেয় বা ধ্যানলব্ধ। মনুষ্য জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে আয়ুর্বেদের উল্লেখ আছে ও উহাকে উপবেদ বলা হয়। দর্শনাদির ন্যায় আয়ুর্বেদও ঋষিবিদ্যা এবং চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থের ভাষা দর্শনের মত লিখিত। যোগিগণই প্রকৃতপক্ষে এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন এবং নাড়ীজ্ঞান প্রভৃতি আয়ুর্বেদ রহস্য অপর কেহ আদৌ বুঝিতে পারেন না। প্রশ্ন উঠিয়াছিল, আত্মাবিহীন (মৃত) শরীরের অসুখ হয় না, অথচ আত্মার রোগ নাই তবে অসুখ হয় কার? তাই দার্শনিক ব্যতীত আয়ুর্বেদে কেহই বুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না।

পঞ্চম শতাব্দীর সংস্কৃত অভিধানে একটী আয়ুর্বেদীয় পরিচ্ছেদ আছে। হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিগুরু ধন্বন্তরি শরীর ও মন উভয়েরই অসুখ স্বীকার করিয়াছেন। মনের রোগ পাশ্চাত্যে মাত্র ১৮৭৬ খ্রীঃ হ্যানিমানের দ্বারা আবিষ্কৃত হইল। ঐতিহাসিক সার উইলিয়াম হাণ্টার বলেন যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে হিন্দু চিকিৎসকগণ অদ্ভুত নিপুণতার সহিত শল্য-চিকিৎসা (সার্জারী) অভ্যাস করিতেন। নানা ইউরোপীয় ভাষায় আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিত হইলেও চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, চক্রদত্ত, রসেন্দ্রসার ও মাধবনিদান নামক আয়ুর্বেদীয় প্রসিদ্ধ ছয় খানি গ্রন্থের অনুবাদ এখনও হয় নাই। কাশীধামই আয়ুর্বেদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমের চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি ছিল আয়ুর্বেদে। রোজশ, এভিশেনা ও সিরাপিয়ান প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আরবী অনুবাদ হইতে আয়ুর্বেদ লাটিন ভাষায় অনুদিত হয়। লাটিন চিকিৎসাগ্রন্থসমূহে চরকের নাম অসংখ্য বার উল্লিখিত আছে। শারীর-স্থানের সংস্কৃত নামগুলির সহিত লাটিন নামেরও অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। সংস্কৃতে শিরোব্রহ্ম, শিরোবিলোম, হৃৎ ও মহাফল প্রভৃতিকে লাটিন ভাষায় যথাক্রমে Cerebrum, Cerebellum, Heart এবং Magnavelo বলে। উত্তর ভারতের গঙ্গায় ও দক্ষিণ ভারতের গোদাবরীতে স্নান করিলে যেমন রোগমুক্ত হওয়া যায়, মিশরের নাইল নদী, প্যালেষ্টাইনের জর্ডন নদী, ইংলণ্ডের টেম্‌স্ নদী প্রভৃতিতে স্নান করিলেও কুষ্ঠ প্রভৃতি দুরারোগ্য

অসুখ আরোগ্য হইত, এইরূপ প্রবাদ আছে। হিন্দুগণ ও গ্রীকগণ জলের গুণ অতি প্রাচীন যুগেও স্বীকার করিতেন।

তাই গ্রীক ডাক্তারগণ প্রস্রবণ প্রভৃতির তীরে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিতেন। নদীপূজা ভারতের স্থায় গ্রীসেও প্রচলিত ছিল। রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে সার ফ্রেডরিক টেলার, ডাঃ কাষ্টন প্রভৃতি বিখ্যাত ডাক্তারগণ আজীবন অধ্যয়ন ও গবেগণার ফলে আজ আয়ুর্বেদের মূলসূত্র মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

ব্রহ্মরন্ধ্র নামক মন-চিকিৎসাতে হিন্দুগণ অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। Christian Science, Spiritual Healing, Auto-Suggestion, Faith-cure ও Psycho-Analysis প্রভৃতি পশ্চিমের মানসিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই বিষয়ে হিন্দুদের নিকটবর্তী হইতে এখনও পারে নাই। দশম শতাব্দীর মিত্রদেব ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাস্তুপালের কবিতায় ও গল্পে উক্ত তত্ত্বের বিশ্লেষণ আছে। Oscar A. H. Schmitz সাহেব পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব ও হিন্দুযোগের তুলনা করিয়া একখানি চমৎকার গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ডরোথিয়া চ্যাপলেন নামক জনৈক ইংরাজ কোন মানসিক অসুখে ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া লণ্ডনের হিন্দু বৈদ্য এস. এম. মিত্রের চিকিৎসাধীনে আসিয়া আরোগ্যলাভ করেন ও তাঁহার নিকট আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। যে দুইটী গল্প ( ১। গুবরে পোকা ও রেশমীসূতা ২। স, সে, মি, রা ) দ্বারা চ্যাপলেন মনরোগ হইতে মুক্ত হন তাহা পরে প্রদত্ত হইবে।

বর্ণ ( colour ) চিকিৎসাতেও হিন্দুগণ যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনটী ফলকে ৩৬টী রং দিয়া এই চিকিৎসা করিতে হয়। উল্লিখিত মিত্র মহাশয় একটি আমেরিকান শিশুকে উক্ত চিকিৎসায় আশ্চর্যরূপে আরোগ্য করিয়া সুখ্যাতি উপার্জন করিয়াছিলেন। উদ্ভিদের গুণাবলী বিশ্লেষণে হিন্দুগণও এত সূক্ষ্মতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, পশ্চিম আজ তাহা জানিতে পারিয়া শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিয়াছে। কারণ ষড়ঋতু, সূর্য্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন

এবং চন্দ্রের বিভিন্ন নক্ষত্রের প্রভাবেও উদ্ভিদের বীর্য উগ্র বা লঘু হয়। তৎসমূহের তত্ত্বও তাহারা অবগত ছিল না। গেলেন সাহেব ভারত হইতে উক্ত তত্ত্ব পশ্চিমে প্রচার করেন। বৈদিক যুগে ঋষি আত্রেয়ের শিষ্য অগ্নিবেশ, সুশ্রুত, চরক ও বাগভট্ট প্রভৃতির পুস্তকে উদ্ভিদ্‌গুণাবলী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পশ্চিমে স্বর্ণের গুণ অজ্ঞাত ছিল। বর্তমান ইউরোপীয় ও আমেরিকান ডাক্তারগণ মৃগনাভি কস্তুরী ও মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছেন। পারদকে শরীর হইতে দূর করিতে এলোপ্যাথি জানিত না। রস-রত্নাকর, রসেন্দ্র চিন্তামণি, বৈদ্যবৃন্দ, বৈদ্যামৃত, যোগতরঙ্গিনী ও ভেষজ রত্নাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে উক্ত চিকিৎসা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। লোমকূপের মধ্য দিয়া চিকিৎসা বা মেরুদণ্ড প্রভৃতি স্থানে তৈলাদির বাহ্য প্রয়োগ করিয়া রোগ চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতিসাধন হিন্দুগণ করিয়াছিলেন—যাহা পাশ্চাত্য সম্প্রতি শিক্ষা করিয়াছে। বার্ণাড ব্রাউন শেফার্ড ও মেনার্ট ও স্কিফ্ প্রভৃতি ডাক্তারগণের বহু পুর্বেও হিন্দুবৈদ্যগণ গলগণ্ড, উন্মাদরোগ চিকিৎসাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঋগ্বেদের ( ১ম মণ্ডল, ১১৭ সূক্ত, ১৩ ঋক ) মধ্যে রসায়ন বা দীর্ঘ-জীবন লাভের চিকিৎসা উল্লিখিত আছে। কুচবিহার ষ্টেটের আয়ুর্ব্বেদ রিসার্চ্চ এসোসিয়েশনের বৈদ্যশাস্ত্রী জে. এন. সরকার মহাশয় মুমূর্ষু রোগীর আয়ুবৃদ্ধির উপযোগী চারিটী ঔষধ বিশ বৎসর গবেষণার ফলে আবিষ্কার করিয়াছেন। কশ সহরের প্রাক্সাগোরাস নামক ডাক্তারই পশ্চিমে প্রথম নাড়ী-বিজ্ঞানবিৎরূপে অভিহিত হন। সার ক্লিফোর্ড এ্যালবার্ট সাহেব বলেন যে, হিন্দুগণই নাড়ীবিজ্ঞানের স্রষ্টা ; তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাক্সাগোরাস উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

বৃক্ষ-আয়ুর্বেদ, ধন্বন্তরি সংহিতা ও ভেষজকল্প নামক অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তিনখানি সংস্কৃত আয়ুর্বেদ গ্রন্থ এখনও হস্তলিখিত অবস্থায় অপ্রকাশিত আছে। বৃক্ষায়ুর্বেদ ভূমিকাণ্ড, বৃক্ষগণসূত্রীয় কাণ্ড, বানস্পত্য কাণ্ড, বনস্পতি কাণ্ড ও বিন্ধ্যবল্লী কাণ্ড নামক পাঁচটী পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ধন্বন্তরি সংহিতা সূত্রস্থানম্, (ধারগৃহ, অগ্নিগৃহ ও গর্ভগৃহ নামক তিনটী পরিচ্ছেদযুক্ত )

শারীরস্থানম্, চিকিৎসাস্থানম্ ও ধাত্রীবিদ্যা নামক চারিটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানও আজ অব্যাহত বেগে ধীরে ধীরে পশ্চিমে প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের, ভোজরাজ-কন্যা রাণী ভানুমতীর গর্ভে জাত, বিক্রমসেন নামক এক পুত্র ছিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে সর্বশাস্ত্র ও চৌষট্টি কলায় পারদর্শী হইলেন। একদা পরিজনবর্গ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ জঙ্গলে গিয়া তিনি পথভ্রান্ত হন ও হিংস্রজন্তুসমাকুল গভীর অরণ্যে একাকী প্রবেশ করেন। সন্ধ্যা সমাগমে রাত্রি যাপনার্থ তিনি যে বৃক্ষে আরোহণ করেন সেই বৃক্ষে এক ভল্লুক এক ব্যাঘ্রের সহিত মারামারি করিয়া প্রাণরক্ষার্থ আরোহণ করে। একই বৃক্ষে ভল্লুক ও রাজপুত্র নিশিযাপন করিতেছিলেন। এমন সময় ব্যাঘ্র বৃক্ষতলে আসিয়া রাজপুত্রকে নিম্নে ফেলিয়া দিবার জন্য ভল্লুককে অনুরোধ করায় সে অস্বীকার করিলে ব্যাঘ্র পলায়ন করে। এইরূপে রাত্রির তিন প্রহর জাগিয়া রাজপুত্রকে রক্ষা করিলে শেষ প্রহরে জাগিয়া ভল্লুককে পাহারা দিবার জন্য রাজপুত্রের পালা আসিল। পুনরায় ব্যাঘ্র আসিয়া ভল্লুককে ফেলিয়া দিবার জন্য রাজপুত্রকে অনুরোধ করে। বিমূঢ় রাজপুত্র প্রাণভয়ে ভল্লুককে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিলে ভল্লুক থাবা দ্বারা গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রাণরক্ষা করে; কিন্তু মানুষের অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হয়। প্রাতে উভয়ে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলে ভল্লুক রাজপুত্রের গণ্ডদেশে চারিটি চপেটাঘাত করিয়া স. সে. মি. রা. নামক চারিটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অন্তর্হিত হয়। রাজপুত্র পাগল হইয়া সর্ব্বদা স. সে. মি. রা. উচ্চারণ করিতে থাকেন। অমাত্যবর্গ বনে অন্বেষণ করিতে করিতে উন্মত্ত রাজপুত্রকে পাইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া আসেন। যথাসাধ্য চিকিৎসান্তে যখন রাজপুত্র রোগমুক্ত হইলেন না, তখন বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম কালিদাসকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ চাহিলেন। এক রত্ন বররুচি রাজার অসন্তোষ সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণীর বেশে কাল কাটাইতেছিলেন। কালিদাসের অনুরোধে ছদ্মবেশী বররুচি চিকিৎসার্থ রাজপুরে আগমন

করিলেন। তিনি রোগীর লক্ষণ বুঝিয়া এই শ্লোক বলিলেনঃ "সদ্ভাব প্রতিপন্নানাম্ বঞ্চনেন বিদধ্যত। অঙ্কমারুহ্য সুপ্তানাম্ হন্তু তে কিম্ পৌরুষম্ ॥" অর্থাৎ যে নিজেকে কর্ম্মে সদ্ভাব প্রতিপন্ন করিয়া তোমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিল, তাহাকে বঞ্চনা করিয়া তুমি কি পৌরুষ দেখাইলে?" রাজপুত্রের নিকট এই শ্লোক কয়েক বার ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণী উচ্চারণ করাতে তিনি প্রথম অক্ষর ত্যাগ করিয়া সে. মি. রা. বলিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণী দ্বিতীয় শ্লোক বলিলেনঃ "সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈঃ মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে ॥" অর্থাৎ সেতুবন্ধ ও গঙ্গাসাগরে ব্রহ্মহত্যা পাপের মুক্তি হয়; কিন্তু মিত্রদ্রোহীর পাপমুক্তি কখনো হয় না। এই শ্লোক শুনিয়া রাজপুত্র দ্বিতীয় অক্ষর ভুলিয়া মি. রা—মি. রা বলিতে লাগিলেন। তখন বররুচি তৃতীয় শ্লোক বলিলেনঃ—মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ। তে নরাঃ নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরম্ ॥" অর্থাৎ যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতকগণ ততদিন নরকবাস করিবে। শেষে বররুচি এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিলে রাজপুত্র সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। শ্লোকটী এইঃ— "রাজাসি রাজপুত্রোঽসি যদি কল্যাণম্ ইচ্ছসি। দেহি ধনম্ দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনম্ কুরু ॥" অর্থাৎ তুমি রাজা ও রাজপুত্র। যদি ইচ্ছা কর ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও দেবতারাধনা কর। পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, মনবিশ্লেষণ ( psycho-analysis) এর দ্বারা রোগারোগ্য পশ্চিমে ফ্রয়েড, এ্যাডলার ও জুঙ্গ প্রভৃতি ডাক্তারগণ সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র।

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগধামে সূর্য্যপ্রতাপ নামে এক রাজা বাস করিতেন। একবার তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রী ধৈর্য্যশীলকে চল্লিশ হাত উচ্চ একটী নির্জ্জন আচ্ছাদবিহীন দুর্গে নির্ব্বাসিত করেন। তাঁহার স্ত্রী বুদ্ধিমতী রাত্রির অন্ধকারে যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি তাঁহার কিছু সাহায্য করিতে পারেন কি না। মন্ত্রী বিশ্বাস করিতেন যে, উপস্থিত বুদ্ধি থাকিলে সর্ব্বাবস্থায় মানুষ পথ পাইবে। তিনি বুদ্ধিমতীকে বলিলেন, "তুমি কাল

রাত্রিতে আমার জন্য একটী গুবরে পোকা, মাকড়শার জালের মত সরু রেশমী সুতা বার হাত, বার হাত সরু তুলার সূতা, বার হাত মোটা সূতা, চল্লিশ হাত মোটা দড়ি ও এক ফোঁটা মধু লইয়া আসিও।" পরবর্ত্তী রাত্রিতে বুদ্ধিমতী মন্ত্রীর আদেশানুযায়ী দ্রব্যগুলি লইয়া আসিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, "গুবরে পোকাটীর কোমরে রেশমী সূতা বাঁধিয়া ও তাহার মাথায় মধুর ফোঁটাটী লাগাইয়া আমার দিকে মুখ করিয়া দুর্গ প্রাচীরে ছাড়িয়া দাও।" পোকা মৌচাকের অনুসন্ধানে দুর্গোপরি উঠিল। মন্ত্রী ধৈর্য্যশীল পোকাটী ধরিয়া রেশমী সূতার এক অগ্র ভাগ ধরিলেন এবং উহার অন্য অগ্র নিম্নে বুদ্ধিমতীর হাতে রহিল। এইরূপে তিনি রেশমী সূতার সাহায্যে তুলার সূতা, তাহার সাহায্যে মোটা সূতা, এবং তাহার সাহায্যে মোটা দড়ি পাইলেন। দড়ির সাহায্যে মন্ত্রী দুর্গমূলে অবতরণ করিলেন। মন্ত্রী কিছুই প্রকাশ না করিয়া পরদিন রাজ দরবারে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মন্ত্রীপদে পুনর্নিযুক্ত করিলেন।

আত্মহত্যা, উন্মাদ প্রভৃতি বহু রোগের মূল কারণ নৈরাশ্য। এই সকল মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্যও হিন্দু বৈদ্যগণ সিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন।

---

## ছয়

# ভারতের সঙ্গীত *

ভারতীয় সাধনার সঙ্গীতাংশই সর্বাপেক্ষা অবিজ্ঞাত ও তমসাচ্ছন্ন। অথচ সঙ্গীত আমাদের ঋষি-বিদ্যা ও উচ্চ স্তরের পরমার্থ সাধন বিশেষ। সামবেদে হিন্দু সঙ্গীতের জন্ম। উদগাতৃগণ যজ্ঞকালীন সামগান করিতেন ও উহা সাধনার বিশেষাঙ্গ ছিল। সঙ্গীত বিদ্যাকে উপবেদ বা গন্ধর্ব বেদ বলে। সামবেদ ও গন্ধর্ব বেদের পূর্বেও সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। সামবেদে তাহার অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সামবেদোচ্ছল নামক সাত পরিচ্ছদ বিশিষ্ট একটী সামসূত্র গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। তাহাতে বেদগানের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ ছিল। বেদে সামকে প্রাণ ও ব্রহ্মবাচক প্রণব (ওঁ) কে সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্গীত বলে। সূত্রযুগে পিঙ্গলাঙ্গ লিখিত পিঙ্গলসূত্রগুলি ছন্দের শ্রেষ্ঠ পুস্তক। ভগবৎ গীতাও সংগীত গ্রন্থ। গীতাতে শ্রীভগবান বলেন, আমি বেদের মধ্যে সামবেদ, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, গন্ধর্ববেদের মধ্যে চিত্ররথ, ঋষিদের মধ্যে নারদ। বৌদ্ধ যুগেও সঙ্গীতবিদ্যার প্রবল প্রভাব ছিল। অমরকোষ পুস্তকের বৌদ্ধ গ্রন্থকার সপ্ত স্বরের বিষয় লিখিয়াছেন। জিশু খ্রীষ্টের সমসাময়িক রাজা শুদ্রকের রাজত্বে কুম্ভালিক লিখিত মৃচ্ছকটিক নামক সংস্কৃত নাটকে সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা আছে। পঞ্চম শতাব্দীতে কবি কালিদাসের নাটকাবলীতেও সঙ্গীতের কথা পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সঙ্গীত সম্বন্ধে এত পুস্তক রচিত হইয়াছে যে, একটী বৃহৎ গ্রন্থাগার শুধু সঙ্গীত-গ্রন্থে পূর্ণ হইতে পারে। মুসলমান আক্রমণের পর দ্বাদশ শতাব্দীতে লোচন

---

* এই অধ্যায় পপ্‌লে, স্ট্রাংওয়ে ও অতিয়া বেগম ফৈজী রহমান প্রণীত পুস্তকত্রয় অবলম্বনে প্রধানতঃ রচিত এবং 'উদ্বোধন' মাসিকের পৌষ ১৩৪০ সালে প্রকাশিত।

কবির রাগতরঙ্গিনীই প্রথম পুস্তক। তৎপরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত সারঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' প্রকাশিত হয়। উহার উপর ১৪২৫ খ্রীঃ কালীনাথের কুম্ভকর্ণেন্দ্র টীকা ও সিংহভূপাল টীকা প্রভৃতি লিখিত হয়।

পুণ্ডরী বিট্‌ঠলের 'নর্তননির্ণয়', 'রাগমালা' 'রাগমঞ্জরী', এবং সদ্রাগচন্দ্রোদয় মিশ্রের 'সঙ্গীতদর্পণ' এবং অহোবল পণ্ডিতের "সঙ্গীত পারিজাত" ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে সঙ্গীত শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ। শূদ্রক, কালিদাস ও ভবভূতির নাটকগুলিও সঙ্গীত-গ্রন্থের মত। মুসলমান রাজত্বের শেষ ভাগে ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে মহম্মদ রেজার 'নাঘমায়ী আসফী', জয়পুরের রাজা প্রতাপসিংহদেবের 'সঙ্গীতসার', কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের 'সঙ্গীত কল্পদ্রুম' এবং আকবর পুরের ঠাকুর নবাব আলিখাঁর উর্দ্দু ভাষায় 'মারি কাটই নেখামত' রচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য হইতে ভারতীয় সঙ্গীতের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব পতিত হয়। বর্তমান যুগে বোম্বাইর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ ভাতখণ্ডে সংস্কৃতে বহু সঙ্গীত পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

ব্রহ্মার পুত্র বৈদিক ঋষি নারদই ভারতের প্রথম সঙ্গীতাচার্য্য। কবি মাঘ তাঁহার কাব্যে নারদের বীণার অদ্ভুত মোহিনী শক্তির মহিমা মুক্ত কণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন।

তৎপূর্বে ছিলেন তাম্বুর ঋষি। বাংলা দেশের ভিক্ষুকগণ যে তাম্বুরা ব্যবহার করে তাহা উক্ত নাম হইতে সিদ্ধ। তাম্বুরা হইতে ইংরাজী Tambourine হইয়াছে। ভারত ঋষিও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি গীত, নৃত্য ও বাদ্য—এই তিন ভাগে সঙ্গীত বিভাগ করেন। নটরাজ শিব 'তাণ্ডব' ও 'লাস্য' দুই প্রকার নৃত্য প্রচার করেন। মহাদেব-পত্নী পার্বতী লাস্য-নৃত্য রাজকুমারী উষাকে শিক্ষা দেন। উষার নিকট হইতে দ্বারকার রাণীগণ, ও উক্ত রাণীগণের নিকট সৌরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের রমণীগণ শিক্ষা করে। রাজা রাবণ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার নামানুযায়ী 'রাবন হত্ত' নামে বাদ্যযন্ত্র গুজরাটে প্রচলিত আছে। দিল্লীর হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ চোহানের রাজদরবারের সঙ্গীতাচার্য্য চাঁদবর্দই বলেন যে, পৃথ্বীরাজ অসাধারণ সঙ্গীতরসজ্ঞ ছিলেন।

রাজকুমার শাক্যসিংহ, এবং অশ্বঘোষ প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণ ও জৈনগণ সঙ্গীত ভালবাসিতেন।

পাণিনির পূর্বে প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে গন্ধর্ব বেদ রচিত হয়। তাহার বহু পরে পারস্য, গ্রীক, আরব ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি উহা অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করে। পারস্য সম্রাট বেরামগোরের আমন্ত্রণে প্রায় দশ সহস্র গায়ক রাজা শঙ্কল কর্তৃক পারস্যে প্রেরিত হয়। গ্রীক গায়ক তার্পেন্ডার, পাইথাগোরাস ও আলেকজান্ডার মূর্চ্ছনা প্রভৃতি ভারতীয় সঙ্গীত পাশ্চাত্যে প্রচার করেন। হিন্দু সঙ্গীত পারস্যের মধ্য দিয়া গ্রীসে যায়, তথা হইতে আরব হইয়া ভারতে প্রত্যাগমন করে। ইহাকেই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলে। মুসলমান আক্রমণে উত্তর ভারতে হিন্দু সভ্যতা বিধ্বস্ত হওয়ায় তথায় সঙ্গীত পূর্ববৎ বিশুদ্ধ ছিল না। অন্য দিকে দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটকী সঙ্গীত অতিশয় বিশুদ্ধ। বর্তমান ভারতে সঙ্গীতের কর্ণাটকী ও হিন্দুস্থানী নামক দুইটী বিশেষ বিভাগ আছে। আরবে ও লোহিত সাগর সঙ্গমে মুশা, ইসরাইলের বংশধরগণ এবং এরেণের ভগ্নী মিরিয়াম 'ডক্' নামে যন্ত্র বাজাইতেন ও নৃত্য করিতেন। ডেভিড পঁচাত্তরটী তারবিশিষ্ট 'কানুন' যন্ত্র বাজাইয়া লাহানি ভাটুদি গান গাহিতেন। ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার পর আরবে আকাণের পুত্র ওশমানের এক ক্রীতদাস মেদিনার তাপয়াইস সাহেব বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে খালেফ ওমার, খালেফ ওশমান, ইব্নি শূরীদ ও ইয়াজিদ নামক সঙ্গীতজ্ঞ চতুষ্টয় আরবে জন্মগ্রহণ করেন। যখন আবু জোবের মুসলমানদের প্রধান মন্দির 'কাবা' নির্মাণ করিতেন তখন শিরিয়া ও পারস্যের মিস্ত্রীগণ গান গাহিতে গাহিতে 'কাবা' মন্দির নির্মাণ করিত। আরবে অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে প্রথম ওয়ালিদ খালেফ আবু আবাস, মনশুর, মেহদী ও তৎপুত্র বিখ্যাত হারুণ-অল-রশিদ, দুইখানি সঙ্গীত-গ্রন্থ-প্রণেতা খলিল, ছয়খানি সঙ্গীত গ্রন্থ-প্রণেতা ওবিদুলা আবদুলা; তৎশিষ্য গ্রন্থকার আহম্মদ বিন মহম্মদ, মুশীলের ইব্রাহিম, জুনিশ শুলিমান, জবের ইব দাহামান, মেদিনার মাবেদ,

মহম্মদ ইবনাল্ হারেশ, আবু এইশা, ইব্রাহামের পুত্র আইজাক্, গায়িকা ওরিয়েল ( ইহার ২১০০০ সঙ্গীত মুখস্থ ছিল ও গাহিতে পারিতেন ), এল গরিদ, ইব্ শিরিদ্ শুমা, শেল শেল, ফিলিদ ইব্নাল ও মোবারেক নামক বহু সঙ্গীতাচার্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তখন স্পেন আরব সাম্রাজ্যের অধীন ছিল বলিয়া আরবের রাজধানী বোগদাদ হইতে স্পেনের রাজধানী কার্ডোভাতে ভারতীয় সঙ্গীত প্রচারিত হয়। মুশীলের বিখ্যাত গায়ক ইব্রাহিমের শিষ্য সার্জাব খালেফ হাকাম ( প্রথম ) কর্তৃক আহূত হইয়া কার্ডোভায় যান ও তথায় সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে শেভিল, গ্রাণাদা, টোলেদা ও ভ্যালেন্টিয়াতে সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবে তখন সহস্র সহস্র সুরতাল সৃষ্টি হয়। দশম শতাব্দীতে ইস্পাহানের বিখ্যাত গায়ক আগানি আবদুল কায়া একুশ খণ্ডে এক বৃহৎ সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদ্ব্যতীত শের্জাল, বেনজিদান, রবিইন্‌ক, রবিমূশা, বাদেল, আবিল, শের্জাবের শিষ্য মুশালি, গ্রাণাদের শিষ্য আবুবেকর ইব্‌বাজে—( ইনি এরিষ্টটলের সঙ্গীত পুস্তকের টীকা করেন ); আবদুল মুনীনী, মহম্মদ বীন্ আহাম্মদ হাদ্দা, মহম্মদ শিরাজী, শেরেফীজের গ্রন্থকার শাফীউদ্দিন আবদুল মনিম, মহম্মদ বীন আবু বেকার, বেন শিরুনী, আবদুল কাদের প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য আরবে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমেই বলিয়াছি, আরব সঙ্গীতের মূল ভিত্তি হিন্দু সঙ্গীত। মহম্মদ গজনবীর দরবারে বহু সঙ্গীত-গায়ক ছিলেন। সুলতান মামুদের সমসাময়িক এবিশিয়েনা একজন মুসলমান গ্রন্থকার। দরবেশ সুফীরা সঙ্গীত-প্রেমিক ছিলেন। আল্‌তামাশ ও তৎপুত্র ফিরোজ শাহার রাজত্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'সঙ্গীত-রত্নাকর' রচিত হয়। উহা হিন্দু ও আরব সঙ্গীত সংমিশ্রণে উৎপন্ন। আলতামাশের রাজত্বে 'নাগরের' গায়ক কাজী হামিউদ্দিন, আলাউদ্দিনের রাজত্বে চাঙ্গী-ফতুয়া, নাশীর খান, জরোজ প্রভৃতি আচার্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। পারস্য গায়ক আমির খশরু ব্রজভাষা ও ফার্শীর সংমিশ্রণে মধুর সঙ্গীত সৃষ্টি করেন। তিনিই বাংলায় প্রচলিত সেতারের আবিষ্কর্তা। দক্ষিণ ভরতের বিজয়নগর প্রভৃতি

স্থানে গোপাল নায়েক প্রমুখ আচার্যগণ ছিলেন। বাংলায় দারোগা ও চৌধুরী শব্দ পারস্য হইতে আসিয়াছে। পারস্যে সঙ্গীতজ্ঞদিগকে দারোগা বা চৌধুরী বলা হইত। গোয়ালিয়রের রাজা মানতানওয়ার, জৌনপুরের সুলতান হোসেন শার্কী, নাইকবক্সু, বৈজুর পাগুবী লোহাঙ্গ, ফুরজু, ভগবান, ধনন্দী, দালু, তানসেন প্রভৃতি অসংখ্য ওস্তাদ উত্তর ভারতে আবির্ভূত হন।

আকবরের দরবারে তানসেন প্রমুখ আটত্রিশ জন সুগায়ক ছিলেন। ইহা 'আইনী আকবরী' গ্রন্থে পাওয়া যায়। তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী বৃন্দাবনে যমুনা-তীরে বাস করিতেন। উদয়পুরের রাণী মীরাবাই, সুরদাস, কবীরদাস, ভিকোদাস, তুলসীদাস, হরদাশ, লাদাকপোলা, পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল, জাহাঙ্গীরের দরবারের গায়ক চটর খাঁন, পরবীজাদ, তোহাঙ্গীরদাদ, খুরমদাদ, মাখু, হামজান, ও তানসেনের পুত্র বিলাসখান; শাহাজানের দরবারস্থ সঙ্গীতজ্ঞ ভাবভট্টের পিতা কবিরাজ জগন্নাথ, ধীরঙ্গখান, বিলাস খানের জামাই গুণ-সমুদ্র লালখান, মহম্মদ শাহার দরবারে গায়ক আদারাং, খেয়ালের আবিষ্কর্তা সদরং, টপ্পার আবিষ্কর্তা শোরী, নুরখান, লাছুখান, পিয়ারীখান, জানী, গুলাব রসুল, শাকুর, মুখান, তেথো, মহম্মদখান, চেজ্জুখান, লক্ষ্ণৌর নবাব জজির আশফোদ্দৌল্লা, অযোধ্যার রাজা ভাজিদ আলিশাহও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। রামপুরের নবাব কলবে আলিখান, শাহাজাদা শাদদ আলিখান, বর্তমান নবাব হামিদ আলিখান, উজিরখান বীনকার, পিয়ারী সাহেব ধনপদিয়া, মুস্তাখান খেয়ালী, আলীরেজাখান, স্বরদ বাদক কিদাহুসেন, 'রুবাক' বাদক মহম্মদ আলিখান, আচ্ছান, মহম্মদখান, শেরুবাই, ওমরাওখান, খেশালখান, হাছুখান, হাগুখান, তঙ্গশখান, ধামার গায়ক উজিরখান, আজির খান, তগুন্দীক, রসুল, দিউজী, বাবু জ্যোৎসিংহজী, খুদাও সিংহ, জোরাবার সিংহ, পাখওয়াজ বাদক নাশরৎখান, গুকান আলি, বধিকা আলি, জমাবুদ্দিন খান, বীনবাদক মুশারফ্‌খান, বাহাদুর সেন খান, ইন্‌রস্ত সেন, কালীখান, রহিত্র সেন, আলিহুশেন ও জাফিরউদ্দিন প্রভৃতি অসংখ্য বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ জন্মগ্রহণপূর্বক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অতুলনীয় উৎকর্ষ সাধন করিয়া অমর

হইয়াছেন্। ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সঙ্গীতের অবনতি ঘটে। ভারতের ভাগ্যবিধাতা আবার মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন—নবযুগে সঙ্গীত বিদ্যার আবার নবজাগরণ হইয়াছে। এই জাগরণের প্রথম পুরোহিত উত্তর ভারতে বোম্বাইর ব্রাহ্মণ শ্রীভাতখণ্ডে। তিনি 'লক্ষসঙ্গীতম্' নামে পুস্তক সরল সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া তিন খণ্ডে মারাঠী টীকা সহ প্রণয়ন করেন। উক্ত পুস্তক উর্দ্দু ও গুজরাটী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

প্রবাদ আছে, ব্রহ্মা সঙ্গীতের প্রথম স্রষ্টা। তাঁহার নিকট হইতে মহাদেব, নারদ ও নায়কগণ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। মুসীকার বা দীপকনাথ নামক একটী সহস্র বৎসর বয়স্ক অদ্ভুত গায়ক পক্ষী ককেশাস পর্বতে বাস করিতেন। তাঁহার চঞ্চুতে সাতটী ছিদ্র ছিল। উক্ত ছিদ্র সাতটীতে সাত প্রকার সুর বাজিয়া উঠিত। তিনি মৃত্যুর পূর্বে জ্বালানীকাষ্ঠ সংগ্রহপূর্বক তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া দীপক রাগ গাহিয়া তৎপ্রজ্বালিত অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করেন। বিদ্যাদেবী সরস্বতী বীণার আবিষ্কর্ত্রীরূপে পূজিতা হন। পার্বতীর সুন্দর নিদ্রিত রূপের প্রতীক রুদ্রবীণা। ভারতের সকল রাজদরবার, মন্দির, বিদ্যালয়ে —ঘরে ও বাহিরে সকল স্থানে সঙ্গীতের প্রভাব ছিল। ব্রজ ভাষায় অনেক বিখ্যাত সঙ্গীত পুস্তক আছে। নাইক গোপাল, নাইক বৈজু, তানসেন, আমির খশরু, মিংনাশির, আহম্মদ দেহলবী প্রভৃতি অজ্ঞাত সঙ্গীতাচার্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বোম্বাই, কলিকাতা, মহীশূর, বরোদা, লক্ষ্ণৌ ও গোয়ালিওর প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সঙ্গীত একত্র আলোচিত হইতেছে। রাগ, রাগিণী, তাল প্রভৃতি ভাগে হিন্দু সঙ্গীত বিভক্ত। কথিত আছে, ১৬০০০ রাগ ও রাগিণী, এবং ৩৬০ প্রকার তাল প্রথম দেবগণ কর্তৃক সৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যের সময় তাঁহার ১৬০০০ গোপিনী প্রত্যেকে নূতন রাগ গাহিতেন, শোনা যায়।

সোমেশ্বর শিব মতে ছয় রাগ। আবার প্রত্যেক রাগের পাঁচ রাগিণী ও আট আট পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন অনুসারে কালীনাথ মত সৃষ্ট হয়। ইহাতেও শিব মতের ন্যায় রাগ, রাগিণী ও পুত্র আছে। ভরত মুনির

নামানুসারে ভরত-মত ও হনুমানের নামানুসারে হনুমৎ-মত সৃষ্ট হয়। ভরত-মতের ছয় রাগ এবং প্রত্যেক রাগের পাঁচ পাঁচ রাগিণী, আট আট পুত্র, ও আট আট পুত্রবধূ আছে। ভরত-মতের ন্যায় কাশী অঞ্চলে প্রচলিত হনুমৎ মতের রাগ, রাগিনী ও পুত্র আছে। হনুমানের বংশধরকে বানর বলে, কারণ বানর বন-নর কথার অপভ্রংশ। আকবরের রাজত্বে তানসেন সুর, তাল ও রাগিণীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়া 'রাগমালা' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

অন্যান্য হিন্দু বিজ্ঞানের ন্যায় সঙ্গীত সপ্তাঙ্গ—সুর, তাল, রাগ, অষ্ট ( যন্ত্র ), নৃত্য, ভাব (ভঙ্গী) ও অর্থ। সঙ্গীত সুর-তালে বিভক্ত। সুর বীণা, তাউস প্রভৃতি যন্ত্রে এবং তাল পাখওয়াজ ও তব্লাতে গীত হয়। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ও নিষাদ—এই সাতটী সুরকে সা, রি, গা, মা, পা, ধা ও নি বলে। প্রত্যেক সুরের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন; এবং প্রত্যেক সুরের বিভিন্ন ধ্যানগম্য রূপ ও গুণ বিদ্যমান। কথিত আছে, রাগাভ্র সৌদামিনী তন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যেক সুরের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সুর সাধন করিতে হয়। ষড়জ সুরের দেবতা অগ্নি, স্থান প্রথম স্বর্গ ও চন্দ্র গ্রহ এবং উহা ময়ূরের স্বর হইতে গৃহীত। ইহার তীব্র, কামোদবতী, মন্দ, চন্দধুতী নামে চারিটী সুরাত ( শ্রুতি ) আছে। সপ্ততিতম বৃদ্ধের স্বর এইরূপ। ঋষভের দেবতা ব্রহ্মা, স্থান দ্বিতীয় স্বর্গ ও বুধগ্রহ। ইহা পাপিয়া ও ষষ্ঠিতম বৃদ্ধের স্বরবৎ এবং ইহার দয়তি, রঞ্জিনী ও রাগতিক নামক তিন সুরাত আছে। গান্ধারের দেবতা সরস্বতী, স্থান তৃতীয় স্বর্গ ও শুক্রগ্রহ। ইহার স্বর গুস্কুন্দ জন্তু বা পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের ন্যায় এবং শোভী ও ক্রোধা এই দুই সুরাতে বিভক্ত। মধ্যমের দেবতা মহাদেব, স্থান চতুর্থ স্বর্গ ও সূর্য্যলোক। ইহার স্বর সারস পক্ষী বা চল্লিশ বৎসর মানুষের মত এবং ইহা বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জ্জনী—এই চার সুরাতে বিভক্ত। পঞ্চমের দেবতা লক্ষ্মী, স্থান পঞ্চম স্বর্গ ও মঙ্গল গ্রহ। ইহার স্বর কয়েল পক্ষী বা ত্রিংশৎ বর্ষ বয়স্ক লোকের ন্যায়। ইহা রাগতা, সন্দীপনী, আলাপনী ও রোহিতী সুরাতে বিভক্ত। ধৈবতের দেবতা গণেশ, স্থান ষষ্ঠ স্বর্গ, ও বৃহস্পতি গ্রহ।

ইহার স্বর অশ্ব বা বিংশতি বর্ষ বয়স্ক মানুষের মত। ইহা মন্দাতি, রোহিণী, ও রমা এই তিন স্থরাতে বিভক্ত। নিষাদের দেবতা সূর্য, স্থান সপ্তম স্বর্গ, ও শনিগ্রহ। ইহার স্বর হস্তী বা দশ বর্ষ বয়স্ক বালকের ন্যায়। ইহা উগারা ও শোভিনী নামক দুই স্থরাতে বিভক্ত। উক্ত বাইশটি স্থরাতে বাইশটি রাগিণী আছে এবং সপ্তস্বর সমন্বিত সপ্তকের ন্যায় পাঁচটি সপ্তক আছে।

ভারতীয় বাদ্য যন্ত্রগুলি তুত, বেতাত, ধুন, ও শেখর—এই চারি ভাগে বিভক্ত। বীণা, স্বরদ ও তাম্বুরা প্রভৃতিকে তুত বলে। সারঙ্গী, তাউস ও দিলরুব প্রভৃতিকে বেতাত বলে। পাখোয়াজ, তবলা, ঢোল ও নক্করা প্রভৃতিকে ধুন এবং নাকিরী, বনশ্রী ( বংশী ), পুঙ্গী ও সানাই প্রভৃতিকে শেখর বলে। বীণা বাজাইতে শিখিলে তাম্বুরা, সেতার প্রভৃতি যন্ত্র বাজান সহজ হয়। 'মৃদঙ্গ' ( পাখোয়াজ ) জানিলে তবলা, ধোলদফ, ঝম্প ও ডুমাশ যন্ত্র বাজান যায়। সানাই জানিলে তোতাগাজি, বনশ্রী, পুঙ্গী, নাই ও ভীর প্রভৃতি যন্ত্র বাজাইতে পারা যায় এবং সারাঙ্গী জানিলে তাউস্ ও দোতারা প্রভৃতি সহজে শেখা যায়। রুবাব জানিলে স্বরদ, সুরবীণা ও যন্ত্রী শেখা যায়। প্রথমে পার্বতী বীণা ও মহাদেব ডমরু আবিষ্কার করেন। গণেশজীর ডমরু হইতে পাখোয়াজ ( মৃদঙ্গ ), পাখোয়াজ হইতে তব্‌লা, ধোলক, ধুমাশ, ও ঝম্প প্রস্তুত হয়। বীণা হইতে সুরবীণা, সুরশৃঙ্গার, তাম্বুরা, সেতার সৃষ্টি হয়। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ বংশী তৈয়ার করেন। সানাইয়ের আবিষ্কর্তা হাকিম বু আলি সেনাই। ইহা হইতে উনশ, তোতাগাজী, আধগুজ প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। জনৈক হাকিম সারাঙ্গী প্রস্তুত করেন। পরে তাহা হইতে দোতারা, কামঞ্চ ও তাউস যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। ওমার আয়ারের আবিষ্কৃত 'নাই' হইতে পরে আলগোজা ও পুঙ্গী সৃষ্ট হয়। সেতার শব্দের অর্থ সাত বা তিন তার বিশিষ্ট যন্ত্র। রুদ্রবীণা, সরস্বতী বীণা ( দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ), পাখোয়াজ, আমির খসরু আবিষ্কৃত সেতার, একতারা, ঋষি নারদ আবিষ্কৃত তাম্বুরা প্রভৃতি তার-যন্ত্র আঙ্গুলে বাজাইতে হয়। সারাঙ্গী, কামঞ্চ ( পাঞ্জাবে প্রচলিত ), দিলরুব ও তাউস প্রভৃতি তারযন্ত্র ছড়িতে বাজাইতে হয়। অমৃতসর সহরের প্রতিষ্ঠাতা গুরু

অমর দাসের আবিষ্কৃত সাজিন্দা, জৌনপুরী সারাঙ্গী, হিন্দুস্থানী দোতারা, মারবারে প্রচলিত মারোয়ারী দোতারাও ভারত-বিখ্যাত তারযন্ত্র। রুবাব, (আলেকজাণ্ডারের আবিষ্কৃত বলিয়া প্রবাদ) শরোদ, চারতারা, দিল্লীর রাজকুমার কালীসাহেব আবিষ্কৃত সুরবীণা, সুরশৃঙ্গার ও তারাব প্রভৃতি চৌতারা যন্ত্র। আলগুজ, নাই, বনশ্রী, পঙ্ক, সিঙ্গারা, তুরাই, ভীরা, কর্ণ, পুঙ্গী (সিঙ্গাপুরী বাঁশ নির্ম্মিত), মুর্চ্চঙ্গ, উনশ (ঝম্প ও ঝুন ঝুন সহযোগে) ও সানাই প্রভৃতি যন্ত্র মুখে বাজাইতে হয়। নহবৎ অর্থে নয়টি বাদ্য। দুই সানাই, দুই নক্কারা, এক ঝঞ্জ, এক কর্ণাই, এক দামামা, এক রবিদার ও এক জমাদার—এই নয়টী যন্ত্রযোগে নহবৎ বাজে। স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান যুগে ধ্রুপদের পক্ষপাতী ছিলেন। ধ্রুপদ তাল পাখোয়াজেই ভাল বাজে। তবলা ও বায়েন খানধারী আবিষ্কার করেন। মঞ্জেরা, মর্কা, তাশা, ঝঞ্জ, দাফ, দৈরু, বা দমরু রাজপুতানায় প্রচলিত আছে। খঞ্জরী, দফরা, ধোলক, জলতরঙ্গ প্রভৃতি বহু যন্ত্র অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়। রাজামান তানোয়ার আধুনিক ধ্রুপদ ও সুলতান হোসেন শরকী পঞ্চদশ শতাব্দীতে খেয়াল আবিষ্কার করেন। তিন সপ্তকে একুশ মূর্চ্ছনা আছে। সিরিস্থ, মধুর, ঝাপাল, তারাস্থান, শাখরা, কারান, কোমল, সর্দ্দক, খন, সংদ ও গদ প্রভৃতি তের প্রকার গলার স্বর আছে। শম, নাশার, নাসিক প্রভৃতি একুশ প্রকার স্বর-দোষ গায়কের দেখা যায়।

ভারতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞান এত পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ভারতের সভ্যতা কত প্রাচীন ও কত উন্নত হইলে এইরূপ সঙ্গীত বিজ্ঞান সৃষ্ট হয়, পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন।

কথিত আছে, পঞ্চবদন মহাদেবের প্রত্যেক মুখ হইতে ভৈরো, হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ—এই পঞ্চ রাগ সৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ রাগ মালকোশ পার্ব্বতী এবং ব্রহ্মা ত্রিশ রাগিণী সৃষ্টি করেন। নাদ হইতে শ্রুতি, শ্রুতি হইতে স্বর, স্বর হইতে রাগ ও রাগ হইতে রাগিণী উৎপন্ন হইয়াছে। বেরারী, মধমদ, ভৈরবী, সৈন্ধবী, ও বাঙ্গালী—এই পাঁচ রাগিণী ভৈরব। বসন্ত, মালসারী, আসোয়ারী, আরোয়া, ধানশ্রী—এই পাঁচ রাগিণী শ্রীরাগের। লম্ভবতী, গুরুলী, তোড়ী,

গৌরী, কোকাভ—এই পাঁচ রাগিণী মালকোশের। বিলাবল, রামকেলী, ললিত, দেবশাক ও পটমঞ্জরী—এই পাঁচ রাগিণী হিন্দোলের।

দীপক রাগ সম্রাট আকবরের দরবারে তানসেন গাহিয়াছিলেন বলিয়া আগুণ লাগিয়াছিল। কামোদ, দেশী, কানাড়া ও নটী—এই পাঁচটী রাগিণী দীপকের। ভূপালী, মল্লার, গোজরা, তুঙ্ক ও দেশীকার—এই পাঁচ রাগিণী মেঘ রাগের। সঙ্গীত-বিদ্যা নাদ-ব্রহ্মের উপাসনা বা নাদযোগ-বিজ্ঞান।

সিরাজদৌল্লা তোড়ী গাহিয়া বন্য পশুদিগকে মুগ্ধ করিতেন। আসোয়ারী ঠিক্ ঠিক্ গাহিলে সর্প ও ময়ূর আকৃষ্ট হয়। যখন মির্জ্জা মহম্মদ বুলবুল উপবনে 'নাই' গাহিতেন, তখন নাইটিংগেল পাখী তাঁহার চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইত এবং উড়িতে উড়িতে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ভূপতিত হইত। মহীশূরের রাজকুমার যখন তাঁহার গায়কগণ সহ বিষধর সর্পসঙ্কুল স্থানে যাইয়া 'ফুঙ্গি' বাজাইতেন, তখন সর্পগণ গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিয়া গায়কগণের চতুর্দ্দিকে ও গাত্রে জড়াইয়া থাকিত এবং বাদ্য শেষ হইলে তাহাদের অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যাইত। ঋষি নারদ প্রসিদ্ধ বীণাবাদক হইলেও বীণাপাণি সরস্বতীর বীণাবাদ্য শুনিয়া তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ হয়। হনুমানের একবার সঙ্গীতের জন্য অহঙ্কার হয়। রামচন্দ্র তাহা চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বনে লইয়া যান। তথায় এক এক ঋষি এমন সঙ্গীত-সিদ্ধ ছিলেন যে, তাঁহারা সপ্ত-স্বরকে জীবন্ত মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন। সপ্ত শরীরধারী স্বর জল আনিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় রামের আদেশে হনুমান গান আরম্ভ করিলে ঠিক ঠিক না হওয়ায় তাঁহারা মুমূর্ষু হইয়া ধরাশায়ী হন। পরে ঋষিবৃন্দ মধুর সঙ্গীতের দ্বারা তাঁহাদের প্রাণ দান করিলে হনুমানের অহঙ্কার চূর্ণ হয়। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তানসেনের গুরু হরিদাস মথুরায় বাস করিতেন। তিনি এমন সঙ্গীত-সিদ্ধ ছিলেন যে তাঁহার আদেশে রাগ-রাগিণীগণ শরীর ধারণ করিয়া উপস্থিত হইতেন। তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে তানসেন বলিলেন, "তিনি সম্রাটের সম্রাট, তিনি আপনার আদেশে আসিবেন না।" অগত্যা আকবর তাঁহার দর্শন মানসে মথুরায় হরিদাস সাধুর নিকট উপস্থিত হন। রাগিণী

দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেন, "তানসেন অসময়ে ও অহেতুকে আমাদিগকে আহ্বান করে। তাই আমাদের এত কষ্ট।" ইহা শুনিয়া আকবর হরিদাসের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যেও সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় সঙ্গীত-চর্চ্চা লুপ্ত হয়। তানসেন এমন সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন যে, তিনি রাত্রির সুর দিনের বেলা দ্বিপ্রহরে বাজাইলে স্বর যত দূর যাইত ততদূর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইত। তিনি একবার দীপক রাগ গাহিলে রাজদরবারে আগুন লাগিয়া যায়। তখন জনৈকা জলবাহিকা যুবতী রাগ মেঘ গাহিয়া বর্ষা নামাইয়া উহা নিভাইয়া দেয়। রাগ মেঘ গাহিয়া বহু সিদ্ধ গায়ক অনাবৃষ্টি দূর করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, প্রাচীন ভারতে কোন কোন মন্দিরে দীপক গাহিয়া সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিতে হইত। গোপাল নায়েক নামক ভারতীয় মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ককে সম্রাট আকবর দীপক রাগ গাহিতে আদেশ করেন। ইহাতে আসন্ন মৃত্যু জানিয়া গোপাল নায়েক সম্রাটকে অনেক অনুনয় বিনয় করেন। তাহা সত্ত্বেও আকবর অবিচলিত থাকায় গোপাল ছয় মাসের জন্য অন্তর্হিত হন এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া পুনরাগমন করেন। নির্দ্দয় সম্রাটের সম্মুখে যমুনাজলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া গোপাল দীপক গাহিতে আরম্ভ করিলেন। দীপক রাগের প্রভাবে আকাশ বাতাস কম্পিত হইল, জল গরম হইয়া ফুটিতে লাগিল ও শেষে ভীষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া গোপালকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তানসেনের চার পুত্র ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পাগড়ী লইয়া কে গদী অধিকার করিবে, এই বিরোধ উপস্থিত হইলে, তৎপুত্র সঙ্গীতাচার্য্য বিলাসখান বলিলেন, "গান গাহিয়া যে এই মৃত দেহ নড়াইতে পারিবে, পাগড়ী তাহার হইবে।" তানসেনের কোন শিষ্যই তাহা পারিলেন না। তখন তৎপুত্র বিলাসখান 'টোড়ী' গাহিয়া এই অসম্ভব কার্য সম্ভব করেন ও পাগড়ী প্রাপ্ত হন। উক্ত বিলাসখান-টোড়ী এখনও প্রচলিত আছে। বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত গায়ক আলফারাবী

( কানুন বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কারক ) তুর্কী সৈন্যের ছদ্মবেশে সৈফুদ্দৌলার রাজ দরবারে উপস্থিত হন। সৈফুদ্দৌলা তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বসিব, আপনার স্থানে, না আমার স্থানে ?" রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন, "তোমার স্থানে।" তৎশ্রবণে কারাবী সোজাসুজি গিয়া রাজকীয় সিংহাসনে বসিলেন। রাজা রাগান্বিত হইয়া সহচরদিগকে বলিলেন, "আমি ইহাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। ইনি যদি সেইগুলির যথাযথ উত্তর দিতে না পারেন, তোমরা তাহাকে যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার।" কারাবী রাজার অবোধ্য ভাষা বুঝিয়া বলিলেন, "অপেক্ষা করুন, আমিই আপনাকে শিক্ষা দিব।" রাজা অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে আহারে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলে, যখন তিনি অস্বীকার করিলেন, রাজা সঙ্গীতজ্ঞদিগকে গান গাহিতে আদেশ করিলেন। কারাবী প্রত্যেকের দোষ দর্শন করিয়া সমালোচনা করিলে রাজা তাঁহাকেই গাহিতে অনুরোধ করিলেন। কারাবী পকেট হইতে কয়েকটী শর লইয়া এমন এক সুর বাজাইলেন যে, দরবারস্থ রাজা প্রমুখ সকলে হাসিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি অন্য এক সুর বাজাইলে পুনরায় সকলে কাঁদিতে লাগিলেন। অনন্তর অপর এক সুর বাজাইলে যখন সকলে গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন তখন তিনি সন্তর্পণে দরবার ত্যাগ করেন। ভগবান্ নারদকে সত্যই বলিয়াছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মৎভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও নয়। আমার ভক্তগণ যেখানে গান করেন আমি সেখানেই থাকি।

## সাত

# বৈদিক ভারত *

হিন্দু ধর্মের আদি শাস্ত্র বেদ। এই বেদ সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুদের কি অদ্ভুত ধারণা ছিল তাহা নিম্নোক্ত ঘটনায় পরিস্ফুট। এই ঘটনাটী সুপণ্ডিত মোক্ষমূলার কর্তৃক বিবৃত। প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডারিক রোসেন লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি নকল করিতেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় দিল্লী সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে তখন লণ্ডনে গিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখিতে যাইয়া ডাঃ রোসেনকে উক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত দেখেন। তিনি উক্ত জার্মান সংস্কৃতজ্ঞের নিকটে যাইয়া বেদপাঠে সময় নষ্ট করার জন্য তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার করেন এবং উহা ছাড়িয়া উপনিষৎ অধ্যয়নে মনোযোগী হইতে পরামর্শ দেন। রামমোহনের পরামর্শ তাঁহার মনোমত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়। কারণ তিনি মৃত্যুকালেও বেদপাঠেই নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের যে লাটিন অনুবাদ করেন তাহা মূল সংস্কৃত সহ পরে প্রকাশিত হয়। বর্তমান ভারতে বেদ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ফ্রেডারিক মোক্ষমূলার অক্সফোর্ড হইতে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সায়ণ ভাষ্য সহ সমগ্র ঋগ্বেদ প্রকাশের পর শিক্ষিত হিন্দুদের দৃষ্টি পুনরায় ঋগ্বেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বেদ অপৌরুষেয়। ইহা মানব-রচিত নহে। ইহা ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বলিয়া অনাদি ও অভ্রান্ত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত বেদ

---

* সন ১৩৬০ সালে ১৯শে বৈশাখ (২রা মে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) শনিবার কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বোধচক্রের উদ্যোগে আহূত সভায় পঠিত এবং প্রসিদ্ধ মাসিক 'বিশ্ববাণী'তে ১৩৬০ ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত।

বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম। পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতি শব্দবাচ্য এবং তাহাদের প্রামাণ্য যে পর্য্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে সেই পর্য্যন্ত। সত্য দুই প্রকার—(১) যাহা মানব সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত এবং (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সংকলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারে সংকলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। বেদ নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান। সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম বেদ। সমস্ত দেশ কাল ও পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন; অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশ বিশেষ, কালবিশেষ বা পাত্রবিশেষে আবদ্ধ নহে। সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র বেদ।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ওল্ডেনবার্গ, উইণ্টারনিজ ও লিওপল্ড ভন শ্রেডার প্রভৃতি বেদের সমালোচক এবং মোক্ষমুলার ও ব্রুমহফার আদি বেদের প্রশংসাকারী। ওল্ডেনবার্গ বলেন, "স্থূল, খোসামুদে বাক্-সর্বস্ব, কল্পনার বাহ্য চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্যপ্রিয়তা বেদে পাওয়া যায়।" উইণ্টারনিজ ও শ্রেডারের মতে বেদ-মন্ত্র অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা লিপিবদ্ধ ও মনোযোগ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক রক্ষিত রচনা। অন্য কেহ বলেন, উহা চাষার গান। ব্রুমহফার মন্তব্য করেন, "স্বীয় মহত্ত্ববোধে জাগ্রত মানব জাতির ঊষাকালে বিহঙ্গের যে সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা উদিত হইয়াছিল বেদ তাহারই মত।" মোক্ষমুলার বেদ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি বলেন, "ইন্দো-ইউরোপীয় জগতে বেদই প্রাচীনতম সাহিত্য-স্তম্ভ। ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনের মৌলিক গবেষণায় বেদ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ গ্রন্থ জগতে আর নাই। বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ভারতীয় মনের ঐতিহাসিক বিকাশের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিবে। হোমার ব্যতীত গ্রীক সাহিত্য যেমন অসম্পূর্ণ, কোরাণ ব্যতীত আরবীয় সাহিত্য যেমন অসম্পূর্ণ এবং সেক্সপীয়র ব্যতীত ইংরাজি সাহিত্য

যেমন অসম্পূর্ণ বেদ ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যও তেমনি অসম্পূর্ণ। বেদাধ্যয়নে জানা যায় যে, ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষাসমূহ পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। ভাষার ইতিহাসে অন্ধতম প্রদেশে বেদ উজ্জ্বল আলোক সম্পাত করে। বেদই প্রাচীন পারস্যবাসীদের ধর্মপ্রথাবলীর আদি উৎস। দেরিয়াস ও জার্ক্সেসের তীর-চিহ্নিত শিলালিপির দুর্বোধ্য শব্দগুলির অর্থ বেদালোকেই আবিষ্কৃত। বেদের কবিত্বপূর্ণ ভাষার সহিত তুলনায় গ্রীস, ইতালি, জার্মানি ও আইসল্যাণ্ডের পুরাকাহিনীর অভিনব ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আর্য্য জাতিসমূহের আধুনিক ইতিহাসে যে সামজিক বিধি, স্থানীয় প্রথা ও প্রাবাদিক ভাব দৃষ্ট হয় তাহাদের অপ্রত্যাশিত অভিনব ব্যাখ্যা বেদের সরল কবিতায় বিদ্যমান।"

প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন পারস্যের অধিবাসিগণ পুরা কালে সিন্ধু নদীতীরে একত্রে বাস করিতেন। তাঁহারা আর্য নামে প্রখ্যাত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আর্য্যদের আদি বাস ছিল উত্তর ভারতে। তাই উহার নাম ছিল আর্য্যাবর্ত। আর্য্যগণ বহির্দেশ হইতে ভারতে আসেন নাই।" পারস্যের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় এবং ভারতের আদি শাস্ত্র বেদে বায়ু, সোম, যম, মিত্রাদি দেবতার উপাসনা দৃষ্ট হয়। অবশ্য, আবেস্তা অপেক্ষা বেদ প্রাচীনতর। ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম পুস্তক, মানব জাতির আদিগ্রন্থ। ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বেদের জন্মকাল নির্ণয়ের চেষ্টা আধুনিক পণ্ডিতগণ করিয়াছেন। তিলক ও জাকবীর মতে বেদ প্রচলিত খ্রীষ্টাব্দের পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্বে রচিত। মার্টিন ও কোলব্রুকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব বিশ শতক হইতে চৌদ্দ শতকের মধ্যে বেদ রচিত। তিলক তাঁহার প্রসিদ্ধ 'ওরিয়ন' (Orion) নামক গ্রন্থে জ্যোতিষিক গণনার সাহায্যে বেদের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ মোক্ষমুলার প্রণীত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়। উহাতে তিনি বেদের কাল নির্ণয়ে প্রথম প্রচেষ্টা করেন। মোক্ষমুলারের মতে বেদ প্রাগ্বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর অগ্রে রচিত। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত বহুলাংশে অনুমানিক। উইণ্টারনিজ বলেন, "দুর্ভাগ্যবশতঃ

ঋগ্বেদের জন্মকাল সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে ভীষণ মতভেদ বিদ্যমান। এই মতভেদ অনুসারে কালের পার্থক্য হয় শত শত বৎসরের নয়, সহস্র সহস্র বৎসরের। কাহারো মতে ঋগ্বেদের উৎপত্তি খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বৎসর এবং কাহারো মতে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ হইতে ৩০০০ বৎসরের মধ্যে। বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এত মতভেদ থাকিলে কোন তারিখ নির্ধারণ অসম্ভব। সম্ভবতঃ ইন্দো-আর্য্য সভ্যতার প্রারম্ভে বেদ রচিত।" ফ্রেডারিক শ্লেগেল সত্যই বলিতেন, "আদিম সভ্যতার ইতিহাস এখনও তমসাচ্ছন্ন। ইহার উপর কেবল বৈদিক ভারতই আলোক সম্পাত করিতে পারে। আমরা ভারতের নিকট হইতে সেই আলোক আশা করি।" জার্মান পণ্ডিত আলব্রেক্ট ওয়েবার ১৮৫২ খ্রীঃ তাঁহার প্রসিদ্ধ "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যের যে লিপিবদ্ধ নমুনা পাওয়া যায় তাহাই সাধারণতঃ ভারতের বৈদিক সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত।" উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৮৭৬ খ্রীঃ তিনি এই মন্তব্য যোগ করেন, "সম্প্রতি আবিষ্কৃত আসিরীয় সাহিত্য বা মিশরীয় সাহিত্যের যে পত্র পাওয়া যায় তদপেক্ষাও বৈদিক সাহিত্য প্রাচীনতর। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মেগাস্থিনিশ যে সমৃদ্ধ সভ্যতা ভারতে দেখেন তাহার আরম্ভ কাল কত হাজার বৎসর পূর্বে তাহা অনুমান করাও সুকঠিন।"

অবিভক্ত বেদের শব্দরাশিকে ব্যাসদেব চতুর্বেদে বিভক্ত করিলেন। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ—এই চারি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রাচীন ও প্রধান। ব্যাসদেব চতুর্বেদের বিভাগকর্তা বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস। তিনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বীপজাত। তিনি চারি বেদ বিভাগ করিয়া স্বীয় শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ ও সুমন্তকে অথর্ববেদ শিক্ষা দিলেন। বিষ্ণু পুরাণের ৩।৪।৭ শ্লোকে এই ঘটনা উল্লিখিত। বৈদিক যুগে লিপিবিদ্যা আবিষ্কৃত হয় নাই। সেইজন্য গুরুমুখে বেদ শ্রুত হইত। তাই বেদের অন্য নাম শ্রুতি। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ব্রাহ্মী লিপিতে সম্রাট অশোকের শিলালেখ লিখিত। ইহাই ভারতীয়

লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। তৎকারণে বেদ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সুরক্ষিত ছিল। ক্রমশঃ চারি বেদ শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে নানা শাখায় বিভক্ত হইল। উক্ত শাখা-প্রশাখাসমূহের অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত। ঋগ্বেদের যে অংশ এখন সাধারণতঃ প্রচলিত তাহা শৈশিরীয় শাখার অন্তর্গত। বাস্কল শাখার সংহিতাও খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়। শুক্ল যজুর্বেদের পনেরটী শাখার মধ্যে এখন কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখা প্রচলিত। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার Indo-Aryan Studies নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে বলেন, "সামবেদের কৌথুম শাখা গুজরাটে, জৈমিনীয় শাখা কর্ণাটে এবং রাণায়নীয় শাখা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত।" ডাঃ আলব্রেক্ত ওয়েবার বলেন, অথর্ববেদের পিপ্পলাদ শাখা কাশ্মীরে সুরক্ষিত আছে।

"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদ নামধেয়ম্"। বেদ প্রধানতঃ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে বিভক্ত। মন্ত্রাংশের অন্য নাম সংহিতা। কারণ এই অংশে মন্ত্রসমূহ সংহিত, সংগৃহীত। মন্ত্রসমূহ তিন প্রকার—ঋক্, সাম ও যজুঃ। যজ্ঞে হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু এই তিন প্রকার পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। নিয়মিত পাদাক্ষর ও ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রকে ঋক্ বলে। যজ্ঞকালে হোতা ও তৎসহকারীগণ ঋক্‌মন্ত্রে দেবতার আহ্বান করেন। গীতিরূপ মন্ত্র সাম। উদ্গাতা ও তৎসহকারীগণ সামগান করেন। যজুর্মন্ত্র গদ্যময়। অধ্বর্য্যু ও যজুর্মন্ত্রে তৎসহকারীগণ আহুতি প্রদান করেন। ঋষিরাই বেদ-মন্ত্রের দ্রষ্টা। তাঁহারা বেদমন্ত্রের রচয়িতা নহেন। চতুর্বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য বলেন, "নহি বেদস্য কর্তারো দ্রষ্টারঃ সর্ব এবাহ।" ঋষিগণ বেদ-কর্তা নহেন, তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা। বৈদিক যুগের তিন চারি হাজার বৎসর পরে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ হইতে সপ্তম শতকের মধ্যে যাস্ক আসিয়া নিরুক্ত রচনা করেন। ইহাতে বেদার্থ সংগৃহীত। যাস্কমতে, মননাৎ মন্ত্র। যাহার দ্বারা মনন করা যায় তাহাই মন্ত্র। যাস্ক বলেন, বেদমন্ত্রের আধিযাজ্ঞিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক অর্থত্রয় হইতে পারে। তাঁহার মতে "তেভ্যো হি অধ্যাত্ম ধিদৈবিকাদি মন্তারো মন্বন্তে, তদেষাম্ মন্ত্রত্বম্।" অর্থাৎ মন্ত্রসমূহ হইতেই মননকারীগণ অধ্যাত্ম ও আধিদৈবিকাদি বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন।

তপস্যার ফলে ঋষিগণ যে সত্যদর্শন করেন তাহাই মন্ত্রে অভিব্যক্ত। ঋগ্বেদোক্ত (১।৬।১৩) মন্ত্রে আছে, ঋষিগণ মন্ত্রকে তক্ষণ (carve) করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে (৭।৫।২।৫২) আছে, তাঁহারা মন্ত্রকে নিরখনন (dug) করেন। তাঁহারা অন্তঃসমুদ্র বা পরম ব্যোমের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের ২১টী শাখা ছিল। উহার যে শাখা অধুনা প্রচলিত তাহা বেদ মিত্র বা শাকল্য কর্তৃক রক্ষিত। ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০১৭টী সূক্ত আছে। যদি অষ্টম মণ্ডলোক্ত ১১টী বালখিল্য-সূক্ত ধরা যায় তাহা হইলে সূক্ত-সংখ্যা মোট দাঁড়ায় ১০২৮ অবধি। সূক্তসমূহের মন্ত্রসংখ্যা অনির্দিষ্ট। সমগ্র সংহিতার ঋক্-সংখ্যা ১০৪০২ হইতে ১০৬২২ পর্য্যন্ত। অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠান অনুসারে ঋগ্বেদ দুই প্রকারে বিভক্ত। অধ্যয়নের সৌকর্য্যার্থ ঋগ্বেদ আট অষ্টকে বিভক্ত। প্রত্যেক অষ্টকে আট অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায় আট বর্গে বিভক্ত। এক একটি বর্গে প্রায় পাঁচটী করিয়া ঋক্ আছে। অনুষ্ঠান অনুসারে ঋগ্বেদ দশ মণ্ডলে বিভক্ত। প্রত্যেক মণ্ডল অনেক অনুবাকে এবং প্রত্যেক অনুবাক্ বহু সূক্তে বিভক্ত। প্রত্যেক সূক্তে কয়েকটী করিয়া ঋক্মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মণ্ডলে সূক্তগুলি কোন ঋষি বা ঋষিকুল অনুসারে সজ্জিত; কিংবা কোন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। এইরূপে দ্বিতীয় মণ্ডলে গৃৎসমদ ও তাঁহার বংশধরগণের সূক্তসমূহ আছে। বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশের সূক্তসমূহ তৃতীয় মণ্ডলে পাওয়া যায়। চতুর্থ মণ্ডলে আঠান্নটি সূক্ত আছে এবং তন্মধ্যে চল্লিশটি সূক্তের দ্রষ্টা বামদেব। পঞ্চম মণ্ডলে অত্রিবংশের সূক্তাবলি সংহিত। ষষ্ঠ মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তের ঋষি ভরদ্বাজ। ঋষি বশিষ্ঠ ও তদ্বংশের সূক্তসমূহ সপ্তম মণ্ডলে সংগৃহীত। অষ্টম মণ্ডলে কাণ্ব ও আঙ্গিরসের সূক্তসমূহ সংবদ্ধ। নবম মণ্ডলে যত সূক্ত আছে তন্মধ্যে তিনটী ব্যতীত অন্য সমস্ত সোমের উদ্দেশ্যে রচিত। প্রথম মণ্ডলে বহু ঋষির ঋক্ মন্ত্র প্রদত্ত। সেই ঋষিদের মধ্যে অনেকেই শতর্চিন ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা শতাধিক ঋক্মন্ত্রের দ্রষ্টা। উক্ত মণ্ডলের সূক্তাবলী বহু দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। দশম মণ্ডলও প্রথম মণ্ডলের ন্যায় রচিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং ঐতরেয় আরণ্যক এবং

ঐতরেয় উপনিষদ্ ঋগ্বেদের অন্তর্গত। কৌষিতকী (বা সাংখ্যায়ন) ব্রাহ্মণ এবং কৌষিতকী আরণ্যক এবং কৌষিতকী উপনিষদ্‌ও ঋগ্বেদের অন্তর্গত। এইরূপে ঋগ্বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই চারি ভাগে বিভক্ত। অন্য তিন বেদ ঋগ্বেদের মন্ত্রাবলী গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গ আছে। চতুর্বেদ অধ্যয়নে এই ষট্ বেদাঙ্গ অপরিহার্য্য।

ঋগ্বেদাদি চতুর্বেদের ভাষ্য করিয়াছেন সায়নাচার্য্য। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত, মাধব বিদ্যারণ্য নামে অভিহিত এবং দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। সায়ন বেদ-মন্ত্রের মধ্যস্থ প্রত্যেক শব্দের অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বেদ-ব্যাখ্যা প্রধানতঃ যজ্ঞার্থক। ত্রয়োদশ শতকে আনন্দাচার্য্য ওরফে মধ্বাচার্য্য ঋগ্বেদের প্রথম চল্লিশ সূক্তের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। সায়নের পরে শ্রীরাঘবেন্দ্র স্বামী মধ্বাচার্য্য কৃত বেদ-ভাষ্যের যে টীকা রচনা করেন তাহার নাম 'মন্ত্রার্থঃ মঞ্জরী'। শ্রীরাঘবেন্দ্র একটী প্রাচীন পুরাণ বাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন, "এয়োঽর্থাঃ সর্ববেদেষু"। যুগর্ষি অরবিন্দ বলেন, "বেদ সত্যই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার আকর। প্রাচীন ঋষিকুল যে পরমার্থ প্রজ্ঞা লাভ করেন তাহাই আমাদের জন্য বেদে লিপিবদ্ধ। ঋষিগণ সাধারণ শ্রেণীর জ্ঞানী বা কবি ছিলেন না। তাঁহারা যে সর্বোচ্চ অনুভূতি বা পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হন তাহাই কথ্য ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁহারা সত্য-দ্রষ্টা এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নত স্তরে আরূঢ় ছিলেন। বেদ-মন্ত্রসমূহকে তাঁহাদের আঙুলের ছাপ (finger-print) এবং ইঙ্গিত-দণ্ড (sign post) বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সায়নের মতে বেদকে শুধু পুরাণ ও যজ্ঞগ্রন্থ বলিলে আধুনিক চিন্তাশীল মানুষের কাছে উহা অর্থহীন হইয়া পড়ে; কিংবা ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে বেদকে অর্ধ-সভ্য উপাসনার প্রাচীন পুস্তক রূপে ধরিলে অতীতের স্মৃতি-চিহ্ন বা পুরা বস্তুরূপে ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু উভয় মত ছাড়িয়া আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে,—উহা বেদ, উহা দিব্য জ্ঞান-গ্রন্থ এবং উহার অধ্যয়ন ও বাণী শ্রবণ বর্তমান কালে বিশেষ প্রয়োজন।"

ঋগ্বেদের ভাষা অতিশয় প্রাচীন এবং অত্যন্ত দুর্বোধ্য। সায়নও স্বীকার করিয়াছেন যে, উহার কোন কোন মন্ত্রের অর্থ সুনির্দিষ্ট নহে। যাস্কের নিরুক্ত ও সায়নের ভাষ্য অবলম্বনে বেদ কিঞ্চিৎ বোদ্ধব্য হয়। বেদাঙ্গের আলোকে বেদাধ্যয়ন সহজসাধ্য। বৈদিক সংস্কৃত পাণিনীয় সংস্কৃত হইতে বহুলাংশে পৃথক্। পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত। সুতরাং বৈদিক ভাষাকে অসংস্কৃত বলা চলে। কারণ, উহা আর্য্যদের কথ্য ভাষা ছিল। ঋগ্বেদ ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রচিত। বৈদিক ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টপ্ ও জগতী প্রধান। যাহা গায়ত্রী মন্ত্র নামে নিখিল ভারতে প্রচলিত তাহা গায়ত্রী ছন্দে রচিত বেদমন্ত্র মাত্র। ঋগ্বেদীয় ব্যাকরণ পাণিনীয় ব্যাকরণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৈদিক ভারতে কাঠে কাঠে ঘসিয়া আগুণ উৎপন্ন হইত। কোন কাঠে সহজে আগুণ পাওয়া যায় তাহা ঋষিরা জানিতেন। বৈদিক আর্য্যগণ স্ব স্ব গৃহে সর্বদা আগুণ জ্বালাইয়া রাখিতেন। ইরাণীদের ন্যায় তাঁহারা অগ্নির উপাসক ও যাজ্ঞিক ছিলেন। ঋগ্বেদে অগ্নি সম্বন্ধে যত সুক্ত আছে অগ্নি ব্যতীত অন্য কোন দেবতার সম্বন্ধে তত সুক্ত নাই। অগ্নির উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের এই প্রথম মন্ত্রটী রচিত। "অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্।"

নারী ঋষিও বেদমন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে বিশ্ববারা, অষ্টম মণ্ডলে অপালা, এবং দশম মণ্ডলে ঘোষা ও বাক্ প্রভৃতি নারী ঋষিগণ কর্তৃক মন্ত্র রচিত আছে। দশম মণ্ডলোক্ত দেবী সূক্তের দ্রষ্টী ছিলেন বাক্ নাম্নী ব্রহ্ম-বিদুষী। তিনি ছিলেন অম্ভৃণ ঋষির দুহিতা ও মন্ত্র দ্রষ্টা। দেবী সূক্তে আছে, বাক্ ব্রহ্ম-শক্তির সহিত স্বীয় আত্মার অভেদ অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি রাষ্ট্রী ও প্রথমা যজ্ঞিয়া। আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য ও সকল দেবতারূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে শক্তি দান করি।" দশম মণ্ডলে রাত্রি সূক্ত ও শ্রীসূক্ত প্রভৃতি আছে। অন্ততঃ উল্লিখিত সূক্তত্রয় হইতে বোঝা যায়, বৈদিক ভারতে জগৎকারণকে দেবীরূপে উপাসনা প্রচলিত ছিল।

ঋগ্বেদে অগ্নি, রুদ্র, বায়ু, মরুৎ, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সূর্য্য, সবিতা, পূষা, সোম, ঊষা, অশ্বিনীদ্বয়, দ্যৌ ও পৃথিবী প্রধান দেবতা ছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই প্রাকৃতিক দেবতা। ইহা ছাড়া রাত্রি, পর্জন্য, গাভী প্রভৃতিও দেবতারূপে কল্পিত হইতেন। বৈদিক দেবতাগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ পৃথিবীর, কেহ বা অন্তরীক্ষের, কেহ বা স্বর্গের দেবতা। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্ত্তী স্থান অন্তরীক্ষ এবং অন্তরীক্ষের ঊর্ধে স্বর্গ অবস্থিত। অগ্নি, সোম ও পৃথিবী পার্থিব দেবতা। ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ, বায়ু, পর্জন্য ও জল অন্তরীক্ষের দেবতা। দ্যৌঃ, বরুণ, মিত্র, সূর্য্য, সবিতা, পূষা, ঊষা, অশ্বিনীদ্বয় ও রাত্রি স্বর্গের দেবতা। সর্বদেবতার উপর এক দেবতা আছেন। এই চরম উপলব্ধি বৈদিক ভারতের ঋষিগণ লাভ করিয়াছিলেন। তাই ঋগ্বেদে আছে, "একং সং বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" অর্থাৎ সবিতা এক সদ্বস্তু এবং বিপ্রগণ বহু ভাবে তাঁহাকে বর্ণনা করেন। ইহাই ঋগ্বেদের মূল তত্ত্ব। বৈদিক দর্শন এই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মোক্ষমূলার এই মতবাদকে heno-theism নামে অভিহিত করিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব অবস্থা এইরূপে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২৯ সূক্তে বিবৃত আছে।—

নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং নাসীৎ রজো ন ব্যোম পরো যৎ।
কিম্ আরবীরঃ কুহকস্য শর্মন্ অম্ভঃ কিমাসীৎ গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীৎ অমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাৎ ধান্যন্ন পরঃ কিম্ চনাস॥
তম আসীৎ তমসা গুল্‌হমগ্রে অপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছেন আভু অপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা অজায়ত॥

অনুবাদ—তখন সৎ ছিল না; অসৎও ছিল না। তখন রজঃ বা ব্যোম বা স্বর্গ ছিল না। আবরক পঞ্চভূত বা আবরণীয় চৌদ্দ ভুবন না থাকায় কে কাহাকে আবৃত করিবে? গহন গভীর অম্ভঃ ছিল কি? তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃতও ছিল না এবং রাত্রি ও দিবসের জ্ঞান ছিল না। তখন তৎ (ব্রহ্ম) স্বীয় মায়ার সহিত অভিন্ন থাকিয়া বায়ুশূন্য প্রাণন ক্রিয়া করেন। তখন

মায়া-শবলিত ব্রহ্ম ব্যতীত এই সৃষ্ট জগৎ ছিল না। সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ তমসাচ্ছন্ন ছিল, কারণের সহিত অভিন্ন অজ্ঞায়মান সত্তারূপে ছিল। তুচ্ছকল্প ব্যাপক অজ্ঞানে যাহা আবৃত ছিল তাহা সৃষ্টি-কল্পনার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল।

ইহাই ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব। ব্রহ্ম, মায়া, সৃষ্টি আদি সব বস্তু ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ডাঃ প্রভুদত্ত শাস্ত্রী তাঁহার Doctrine of Maya পুস্তকে দেখাইয়াছেন, ঋগ্বেদে মায়াবাদ বিদ্যমান। ঋগ্বেদে সপ্ত সিন্ধু উল্লিখিত। সম্ভবতঃ সেইগুলি সিন্ধু ও উহার ছয়টী উপনদী। দশম মণ্ডলে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতুদ্রী (শতদ্রু), পরুষ্ণী (ইরাবতী), অসিক্লী (চিনাব), মরুদ্‌বৃধা, বিতস্তা, সুষোমা ও আর্জীকিয়া এই দশ নদীর উল্লেখ আছে। মরুদ্‌বৃধা, সুষোমা ও আর্জীকিয়া নদীত্রয়ের আধুনিক নাম নির্ণয় করা দুষ্কর। মরুদ্‌বৃধার শব্দগত অর্থ নদী। যাস্কের মতে আর্জীকিয়া বিয়াস এবং সুষোমাই সিন্ধুনদী। গঙ্গা অপেক্ষা সরস্বতীর মাহাত্ম্য ঋগ্বেদে অধিক পাওয়া যায়। বৈদিক ভারতে গঙ্গা দেবীরূপে পূজিতা হন নাই। তখন সরস্বতীই নদীরূপে ও দেবীরূপে পরিগণিতা ছিলেন। অনন্তর সরস্বতী বাগ্দেবীতে পরিণত হন। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট ঋক্‌ত্রয়ে (১।৩।১০-১২) সরস্বতীর অর্থ বাগ্‌দেবী ও নদী দেবী উভয়ই হইতে পারে। ঋগ্বেদে আছে, "অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতি।" যাস্ক বলেন, "সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবৎ দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।" সায়ন বলেন, দ্বিবিধা হি সরস্বতী—বিগ্রহবৎ দেবতা চ নদীরূপা।" ঋগ্বেদে সরস্বৎ শব্দ তিন বার আছে। সমগ্র ঋগ্বেদে গঙ্গার নাম একবার মাত্র পাওয়া যায়। এবং তাহা দশম মণ্ডলে। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৮।৬ সূক্তে 'জাহ্নবী' শব্দটী দেখা যায় ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের মতে ইহার অর্থ 'জহ্নুকুলজা' অর্থাৎ জাহ্নবী বা গঙ্গা। ইহা হইতে প্রতীত হয়, গঙ্গা-জন্মের পৌরাণিক কাহিনী বৈদিক আর্য্যগণ অবগত ছিলেন। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৫।৩১ সূক্তে আছে, "উরুকক্ষঃ ন গাঙ্গ্য।" ইহার অর্থ, গঙ্গার উচ্চ তীরে বাস করার ন্যায় বিপজ্জনক।

বৈদিক ভারতে আর্য্যগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিলেন এবং পশুপালন করিতেন। নদীতীরস্থ উর্বর জমি ও গাভীর জন্য তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন।

গায়ত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা বিশ্বামিত্র, রাজা সুদাসের পুরোহিত বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণ যুদ্ধে যোগদান ও সৈন্যচালনা করিতেন। ঋগ্বেদে উল্লিখিত রাজাদের মধ্যে সুদাস প্রসিদ্ধ। ভরত বংশীয় দশ জাতির সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয় তাহা ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে বিবৃত। উক্ত যুদ্ধে রাজা সুদাস জয়ী হন। রাজা সুদাসের সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী সৈন্যগণ ভরত নামে পরিচিত। ভরতের নামানুসারে এই দেশের নাম ভারত। খরস্রোতা পুরুষ্ণী নদীর তীরে দশরাজার সহিত সুদাসের যুদ্ধ হয়। আত্মরক্ষার্থ তিনি নদীর অন্য তীরে যাইতে সংকল্প করেন। কিন্তু পুরুষ্ণী নদীর জল ছিল সুগভীর। পুরোহিত বশিষ্ঠ ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিলেন নদীর জল অগভীর করিয়া দিতে, যাহাতে রাজা সুদাস সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া সহজেই অন্য তীরে যাইতে পারেন। ইন্দ্র বশিষ্ঠের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। পুরুষ্ণী নদীর জল কমিয়া যাওয়া মাত্রই সুদাস স্বীয় সৈন্যদল সহ নদীপার হইতে চলিলেন। ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদল নদীর গর্ভে প্রবেশ করিল। রাজা সুদাস ও তাঁহার সৈন্যদল নদীর অন্য পারে যাওয়া মাত্রই প্রবল বন্যা আসিয়া শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। শত্রুপক্ষের যে সকল সৈন্য ইতিমধ্যে অন্য পারে গিয়াছিল তাহারা সুদাসের সৈন্যদল কর্তৃক নিহত হইল এবং রাজা যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

বৈদিক ভারতের সুন্দর চিত্র ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। বৈদিক ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা, উপজীবিকা, রীতিনীতি, জাতিভেদ এবং খাদ্য পানীয়াদির বিশেষ বিবরণ ঋগ্বেদে আছে। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা ঋক্‌, যজুঃ ও সাম মন্ত্র রচনা করিতেন তাঁহারা "ঋষি' আখ্যা পাইতেন। ঋক্‌, মন্ত্র ও স্তোত্র একার্থক। ষষ্ঠ মণ্ডল ও ৭৫ সূক্তে পাওয়া যায়, ধনু ও তীরই ছিল বৈদিক ভারতের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। ঋগ্বেদে লৌহমুখ ও বিষাক্ত তীর উল্লিখিত। হস্তঘ্নের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সৈন্যগণ কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত চর্ম বন্ধন করিতেন। এই চর্ম-বন্ধনের নাম হস্তঘ্ন। সৈন্যগণ বর্ম পরিধান করিতেন। যুদ্ধে অশ্ব ও রথ ব্যবহৃত হইত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্বজাও উড়িত। ধনুর জ্যা গরুর স্নায়ুতে নির্মিত হইত। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫।৭ সূক্তে আছে, অশ্বগণ যখন

ভীষণ শব্দ করিতে করিতে ভীমবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইত তখন তাহাদের ক্ষুরের আঘাতে ধূলি ঝড় উঠিত। লোকে যেরূপ বস্ত্রাপহারক তস্করকে দেখিয়া চীৎকার করে তদ্রূপ শত্রুগণ যুদ্ধাশ্বকে দেখিয়া চীৎকার করিত। পক্ষিগণ যেরূপ নিম্ন দিকে আগমনকারী ক্ষুধার্ত শ্যেনপক্ষীকে দেখিয়া পলায়ন করে সেইরূপ লোকে অন্ন ও পশু লুণ্ঠনকারী দধিক্রাকে দেখিয়া চীৎকার করিত। দধিক্রা শব্দের অর্থ অশ্বরূপী অগ্নি। ঋগ্বেদেও যুদ্ধাশ্বকে অগ্নিরূপে তুলনা করা হইয়াছে। কোন কোন বীর নারীও যুদ্ধরথে সারথী হইতেন। দশম মণ্ডলে ১০২ সূক্তে উল্লিখিত আছে, গাভীজয়ের সময় ঋষি মুদ্‌গলের পত্নী মুদ্‌গলানী সারথিত্ব করিলেন। তিনি যখন রথারূঢ় হইয়া সহস্রজয়িনী হইলেন তখন বায়ুবেগে তাঁহার বস্ত্র সঞ্চালিত হইল।

বৈদিক ভারতে জাতিভেদ ছিল না। বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে প্রত্যেকে স্ব স্ব বৃত্তি গ্রহণ করিতেন। একই বংশে জাত ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৯০ সূক্ত পুরুষ সূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত সূক্তের দ্বাদশ ঋকে সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপদ পুরুষের বর্ণনা পাওয়া যায়। উক্ত পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, দুই বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন। সুতরাং ঋগ্বেদে চতুর্বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক-আর্যগণ আমিষাশী ছিলেন। তাঁহারা মৎস্য, মেষ, ছাগ, পক্ষী, অশ্ব, মহিষ ও বৃষমাংস খাইতেন। তাঁহাদের প্রধান শস্যখাদ্য ছিল যব। দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মাখন, মধু ও ইক্ষুরস ও সোমরস ও বহুবিধ ফল তাঁহাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। ঋগ্বেদে ধান্যের নাম পাওয়া যায় না; কয়েক স্থানে ধানাং শব্দটি দেখা যায়। সায়ন ভাষ্যে উক্ত শব্দটির অর্থ ভৃষ্ট যব বা ভাজা যব। ষষ্ঠ মণ্ডলে ১৬।৪৭ ঋকে আছে, অগ্নিতে গো ও বৃষ আহুতি দেওয়া হইত। দশম মণ্ডলে ২৭।২ ঋকে আছে, ইন্দ্রের জন্য স্থূলকায় বৃষ রন্ধন করিয়া দেওয়া হইতেছে। অতিথিকেও গো-মাংস খাইতে দেওয়া হইত। সেইজন্য অতিথির এক নাম ছিল গোঘ্ন।

বৈদিক ভারতে আচার-ব্যবহার ও আকৃতি-প্রকৃতি মূলতঃ বর্তমান ভারতের

মতই ছিল। আট দশ হাজার বৎসর পরে সমাজে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা অত্যদ্ভুত নহে। অক্ষক্রীড়া এবং অশ্বারোহণে বা রথারোহণে পণ রাখিয়া দৌড় প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ব্যসনও বৈদিক সমাজে প্রচলিত ছিল। দশম মণ্ডলে চৌত্রিশ মন্ত্রে পাশাস্তুতি আছে। তথায় অক্ষক্রীড়ায় অনুরক্ত ব্যক্তির অবশ্যম্ভাবী দুর্গতি সুন্দর ভাষায় বর্ণিত। তখন গৃহের কর্তা ছিলেন পিতা। কন্যার বিবাহ পিতাই স্থির করিতেন; অথবা কন্যা নিজেও স্বয়ম্বরা হইতেন। মহাভারতে যে স্বয়ম্বর বিবাহ উল্লিখিত তাহা বৈদিক ভারতে যেমন ছিল বর্তমান ভারতে প্রায় তেমনই আছে। দশম মণ্ডলে ১৮।৮ সূক্তে আছে, বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। কন্যারা পিতৃসম্পত্তির অংশ পাইতেন। বহু বিবাহে বাধা না থাকিলেও সাধারণতঃ লোকে এক বিবাহই করিত। নারীগণ সুন্দর পোষাক ও মূল্যবান্ অলঙ্কার পরিতেন। সুসজ্জিত সালঙ্কার ও সুশোভন নারীর উল্লেখ ঋগ্বেদে বহু স্থানে দেখা যায়। বৈদিক আর্য্যগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী হইলেও কেহ কেহ কামারের কাজ করিতেন। কামাররা কৃষিযন্ত্র, যুদ্ধাস্ত্র ও গৃহ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেন। সূত্রধরগণ গৃহ, রথ, নৌকা এবং সমুদ্রগামী জাহাজও নির্মাণ করিতেন। প্রথম ও পঞ্চম মণ্ডলে আছে, আর্য্যগণ বাণিজ্যার্থ বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথেও যাইতেন। চর্মকার, ক্ষৌরকার, বৈদ্য, গোষ্ঠরক্ষক, অশ্বচালক ও যব ভর্জনকারী এবং বস্ত্র বয়নকারীর উল্লেখ আছে। নারীগণই সম্ভবতঃ স্ব স্ব গৃহে বস্ত্র বয়ন করিতেন। বৈদিক ভারতে দস্যু-তস্করও ছিল এবং লোকে অন্য অপরাধও করিত। বৈদিক আর্য্যগণ সোমরস পানে অনুরক্ত ছিলেন। সোমলতা পাথরে ছেঁচিয়া দশ আঙ্গুল দিয়া চটকাইয়া রস বাহির করা হইত। এই কার্য্য নারীগণই করিতেন। সোমরস মেষলোমের ছাঁকনিতে ছাঁকিয়া গোচর্মের পাত্রে সঞ্চিত হইত। সোমরস ব্যতীত মাদক পানীয় সুরারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সুরাপানের কুৎসিত মত্ততা নিন্দিত ছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দেখা যায়, মৃত দেহের সংকার দুই ভাবে করা হইত। কেহ কেহ মৃতদেহ মাটিতে প্রোথিত করিতেন এবং কেহ কেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত

করিতেন। যক্ষা, কুষ্ঠ ও চিত্রক (শ্বেতী) রোগের উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। মন্ত্রশক্তিতে রোগারোগ্যের কথাও উল্লিখিত আছে। রোগ-চিকিৎসার জন্য বহুবিধ উদ্ভিদ্ ব্যবহৃত হইত। অশ্ব, অজ, মেষ, কুক্কুর, বানর, বরাহ, বৃক, শৃগাল, সিংহ, হস্তী ও উষ্ট্রের নাম ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়; কিন্তু ব্যাঘ্রের নাম পাওয়া যায় না। ময়ূর, কপোত, শ্যেন, গৃধ্র, চক্রবাক্, হংস ও কাক প্রভৃতি পক্ষীর নাম দেখা যায়। বৈদিক ভারতে রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা উভয়ই প্রচলিত ছিল।

ঋগ্বেদে অনেক পৌরাণিক কাহিনী বীজাকারে দেখা যায়। তন্মধ্যে বৃত্রসংহার, সমুদ্র-মন্থন, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিরোধ, পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ, বামন অবতারে বলি শাসন, শূনক্ষেপা প্রভৃতি উপাখ্যান উল্লেখযোগ্য। দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে উর্বশী ও পুরূরবার একটি কথোপকথন উল্লিখিত। উর্বশীর আদি অর্থ উষা। সূর্যোদয়ে উষা অন্তর্হিত হয়। উল্লিখিত কথোপকথনের ইহাই বিষয় বস্তু। উক্ত উপাখ্যান অবলম্বনে মহাকবি কালিদাস প্রসিদ্ধ নাটক 'বিক্রমোর্বশী' রচনা করেন। দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থন উপাখ্যানের মূলও ঋগ্বেদে নিহিত। প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তের নাম বিষ্ণুসূক্ত। উক্ত সূক্তে আছে, "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধেপদম্ সমূঢ়মস্য পাংসুরে।" ইহার অর্থ, বিষ্ণু এই জগৎ ত্রিবিধ পদক্ষেপ দ্বারা পরিক্রমণ করেন। তাঁহার ধূলি-যুক্ত পদে জগৎ আবৃত হয়। বৈদিক বিষ্ণু আদিত্য বা সূর্য্য। সুতরাং উদয়, আকাশে সংস্থিতি ও অস্তগমন তাঁহার এই ত্রিবিধ পদক্ষেপ। উক্ত আখ্যানটী পরবর্তী পৌরাণিক যুগে বৃহত্তর আকারে পরিণত হইল। বামন অবতারে ভগবান্ বিষ্ণু বলি রাজার নিকট ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিলেন।

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে শূনক্ষেপার উপাখ্যান পাওয়া যায়। শূনক্ষেপার পিতা ছিলেন অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যক্তি। তিনি স্বপুত্র শূনক্ষেপাকে এক সহস্র গাভীর মূল্যে কোন যজমানের নিকট বিক্রয় করেন। যাজ্ঞিক শূনক্ষেপাকে বাঁধিয়া যূপকাষ্ঠে বলিদানার্থ লইয়া গেলেন। কেহই তাহাকে উক্ত ক্রুর

কর্মে বাধা দিলেন না। পশুবৎ শূনক্ষেপাকে বলিদানের সকল ব্যবস্থা হইল। তখন হতভাগ্য শূনক্ষেপা অগ্নিদেবতার নিকট কাতর প্রার্থনা করিলেন। অগ্নিদেব দ্রুত বেগে আসিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের তেত্রিশ অধ্যায়ে এই আখ্যানটী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়। রামায়ণের বালকাণ্ডে ৬১-৬২ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের অনুশাসন পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত আখ্যান পুনরাবৃত্ত।

অথর্বনের পুত্র দধ্যাচ ঋষির মস্তক সম্বন্ধে একটি অলৌকিক উপাখ্যান ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে পাওয়া যায়। চতুর্বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যও উহা বিবৃত করিয়াছেন। ইন্দ্র দধ্যাচ ঋষিকে প্রবর্গ্য বিদ্যা ও মধুবিদ্যা শিক্ষাদানান্তে ভয় দেখাইল, "যদি এই বিদ্যা অন্য কাহাকে শিক্ষা দাও তোমার মাথা কাটিয়া লইব।" দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধ্যাচ মুনিকে এই নিষিদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। তাহারা ইন্দ্রের অভিশাপ স্মরণপূর্বক দধ্যাচের মস্তক কাটিয়া রাখিয়া একটী অশ্বশির লাগাইয়া দেন। অশ্ব-মুখেই দধ্যাচ অশ্বিনীকুমারযুগলকে উক্ত দুই বিদ্যা শিক্ষা দেন। ইন্দ্রদেব ইহা জানিতে পারিয়া দধ্যাচের অশ্বশির কাটিয়া ফেলেন। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তৎক্ষণাৎ পূর্ব নরশির যথাস্থানে লাগাইয়া দিয়া তাঁহাকে আদি অবস্থায় স্থাপিত করেন।

বর্তমান যুগে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক ভরনফ বানরের মাংসগ্রন্থি মানুষের গলায় লাগাইয়া জরানাশ ও পুনর্যৌবন দান করিতেছেন। বৈদিক ভারতে উক্ত প্রথা অন্য ভাবে প্রচলিত ছিল। আয়ুর্বেদীয় ঔষধ চ্যবনপ্রাশ সুপ্রসিদ্ধ। এই ঔষধ ঋষি চ্যবনের নামানুসারে প্রচলিত। ঋগ্বেদের ১১৭-১১৮ সূক্তে প্রাচীন ঋষি চ্যবনের কথা আছে। ঋষি চ্যবন বয়োবৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনের লোলচর্ম ছাড়াইয়া তাহাকে নব যৌবন ও নব স্বাস্থ্য দান করেন। তখন কুমারীগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। কক্ষিবৎও এইরূপে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হন। বন্ধ্যা নারীর পুত্রলাভ, বন্ধ্যা গাভীর দুগ্ধদানাদি অলৌকিক ঘটনাও বেদ-মন্ত্র-বলে সম্ভব হইত। কাণ্ব ও ঋজরাশ্বের অন্ধত্ব দূরীভূত হয় অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক।

নারী ঋষি অপালার কথা প্রথম মণ্ডলে আছে। সায়নাচার্য্য কর্তৃক উক্ত ঘটনাটী এই ভাবে বিবৃত। অপালা বিবাহিতা হন; কিন্তু রুগ্না হওয়ায় পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। তজ্জন্য তিনি পিত্রালয়ে বাস করিতে বাধ্য হন। পিতার ছিল টাঁক মাথা এবং অনুর্বর ভূখণ্ড। অপালা পথিমধ্যে সোমলতা পাইয়া উহা চিবাইয়া ফেলেন এবং স্বীয় মুখ হইতে সোমরস ইন্দ্রকে দান করেন। এই সোমরস পানে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার বরে অপালার রোগ এবং তৎপিতার টাঁক মাথা সারিয়া যায় ও তাঁহার অনুর্বর ভূমিও উর্বর হইয়া উঠে।

ঋগ্বেদীয় আর্য্যগণের সামাজিক ঐক্যবোধ কত প্রগাঢ় ছিল তাহা দশম মণ্ডলের সংজ্ঞান সূক্ত হইতে জানা যায়। উক্ত সূক্তের তিনটী ঋক্ এইরূপ—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বে সঞ্জানানা উপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রঃ অভিমন্ত্রয়েবঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥
সমানীব আকুতিঃ সমানাঃ হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

অনুবাদ—তোমরা সমবেত হও এবং এক বাক্য উচ্চারণ কর। তোমাদের মনসমূহ সমভাবে ভাবিত হউক। পূর্ব্বে দেবগণ যেরূপ একমত হইয়া আজ্যাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তোমরাও তদ্রূপ ঐক্যারূঢ় হইয়া ধনাদি গ্রহণ কর। তোমাদের স্তব একরূপ, প্রাপ্তি একরূপ, অন্তঃকরণ একরূপ এবং জ্ঞান একবিধ হউক। তোমাদের সমান মন্ত্রকে ঐক্য বিধানার্থ সংস্কার করি। হে দেবগণ, সকলের সাধারণ হবি দ্বারা তোমাদিগকে আহুতি দান করি। তোমাদের সংকল্প সমান, হৃদয়সমূহ সমান ও অন্তঃকরণসমূহ সমান হউক। যাহাতে তোমাদের পরম ঐক্য হয় তাহাই হউক।

ইহাই ছিল বৈদিক ভারতের মূল মন্ত্র। বৈদিক আর্য্যগণ কত শান্তিপ্রিয়

ছিলেন তাহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলোক্ত মধুসূক্ত হইতে জানা যায়। মধুসূক্তটী এইরূপ।—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তুওষধীঃ মধু নক্তমুতোষসো॥
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌঃ অস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্ নো বনস্পতিঃ মধুমান অস্তু সূর্যঃ॥
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অনুবাদ—সৎব্যক্তির প্রতি মধু বায়ু প্রবাহিত হয়, নদীসমূহ মধুরস দান করে। ঔষধিসমূহ আমাদের প্রতি মধুময় হউক। সকল রাত্রি ও সকল দিবস মধুময় হউক। পার্থিব রজঃ মধুর হউক। আমাদের পিতৃতুল্য দ্যুলোক মধুময় হউক। বনস্পতি মধুময় হউক। সূর্য্য মধুর কিরণ দান করুন। আমাদের গাভীসমূহ মিষ্ট দুগ্ধ দান করুক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

## আট

# ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণ

রামায়ণ ভারতের আদি কাব্য, প্রথম মহাকাব্য। পৃথিবীর মহাকাব্য সমূহের মধ্যে রামায়ণ সর্বপ্রথম, সর্বশ্রেষ্ঠ। গোবিন্দরাজ রামায়ণের যে টীকা লিখিয়াছেন উহার ভূমিকায় আছে, রামায়ণ মহাকাব্য ও ইতিহাস উভয়ই। শ্রীরামানুজাচার্য্য তৎকৃত রামায়ণ-টীকাতে উক্ত মহাকাব্য ও তৎপ্রণেতা বাল্মিকীর মাহাত্ম্য এইরূপে কীর্তন করিয়াছেন।—

বাল্মীকি-গিরি-সম্ভূতা রামাম্ভোনিধিসঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥
কুজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরূঢ়-কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকি-কোকিলম্।

অনুবাদ—রামায়ণরূপ গঙ্গা বাল্মীকিরূপ পর্বত হইতে উৎপন্ন এবং রাম-সাগরে মিলিত হইয়াই স্বর্গ-মর্ত্যাদি ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন। কবিত্ব-বৃক্ষের শাখায় আরূঢ় হইয়া মধুর স্বরে রাম রাম কূজনকারী বাল্মিকীরূপ কোকিলকে আমি বন্দনা করি।

সংস্কৃতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রামায়ণ একক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। কোন পরবর্তী কবি, লেখক বা মনীষী উহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ডাঃ এ. বি. কীথ তৎপ্রণীত "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" নামক ইংরাজি পুস্তকে (৪৩ পৃষ্ঠায়) বলেন, "ভারতীয় কবিতার ভাব ও রূপের আদি উৎস এই মহাকাব্য। পরবর্তী যুগের কোন কবি উহার প্রভাব-মুক্ত নহেন। যেমন তাঁহারা পর্যাপ্ত পরিমাণে উহার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন তেমনি তাঁহাদের ভাষার অলঙ্কারও ইহা হইতে প্রাপ্ত হন।" বাল্মিকীর মহাকাব্যই পরবর্তী ভারতীয় কবিতার আদি উৎস। রামাখ্যান আংশিক বা সমগ্র ভাবে ভারতীয় কবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা সকল প্রাদেশিক ভাষায় যে কত বিচিত্রভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। মহাভারতের বনপর্বস্থ 'রামোপাখ্যান'ই সম্ভবতঃ এইরূপ প্রাচীনতম বিবরণ। উহাতে মার্কণ্ডেয় মুনি কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট রামাখ্যান বিবৃত। রাবণের উৎপত্তি, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাধিক্য, দেবদূতের সহিত মন্থরার অভিন্নতা প্রভৃতি কোন কোন অপ্রধান বিষয়ে মূল গল্পের সহিত উহার পার্থক্য দেখা যায়। উহাতে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতাররূপে চিত্রিত এবং রাবণের দৌরাত্ম্য হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূত। দ্রোণ পর্বেও রামের উল্লেখ দেখা যায়। তথায় আছে, রাম সকল প্রাণী, ঋষি, দেবতা ও মানব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং চারি প্রকার প্রাণী সহ স্বর্গধামে উপনীত।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন কবিগণ রামায়ণের নিকট চিরঋণী। পাণিনি এক রামাখ্যান জানিতেন। উহা কি মহাভারতে উল্লিখিত রামায়ণ? বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে রামাখ্যান নানা রূপে দেখা যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থ "দশরথ জাতকে" রামাখ্যান সংক্ষেপে বিবৃত। উহাতে রাবণের বিরুদ্ধে রামের অভিযান উল্লিখিত

নাই; তথাপি রামের জনপ্রিয়তা উহাতে বিবৃত। জৈন ধর্মে রাম ও লক্ষণ ৬৩ শলক পুরুষের মধ্যবর্ত্তী। যাঁহারা ইতিহাস সৃষ্টি করেন তাঁহারা জৈন মতে শলক পুরুষ। উক্ত ৬৩ পুরুষের মধ্যে ২৪ জন তীর্থঙ্কর, ১২ জন চক্রবর্তী, ৯ জন বসুদেব, ৯ জন বলদেব এবং ৯ জন বিষ্ণুদ্বিষ বা প্রতিবসুদেব। রাম ও লক্ষণ যথাক্রমে অষ্টম বলদেব এবং অষ্টম বসুদেবরূপে পরিগণিত। বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রতের কালে তাঁহারা আবির্ভূত। রবিসেনাচার্যের পদ্মপুরাণে রামায়ণের প্রাচীনতম জৈন বিবরণ পাওয়া যায়। ইহার মতে গণাগ্রণী গৌতম ধীরবর্ধমানের নিকট হইতে রামাখ্যান শুনিয়া মগধরাজ সমীপে বিপুল পর্বতে বিবৃত করেন। বাল্মিকীর আদি কাব্যের সহিত জৈন বিবরণের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু আখ্যায়িকার মূল অংশে উভয় বিবরণ একমত। সীতা-রামের বিবাহ, তাঁহাদের বনবাস, সীতাহরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় জৈন বিবরণে পাওয়া যায়। জৈন মতে উক্ত গ্রন্থ চিত্তশুদ্ধিকর, অপৌরুষেয় এবং মানব জাতির শিক্ষার্থ উৎপন্ন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে রামাখ্যানের আদি উল্লেখ দেখা যায় অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে। পূর্বোল্লিখিত ডাঃ কীথ বলেন, "ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই যে, অশ্বঘোষের অন্যতম মূল উৎস রামায়ণ। যদিও কাওয়েল কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ প্রদানে অসমর্থ তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধচরিতে রামাখ্যানের উল্লেখ আছে এবং সূত্রালঙ্কারে রাম সম্বন্ধে একটি কবিতাও পাওয়া যায়।" বুদ্ধচরিতের ভাব ও ভাষা বহুলাংশে রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত। বাল্মিকীর নিকট যেমন রাম, অশ্বঘোষের নিকট তেমনি বুদ্ধ। অশ্বঘোষকে প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত ধরিলে বুঝা যায়, রামোপাসনা ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজেও প্রচলিত হইয়াছিল। উক্ত সিদ্ধান্ত অন্যান্য কারণেও সমর্থিত। সকল মহাপুরাণে রামচন্দ্র অবতার রূপে উপাসিত। পরবর্তী যুগে রামোপাসনা প্রচারার্থ চারিটি উপনিষৎ রচিত হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস প্রণেতা অধ্যাপক ডাক্তার হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন, "খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে লিখিত একটি নাসিক শিলালেখে এক রামতীর্থ উল্লিখিত। কিন্তু ইহা বলা শক্ত

যে, উহা রাঘবের নামানুসারে তীর্থ কিনা। কারণ জমদগ্নির পুত্র এবং এগুদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত নামে অভিহিত ছিলেন।"

ভারতের প্রাচীন মহাকবি ভাস রামাখ্যান নানা ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপ্রণীত তেরখানি নাটকের মধ্যে দুইখানির বিষয়-বস্তু রামায়ণ হইতে গৃহীত। তৎপ্রণীত "অভিষেক" নাটক কিষ্কিন্ধ্যাতে রামের শুভাগমনে আরব্ধ এবং তাঁহার অভিষেকে সমাপ্ত। উক্ত নাটক বাল্মিকীকে ঘনিষ্টভাবে অনুসরণ করিলেও চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। রামের লঙ্কাগমনার্থ কোন সেতু বন্ধনের উল্লেখ উহাতে নাই। সমুদ্রসলিল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া রামের লঙ্কাগমনের পথ করিয়া দেয়। ইহাতে হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নি-সংযোগের কথা উল্লিখিত আছে; কিন্তু লঙ্কাদহনের উল্লেখ নাই। ইহাতে আছে, রাবণবধের পরে দশরথের আত্মা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া রামের মস্তকে মুকুট পরাইয়া দেন। রামায়ণ সম্বন্ধে ভাসের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম প্রতিমা-নাটক। ইহাতে কবির সৃজনী প্রতিভা অধিকতর ক্রিয়াশীল। দশরথের প্রতিমা হইতে উক্ত নাটকের নামকরণ হইয়াছে। অযোধ্যার শাসক ইক্ষ্বাকু রাজবংশের প্রথানুসারে প্রত্যেক মৃত রাজার এক একটি মূর্তি রাজগৃহে প্রতিষ্ঠিত। দশরথের মৃত্যুর পর ভরত অযোধ্যায় আহূত হন এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণের স্মৃতি-মন্দিরে দশরথের প্রতিমা দেখিয়া বিস্মিত হন এবং ভাবেন যে, তাঁহার পিতা নিশ্চয়ই স্বর্গগত। উহাতে কৈকেয়ীর চরিত্র এবং সীতাহরণ অন্য ভাবে চিত্রিত। রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে আসিয়া কৌশলে রাম-লক্ষ্মণকে সোণার হরিণের পশ্চাতে প্রেরণ করেন। তখন যে বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ হইবার কথা ছিল তাহার জন্য উক্ত সোণার হরিণ আবশ্যক বলিয়া সাধুবেশী রাবণ রামকে পরামর্শ দেন। সীতাহরণের কথা শুনিয়া ভরত রামের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু ভরত যথাসময়ে উপস্থিত হইবার পূর্বে রাম রাবণ যুদ্ধে বিজয়ী হন।

মহাকবি কালিদাসও রামাখ্যান বর্ণনায় পঞ্চমুখ। তৎপ্রণীত 'রঘুবংশ' রামের অন্যতম পূর্বপুরুষ রঘুর বংশ-বিবৃতিতে পর্য্যবসিত। উক্ত মহাকাব্যের

ছয় সর্গে রাম চরিত্র বর্ণিত। কালিদাস তাঁহার কল্পনালোকে প্রাচীন আখ্যানের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় কখনো কোন অংশ পরিবর্দ্ধিত, কখনো বা কোন অংশ সংক্ষিপ্ত এবং বাল্মিকী কর্তৃক উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান প্রায়শঃ চেষ্টিত। কোন কোন বিষয়ে তিনি বাল্মিকীর সহিত একমত নহেন। কালিদাসের মতে রামের বংশ-পরিচয় পৃথক্। গৌতম মুনির ভ্রান্তা পত্নী অহল্যাকে রাম যে অভিশাপ হইতে মুক্ত করেন তাহাও ভিন্ন। অদ্ভুত স্বপ্ন হইতে দশরথের পত্নীগণ রামাবতারের ইঙ্গিত অবগত হন। রামায়ণের অনেক আখ্যান ও চরিত্র সম্বন্ধে কালিদাস যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য সূত্রবৎ প্রকাশ করেন তাহাই কালিদাসের মহাকাব্যের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ অংশ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।—ভরত পিতৃদত্ত রাজশক্তির প্রতি চৌদ্দ বৎসর অনুরক্ত রহিলেন। ইহা কোন তরুণের কোন তরুণীর সহিত কঠিন অসিধর ব্রতপালনের মত। মহাকবি ঘোষণা করেন যে, রাবণ-বধের পর সীতা অযোধ্যায় প্রত্যাগতা হইলে যখন ভরত তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন তখন দুই পবিত্রাত্মার পুণ্য মিলন হইল। যে বনে দশরথ মৃগয়া করিতেন তাহার চমৎকার বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায়। রাবণ বিজয়ের পরে যখন রাম পুষ্পক রথে চড়িয়া আকাশ-পথে অযোধ্যায় ফিরিলেন তখন আকাশ-পথ হইতে ভারতের সুন্দর বর্ণনা কালিদাস দিয়াছেন। রাম কর্তৃক সীতা-বর্জনের ঘটনাটী মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত। রামাখ্যান চিত্রণে বাল্মিকীর সহিত কালিদাসের তুলনা করিয়া কোন পাশ্চাত্য সমালোচক বলেন, "স্বভাবতঃই জ্যেষ্ঠ কবি অপেক্ষা কনিষ্ঠ কবির পক্ষে অধিকতর সুযোগ আছে।" মধ্যযুগের কবি সোমেশ্বর বলেন, দুগ্ধে শর্করা সংযোগবৎ কালিদাসের রামাখ্যান চিত্রণ মনোহর। কালিদাসের মহাকাব্যে শব্দাবলী সুনির্বাচিত এবং উপমাসমূহ সুপ্রযুক্ত হইলেও স্বাভাবিক ঘটনা-স্রোত স্থানে স্থানে রুদ্ধপ্রায়। কিন্তু তাঁহার উপমা কত উপযোগী তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। [যখন দিলীপ বানপ্রস্থ আশ্রমে গমনেচ্ছু হইয়া পুত্র রঘুকে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন

করেন, তখন রঘু পিতাকে আরও কিছু কাল গৃহে থাকিতে অনুরোধ করেন। দিলীপ পুত্রের কাতর প্রার্থনা শুনিয়াও শুনিলেন না। মহাকবি বলেন,/ "সর্প যেরূপ একবার নির্মোক পরিত্যাগ করিলে পুনরায় তাহা গ্রহণ করে না মহারাজ দিলীপও তদ্রূপ ত্যক্ত রাজ্য আর গ্রহণ করিলেন না। অন্ধ মুনির পুত্র দশরথের বাণে নিহত হইলেন। রাজা মৃত পুত্রকে লইয়া অন্ধ মুনির নিকট আসিলেন। অন্ধ মুনি পুত্র-হন্তা দশরথকে এই অভিশাপ দিলেন, "আপনি আমার মত পুত্র-শোকে দেহত্যাগ করিবেন।" নিদারুণ অভিশাপ শ্রবণে দশরথ জড়বৎ নিশ্চেষ্ট রহিলেন। তাঁহার শোচনীয় দুরবস্থা মহাকবি কালিদাস এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, "বিষশূন্য মহানাগ পদাহত হইয়া যেরূপ নিশ্চেষ্ট থাকে অমিতবিক্রম দশরথও ভয়ঙ্কর অভিশাপ শ্রবণে তদ্রূপ নির্বাক্ রহিলেন।" সত্যই উক্ত হইয়াছে যে, উপমা কালিদাসস্য।

কেহ কেহ অনুমান করেন, কালিদাসের 'রঘুবংশ' এর অন্যতম উৎস পদ্মপুরাণ। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে পুরাণসমূহে কিরূপে রামাখ্যান চিত্রিত উহা সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, কূর্ম পুরাণ, বায়ু পুরাণ ও পদ্ম পুরাণ প্রভৃতিতে রামাখ্যান বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত। কোন কোন পুরাণ কর্তৃক রামাখ্যান চিত্রণে অভিনবত্ব প্রদর্শিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কোন পুরাণ মতে মন্থরা ছদ্মবেশী দেবী এবং কৈকেয়ীকে ঈর্ষান্বিতা হইতে প্রলুব্ধা করিলেন রাবণ বধরূপ দৈব কার্য্য সিদ্ধির জন্য। পুরাণসমূহের উৎপত্তি কাল অনিশ্চিত হইলেও কোন কোন পুরাণ নিঃসন্দেহে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। প্রাচীন পুরাণ-সমূহে রামচন্দ্র অবতাররূপে চিত্রিত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের এক অংশ 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' নামে বিদিত। ইহাতে রাম-চরিত্রের দিব্য ভাব চিত্রণে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপিত। বিখ্যাত 'রাম-হৃদয়' স্তোত্র এবং জনপ্রিয় "রামগীতা" ইহার অন্তর্ভুক্ত। 'রাম-গীতা'য় রামচন্দ্রের উপদেশাবলী সংগৃহীত। ইহাতে বাল্মিকীর পূর্ব জীবন পাওয়া যায়। দস্যু রত্নাকরের বাল্মিকী মুনিতে পরিণতির কথা ইহাতে সুন্দর ভাবে বর্ণিত। অধ্যাত্ম রামায়ণের তারিখ

অনিশ্চিত হইলেও ইহা অতি আধুনিক বলিয়া বিবেচ্য নহে। বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি বহু ভারতীয় ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ইহার পাঠ শুনিতে অতিশয় ভালবাসিতেন। কাহারো কাহারো মতে রামানন্দ ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

যোগবাশিষ্ট রামায়ণ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী বলিয়া বিবেচিত নহে। ইহা বাল্মিকী রামায়ণের পরিশিষ্টরূপে গৃহীত। ইহাতে অনেক আখ্যায়িকার সাহায্যে অদ্বৈত বেদান্তের আলোকে যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যাত। রামের প্রতি বশিষ্ঠের উপদেশ ইহাতে প্রদত্ত। বশিষ্ঠোত্তর রামায়ণ এবং অদ্ভুত রামায়ণে আছে, শতশির রাবণ সীতা কর্তৃক নিহত হন। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের জন্মকাল অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনে হয়। কারণ যুগে যুগে রামাখ্যানের রূপান্তর ইহাতে উল্লিখিত নাই।

নাট্যকাররূপে কালিদাসের পরেই ভবভূতির স্থান। ভবভূতির যে দুই নাটকে রাম-চরিত্র চিত্রিত তন্মধ্যে একটীর নাম 'মহাবীর চরিত'। ইহাতে রামের রাজ্যাভিষেক বিবৃত। উক্ত নাটকের ভূমিকায় কবি নিজেকে রামভক্তরূপে পরিচয় দিয়াছেন। বাল্মিকীর রামায়ণ হইতে যে সকল অভিনবত্ব ইহাতে সংযোজিত তৎসমুদয় পরবর্তী নাট্যকারগণ কর্তৃক পরিগৃহীত। ইহাতে রাবণের কার্য্য প্রথম হইতেই দেখা যায়। রাবণ রামের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সীতার পাণি-প্রার্থী। রাম সীতার পাণি-গ্রাহী হওয়ায় রাবণ ক্রুদ্ধ হইলেন। সূর্পনখা মন্থরার ছদ্মবেশে কৈকেয়ীর মন বিষাক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, রাম বনবাসী হইলে সীতাহরণ সম্ভবপর হইবে। বালি রাবণের মিত্ররূপে বর্ণিত। তিনি রামের বিরুদ্ধে রাবণের পক্ষ সমর্থনকারী। ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' রামায়ণের উত্তর কাণ্ড অবলম্বনে রচিত। ইহাতে ভাব এবং ভাষার চারুত্ব ও লালিত্য অপূর্ব। বাল্মিকী রচিত একটী নাটক রামচন্দ্র ও অযোধ্যাবাসিগণের সম্মুখে অভিনীত হয়। ইহাতে সীতার মর্য্যাদা রক্ষিত এবং তৎপরে রামের সহিত তাঁহার মিলন সূচিত হয়।

ভবভূতির 'মহাবীরচরিত' অবলম্বনে যে সকল নাটক রচিত তন্মধ্যে মুরারির 'অনর্ঘ্য-রাঘব' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। উইলসন হইতে কীথ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সমালোচকগণ মুরারির প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভারতে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে সমাদৃত। বালিবধের আখ্যায়িকায় তিনি লক্ষ্যনীয় বিশেষত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। কবন্ধের কবল হইতে গুহককে রক্ষার চেষ্টায় লক্ষণ অনবধানতা সহকারে দুন্দুভির অস্থিপঞ্জর নিক্ষেপ করেন। ইহাকে অপমান মনে করিয়া বালি রামকে আক্রমণ করেন।

ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত কুমারদাসের 'জানকী হরণ' সুচারু বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বাল্মিকী রামের বাল্যলীলা সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু কুমারদাস রামের বাল্যকালের কতিপয় সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। রাজপুরীর রমণীগণ বালক রামকে খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, "রাম এখানে নাই। সে কোথায় গিয়াছে?" বালক যুক্ত করে স্বীয় মুখ ঢাকিয়া রমণীদের সহিত লুকোচুরি খেলা খেলিতেছিলেন। ভট্টির "রাবণ-বধ" প্রায় একই কালে উৎপন্ন। ব্যাকরণের নিয়মাবলী উদাহৃত করিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে রামাখ্যান প্রযুক্ত। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি বাল্মিকীর মহাকাব্যের অতিশয় বিচারমূলক গুণগ্রাহিতা করিয়াছেন। মধ্যযুগের বহু দূর পর্য্যন্ত অগণ্য নাটক কাব্য ও রামাখ্যান অবলম্বনে রচিত হয়। তন্মধ্যে রাজশেখরের 'বালরামায়ণ', শক্তি-ভদ্রের 'আশ্চর্য্যচূড়ামণি,' রামভদ্র দীক্ষিতের 'জানকী পরিণয়', এবং বেদান্ত দেশিক নামে পরিচিত বেঙ্কটনাথের 'হংস সন্দেশ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম তিনটী নাটক এবং শেষটী সীতাবিরহে রামের শোক বর্ণনামূলক কাব্য ও কালিদাসের 'মেঘদূত' তুল্য রচিত। এক শত আট উপনিষদের মধ্যে দুইখানি রাম সম্বন্ধে এবং একখানি সীতা অবলম্বনে লিখিত ঈশ্বরাবতাররূপে রামোপাসনা প্রচার উদ্দেশ্যে উক্ত উপনিষৎত্রয় লিখিত। উক্ত কালে অসংখ্য রাম-স্তোত্রও রচিত হইয়াছে।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। তৎসমুদয় মনোহর রাম-চরিত্র বর্ণনে তৎপর। এই শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তামিল

আড়বারগণের কাব্যসমূহ প্রাচীনতম। তাঁহাদের তারিখ অনিশ্চিত হইলেও ছয় বা সাত শতক ধরিয়া সেইগুলি প্রচলিত এবং তাহাদের রচনা খ্রীষ্টীয় অব্দের বেশী পরে আরব্ধ নহে। কেরল দেশের প্রসিদ্ধ রাজা কুলশেখর অন্যতম আড়বার ছিলেন। তিনি পরম রামভক্ত। পরকাল প্রমুখ অন্যান্য রামভক্তও রাম-মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। কম্বের রামায়ণ অনেক পরবর্তী হইলেও দক্ষিণ ভারতে বাল্মিকীর মহাকাব্যের ইহাই প্রাচীনতম অনুবাদ। উক্ত তামিল কাব্য প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুবাদ নহে। ইহাতে সৃজনী কল্পনার আলোকে কবি প্রাচীন আখ্যান অভিনব ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্বাধীন কাব্যে বাল্মিকীর ব্যাখ্যা ও আলোচনা পাওয়া যায়। ইহাতে সংস্কৃত মহাকাব্য অপেক্ষা আরও প্রকাশ্য ভাবে রামের অবতারত্ব ঘোষিত। কম্বের ভাষা ও অলঙ্কার পাশ্চাত্য সমালোচকগণ কর্তৃক প্রতিকূলভাবে সমালোচিত হইলেও তিনি তামিল দেশের কবি-সম্রাটরূপে পূজিত।

অভিনব কম্বের 'রামচন্দ্র-চরিত-পুরাণ' কানাড়া ভাষায় প্রাচীনতম রামায়ণী কথাগ্রন্থ। ইহাতে রামায়ণের জৈন সংস্করণ দৃষ্ট হয়। রামের বনবাস, সীতাহরণ ও রাবণবধ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে বাল্মিকীর সহিত উহার সাদৃশ্য নাই। উক্ত গ্রন্থের অদ্ভুত বিশেষত্ব এই যে, উহা লক্ষণকে বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, লক্ষণ অনেক বীরত্ব-ব্যঞ্জক কার্য্যে কুশল এবং বহু রাজকুমারীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত। ইহাতে বানরগণ বানররূপে চিত্রিত নহে, কপিধ্বজ সৈন্যরূপে বর্ণিত। হনুমান হনুবর দ্বীপের রাজকুমার এবং রাম অবশেষে সন্ন্যাসী হইয়া তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত। পরিশেষে রাম নির্বাণ লাভ করেন। বাল্মিকী মহাকাব্যের কানাড়ী তর্জমা পরবর্তী যুগে রচিত হয়। ইহার রচয়িতা কুমার বাল্মিকী নামে অভিহিত। রামায়ণের তেলেগু অনুবাদ করেন রঙ্গনাথ। তেলেগু ভাষায় ইহা অন্যতম প্রাচীন কাব্য। মালয়ালী সাহিত্য রামচরিত অবলম্বনে আরব্ধ এবং রামাখ্যান-মূলক কাব্য ও নাটকে পরিপূর্ণ।

উত্তর ভারতে রামায়ণের যত অনুবাদ হইয়াছে তন্মধ্যে তুলসীদাস কৃত 'রামচরিত মানস' সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা অযোধ্যার হিন্দি ভাষায় ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। উক্ত হিন্দি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ডাঃ কার্পেন্টার তাঁহার Medieval Theism in India পুস্তকে (৫০৯ পৃষ্ঠায়) বলেন, "বাল্মিকীর আখ্যায়িকার প্রধান অংশ ইহাতে রক্ষিত, কতিপয় ঘটনা অনুল্লিখিত এবং এবং কয়েকটী নূতন ঘটনা সংযোজিত এবং আন্তরিক অনুরাগের নূতন পরিবেশে সমগ্র বিষয় অবগাহিত।" বহু শতাব্দী যাবৎ তুলসী দাসের রামায়ণ লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিকট বেদবৎ পঠিত ও পূজিত। নাভাজী 'ভক্তমাল' নামক হিন্দি গ্রন্থে বলেন, "কলি কুটীল জীব নিস্তার হেতো বাল্মিকী তুলসী ভয়ো।" ইহার অর্থ, কুটিল কলিকালের ভয় হইতে মানবকে মুক্ত করিবার জন্য বাল্মিকী তুলসী দাসরূপে অবতীর্ণ। গোপাল দাস বলেন, "ভবসংসারকো পার নেহি এ্যাসা হ্যায় ফৈলাব। তুলসী দাস কৃপা করি রচি রামায়ণ নাব।" অর্থাৎ ভবসাগর অপার। উহা সহজে পার হইবার জন্য তুলসী দাস কৃপাপূর্বক এই রামায়ণ রূপ নৌকা রচনা করিলেন। মধুসূদন সরস্বতী বলেন, "আনন্দ-কাননেহ্যস্মিন্ জঙ্গমস্তুলসী তরুঃ। কবিতা-মঞ্জরী ভাতি রাম-ভ্রমর-ভূষিতা।" এই আনন্দ-কাননে জঙ্গম তুলসী তরু বিরাজিত। উহার কবিতা-মঞ্জরী রাম-ভ্রমর-ভূষিত। অদ্যাবধি তুলসীদাসকৃত রামায়ণের তিনটি বঙ্গানুবাদ হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত চিন্তামণি ত্রিপাঠী এবং ঈশ্বর প্রসাদ ত্রিপাঠী কৃত রামায়ণের হিন্দি অনুবাদও আছে। জৈন সাহিত্যিক বিমল তৃতীয় শতকে জৈন মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রামায়ণের যে অনুবাদ করেন উহার নাম 'পৌনচর্য্যম্'। পঞ্চদশ শতকে রামায়ণের আসামী অনুবাদ রচিত হয় অনন্ত কণ্ডলী কর্তৃক। সপ্তদশ শতকে রামায়ণের গুজরাতী অনুবাদ করেন প্রেমানন্দ। বস্তুতঃ সকল ভারতীয় ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ হইয়াছে। পঞ্চদশ শতকে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার নিকটবর্তী গঙ্গাতীরস্থ ফুলিয়া

গ্রামে তাঁহার প্রপিতা মুরারি ওঝা বাস করিতেন। উক্ত গ্রামে প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশে কবিবর কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বনমালী ওঝা ও মাতার নাম মালিনী দেবী। কৃত্তিবাস সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃতে শ্লোক রচনার জন্য গৌড়েশ্বর গণেশ কর্তৃক অভিনন্দিত হন। উল্লিখিত গৌড়েশ্বরের আদেশে তিনি বাংলা রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সর্বাপেক্ষা প্রচলিত হইলেও অন্যান্য বাংলা রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেনের রামায়ণ, কবিচন্দ্রের রামায়ণ, জগৎরামের রামায়ণ এবং নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ উল্লেখযোগ্য। নিত্যানন্দ অমৃতকুণ্ডা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং রামায়ণ লিখিয়া অদ্ভুতাচার্য্য আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহার রামায়ণ উত্তর-পূর্ব বঙ্গে পঠিত হইত। রঘুনন্দন গোস্বামীর "রামায়ণ" একখানি উৎকৃষ্ট রামায়ণ। কিন্তু ইহা বৈষ্ণব ভাবে অতিরঞ্জিত। মহাভারতের ন্যায় রামায়ণও বাংলার গৃহে গৃহে পঠিত হইত এবং এখনও হয়। রামায়ণ বাংলার জনসাধারণের মনে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় উল্লেখপূর্বক এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।—

"রাত্রি সমাগমে পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণকালে রাস্তার পাশে সামান্য পর্ণকুটীরে দেখা যায়, কোন বালক ক্ষুদ্র প্রদীপের ধারে বসিয়া কতিপয় বয়স্ক নরনারীর নিকট বাংলা রামায়ণ পড়িয়া শোনাইতেছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শ্রোতৃবৃন্দ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া ভক্তিভরে বলিয়া উঠে, "সীতাপতি রামচন্দ্রকী জয়।" সহরের দোকানদারও তাহার জিনিষপত্র ওজন করিবার সময় সংখ্যা এইরূপে গুণিতে থাকে, একে রাম, দুয়ে রাম, তিনে রাম ইত্যাদি। গণনা সমাপ্ত হইলে সে যেন পূজার স্বপ্নে ঢলিয়া পড়ে। শোনা যায়, এইরূপে পণ্য দ্রব্য পরিমাণ কালে কোন ব্যক্তি চার বার রাম নাম উচ্চারণ করিয়া এত বৈরাগ্য ও ভক্তিভাবে অভিভূত হয় যে, সে সংসার ত্যাগপূর্বক

সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যায়। রমণী বজ্রপাতে ভীতা হইয়া বলে, 'সীতারাম'। শববাহকগণ বলিতে থাকে, "রামনাম সত্য হ্যায়"।

উত্তর ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে রামায়ণের প্রভাব সুগভীর। তুলসী রামায়ণ বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে ঘরে ঘরে পঠিত হয়। উহার ইংরাজী অনুবাদক গ্রীয়ারসন বলেন, "বাংলা ও পাঞ্জাবের মধ্যে এবং হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারতে তুলসী রামায়ণ হিন্দুদের বাইবেলরূপে সমাদৃত।" রাশিয়ার মনীষী বরাননিকভ তুলসী রামায়ণের রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

---

## নয়

# ভারতের সাধনা *

সৌর বা স্বর্গীয় আলোক চিরকাল প্রাচ্য হইতেই আসিয়াছে এবং অধ্যাপক টিণ্ড্যালের ভাষায় ইহা ভবিষ্যতে প্রাচ্য হইতেই আসিবে। উভয়ে মিলিত হউক বা না হউক প্রাচ্যের সাধনাই পাশ্চাত্য গ্রহণ করিয়াছে। বিধাতার এই বিশেষ বিধান যে, প্রাচ্যই সকল বিশ্ব ধর্মের ভাগ্যবতী জননী। আরও উল্লেখযোগ্য অর্থপূর্ণ ঘটনা এই যে, প্রাচ্যের ধর্মাচার্য্যগণ একই বাণী প্রচার করিয়াছেন। প্রাচ্য এক বলিয়া প্রাচ্যের বাণীও এক। ইতিহাসের আদি উষা হইতে বিংশ শতকের মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অবতারবৃন্দ ও আচার্য্যগণ যুগে যুগে বিভিন্ন প্রাচ্য দেশে আবির্ভূত হইয়া একই বাণী প্রচার ও সাধন করিয়াছেন। জীবনের আধ্যাত্মিকতা ও মানবের দেবত্বই

---

* মাদ্রাজের ইংরাজি মাসিক 'এডুকেশন্যাল রিভিউ' পত্রিকার ১৯৩৪ জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

তাঁহাদের অমর বাণী। ইহাই সমগ্র পৃথিবীর প্রতি প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ দান। প্রাচ্যের প্রাণ ভারত। সমগ্র প্রাচ্য ভারতের সাধনায় দীক্ষিত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সত্যই গাহিয়াছেন, "মহিমায় তুমি পুণ্যভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।"

সাম্রাজ্যবাদ ও ধনবাদ রূপ দ্বিশির অক্টোপাশ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। জাতীয়তাবাদ ও যুক্তিবাদের শতবুলি আওড়াইয়া পাশ্চাত্য মানুষকে রথচক্রে এবং ঈশ্বরকে রাষ্ট্ররথে পরিণত করিয়াছে। ইহার ফলে সে একচক্ষু, একহস্ত বা একপদ হইয়া আজ অঙ্গহীন অকর্মণ্য অবস্থায় উপনীত, সর্বনাশ ও ভ্রান্তি-ভঙ্গের শেষ সীমায় নিপতিত। রাশিয়ার সাম্যবাদ, ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদ ও আমেরিকার ধনবাদ ফরাসী বিপ্লব অপেক্ষাও ঘোরতর বিপ্লব এই যুগে সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থনৈতিক সাম্যবাদই রাশিয়ার মূলমন্ত্র এবং কার্ল মার্কসই তাহার দীক্ষা-গুরু। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা সর্ব প্রকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব—এই পাশ্চাত্য নীতি যে কত ভ্রান্ত তাহা আধুনিক বিশ্বযুদ্ধ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছে। বিশ্বশান্তির জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা কেবল প্রাচ্যই, ভারতই দান করিতে সমর্থ। আর. ডবলিউ. লিভিংষ্টোনের ভাষায় গ্রীসীয়বাদ ও রোমীয়বাদ এবং তাহাদের তরুণ সন্তান ইউরোপীয়বাদ আমাদিগকে সৌন্দর্য্য, স্বাধীনতা, প্রত্যক্ষতা, মানবতা, সৌম্যভাব ও বহুমুখিনতা ব্যতীত অন্য কিছু দিতে পারে না। বুক অব হোলি গ্রেইল অনুসারে পাশ্চাত্যের আদর্শও এককালে প্রাচ্যাদর্শ হইতে অভিন্ন ছিল—ঈশ্বরের মাধ্যমে সর্ব মানবের সহিত সম্প্রীতি স্থাপনই আধ্যাত্মিক অভিযানের লক্ষ্য। মানব জীবনকে এইরূপ আধ্যাত্মিক অভিযানরূপে দেখাই প্রাচ্যের শিক্ষা, ভারতের সাধনা। সর্ব কল্যাণের উৎস এবং সমস্ত সৌন্দর্য্যের আকর পরম পুরুষকে প্রাচীন গ্রীসও দর্শন করিয়াছিল। এল. ক্র্যানমার বিয়িং তাঁহার The Vision of Asia (এশিয়ার সাধনা) নামক পুস্তকে বলেন, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলেকজান্দ্রিয়ার নব্য প্লেটোবাদ ও রহস্যবাদের গোধূলিলগ্নে

মিলিত হইয়া ভাবের আদান-প্রদান করিয়াছে। অবশ্য, সাম্প্রদায়িক শকুনি রোমীয় শান্তির সুপক্ক শস্যক্ষেত্রে পতিত এবং ইসলামের শাণিত কৃপাণ দ্বারা প্রাচ্য গগন রক্তাক্ত হইবার পূর্বে উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যের অধ্যাত্ম সাধনা সম্পূর্ণরূপে ধনদেবতার ঐহিক দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। যদি পাশ্চাত্য ইহার আদি দৃষ্টি অবজ্ঞা করে এবং প্রাচ্যের সাধনা নষ্ট করিয়া ফেলে ইহা মাস্টোডনের মত অদৃশ্য হইবে এবং উহার সভ্যতার অস্থিপিঞ্জর হাডসন, টেম্স ও রাইন নদীর তীরে বিক্ষিপ্ত হইবে। রোম, মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, গ্রীস এবং উহার সমসাময়িক সমৃদ্ধ দেশসমূহ আজ কোথায় ? নিশ্চয়ই তাহারা ধ্বংস ও লয়ের নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে। সমৃদ্ধ সহরগুলি জঙ্গলে পরিণত ; বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য মরুভূমে আচ্ছন্ন হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে শত শত সহর ও সাম্রাজ্যের কবরস্থান দেখা যায়। কিন্তু প্রাচ্যের, বিশেষতঃ ভারতের অতীত অদ্যাপি জীবিত। ইহা ব্যাবিলনের সহিত বিধ্বস্ত বা চ্যালডিয়ার সহিত বিচূর্ণিত বা মিশরের সহিত কবরস্থ হয় নাই। এল. অ্যাডামস্ বেক তাঁহার The Story of Oriental Philosophy (প্রাচ্য দর্শনের গল্প) নামক পুস্তকে বলেন, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনা পরস্পর বিরুদ্ধ নহে ; উহারা পরিপূরক এবং বিনিময় যোগ্য। ইহা পূর্ণরূপে উপলব্ধ এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইলে জগতের অশেষ কল্যাণ হইবে। সমষ্টিগত আদর্শই জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করে। সাহিত্যে জাতীয় মনীষা ও প্রতিভা রূপায়িত হয়। যে সকল জাতি বিনিময়-ভূমিতে মিলিতে ও পরস্পরকে বুঝিতে চায় না তাহাদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। পারস্পরিক আদর্শের অববোধ বর্তমান যুগের আত্যন্তিক প্রয়োজন।"

আধুনিক বিশ্ব-যন্ত্র বিকল হইয়া পড়িয়াছে। মস্কোর আত্মদৃপ্ত স্বৈরশাসক প্রাচ্যের, বিশেষতঃ ভারতের আলোক ব্যতীত জগতের শান্তিরক্ষায় অসমর্থ। আসন্ন মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অতীতের দর্পণ সাহায্যে পাশ্চাত্যকে সাম্রাজ্যসমূহের উত্থান ও পতনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অগ্রগতি অব্যাহত রাখিতে হইলে অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং

উহার শিক্ষা গ্রহণ না করিলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে না। পাশ্চাত্য বহির্জীবনে সমুন্নত। প্রাচ্য, তথা ভারত এই বিষয়ে পাশ্চাত্যের নিকট শিক্ষালাভ করিবে। প্রাচ্যের নিকট অন্তর্জীবনের নিগূঢ় রহস্য শিক্ষা না করিলে পাশ্চাত্যের বহির্জীবন সমঞ্জস হইবে না। যখন অন্তর্জীবন সমূলে বিনষ্ট হয় তখন বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা বিশ্বশান্তি অর্থহীন ও শূন্যগর্ভ ও মৃত্যুসূচক আর্তনাদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ভারত ও চীন প্রভৃতি প্রাচীন প্রাচ্য দেশসমূহের শিক্ষা সম্যক্ সমন্বয় ও আন্তরিক সহানুভূতি। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, লাউৎজে, কনফুসিয়াস, মহম্মদ, মহাবীর, শংকর, কৃষ্ণ, রাম, চৈতন্য, জোরোয়াস্টার, নানক প্রভৃতি ধর্মগুরুগণের জীবনে প্রাচ্যের সাধনা রূপায়িত। কিন্তু পাশ্চাত্যের সাধনা স্বাধিকার লাভে এবং বস্তুর বাহ্যরূপ দর্শনে পর্য্যবসিত এবং লেনিন ও স্ট্যালিন, কাইজার ও সিজার, বিসমার্ক ও নেপোলিয়ান প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কগণের জীবনে বিমূর্ত। তাঁহারা যে জড়বাদ ও যন্ত্রবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত।

পাশ্চাত্যের দুঃসাহসিক ও কর্মোন্মত্ত প্রাণশক্তি ভৌগলিক প্রসারণে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, উপনিবেশ স্থাপনে, বানিজ্য বিস্তারে, এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নিঃশেষিত। ইহা অন্তর্মুখী হইবার ও আত্মবিশ্লেষণ করিবার অবসর পায় নাই। পাশ্চাত্যের জড়বাদী মন এবং আধুনিক প্রাচ্যের ইউরেশিয় মন উভয়েই মৃত্যুর কবলে উপস্থিত। নির্জনে ও নীরবে প্রাচীন প্রাচ্যের যে বাণী ধ্বনিত হইতেছে তাহা যদি পাশ্চাত্য শ্রবণ ও গ্রহণ না করে ইহার বিনাশ অবধারিত। পাশ্চাত্য মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়সুখ দ্রুতবেগে বর্ধিত করাই ইহার মূল লক্ষ্য। সেইজন্য পাশ্চাত্য সমাজ হাট-বাজারের মত আদান-প্রদানের ক্ষেত্র। তথায় নিস্বার্থ সেবা ও স্বধর্ম পালনের সুযোগ নাই। আধুনিক সভ্যতা প্রাত্যহিক সুখবাদকে লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। যন্ত্রসভ্যতার ধর্ম ডলার বা পাউণ্ডকে ঈশ্বরের স্থান দান এবং দৈনিক জীবনকে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্ররূপে পরিণত করণ। প্রিয় প্রশ্রয় ও বাহ্য অনুষ্ঠান ও অর্থসঞ্চয়ই যান্ত্রিক সভ্যতার প্রধান নীতি। স্নায়বিক ক্লান্তি,

পৈশিক শ্রম, এবং বৈদ্যুতিক বেগ এবং কর্মশীলতা উহার মূলমন্ত্র। কর্মহীন অবসরে অন্তর্মুখীনতার আস্বাদ উহা এখনো পায় নাই। বিশ্রাম ও অবসরের অভাবে আধুনিক মানব জীবন যন্ত্রবৎ অবিরাম কর্মরত। সংবাদপত্র পাঠ ও সিনেমাদি দর্শনে যে সাময়িক বিরতিলাভ হয় তাহার দ্বারাই পাশ্চাত্য কর্ম-পীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে।

আমেরিকার সমাজ-দার্শনিক জন ডিউই তাঁহার Experience and Nature (অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতি) নামক ইংরাজী পুস্তকে জীবন দর্শনের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়া বলিয়াছেন, "অবসর বা বিশ্রামের আদর্শ ব্যবহারিক জীবনের নৈতিক প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, মনের স্থৈর্য লাভই বিশ্রামের মূল লক্ষ্য। কারণ মন স্থির হইলে মানুষ জীবন-পথে আসল স্বাধীনতা ও অসীম শক্তি লাভে সমর্থ হয়। বাইবেলে আছে, স্বর্গীয় বাণী জবকে বলিতেছেন—স্থির হও, শান্ত হও'। যুগ যুগ ধরিয়া এই সাধনায় ভারত সিদ্ধ হইয়াছে এবং স্বীয় জাতীয় জীবনে মূর্ত করিয়াছে। খ্রীষ্টান মিষ্টিক, হিন্দু যোগী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, মুসলমান সুফী, চৈনিক সাধু, আলেকজান্দ্রিয় নষ্টিক, ইহুদী র‍্যাবি এবং পারসিক মাজি সমস্বরে এই স্থৈর্য্য-বাণী প্রচার করিয়াছেন। মার্কিণ মনোবৈজ্ঞানিক উইলিয়াম জেম্‌স তাঁহার Talks to Teachers (শিক্ষকগণের সহিত কথাপ্রসঙ্গে) নামক ইংরাজী গ্রন্থে উহাকে মনের শৈথিল্যকরণ বলিয়াছেন। কারণ সুস্থির অবস্থায় মানব আত্মা পার্থিব ব্যাপার হইতে উপরত হইয়া প্রকৃত বিশ্রাম লাভ করে। চিত্তস্থৈর্য হইতেই অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়। বিশৃঙ্খল ও বহির্মুখ জীবনে অন্তর্দৃষ্টি দুর্লভ। নিয়মিত চিত্ত-স্থৈর্য অভ্যাসের ফলে অন্তর্দৃষ্টি অঙ্কুরিত হয়। বহির্জীবনের কর্মশীলতা হ্রাস পাইলে অন্তর্নিহিত আত্মশক্তি বিকশিত হয়। বেলজিয়মের অমর মনীষী ও নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত আদর্শবাদী মরিস মেটারলিঙ্ক সত্যই বলেন, "যেমন নির্জনতায় মৌমাছি মধুসঞ্চয় করে, দুধ দই হয় এবং ফলও পাকে তেমনি নীরবে আত্মবিকাশ হয়।" অন্তর্জগতে, ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিলে হৃদয় মধ্যে সুগুপ্ত দেবত্বের সহিত পরিচয় ঘটে। উক্ত পরিচিতিই শান্তি ও শক্তির আদি উৎস

সারা প্রাচ্যে এই নীতিশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে যে, অনন্ত বর্তমানে অবস্থানই শান্তিপ্রদ। ইহাই অবসরের সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার। চৈনিক দার্শনিক চুয়াংজু বলেন, "সাধকের বিশ্রাম সংসারীর বিশ্রামের মত নয়। মনের শান্ত ভাবের ফলে সাধক প্রকৃত বিশ্রাম লাভ করেন।" জলের উপরিভাগ যেমন সমতল চুয়াংজুর মতে সাধকের মনও অন্তর্মুখী হইলে তদ্রূপ স্থির ও শান্ত হইবে। তিনি বলেন, "যেমন জল স্থৈর্য ব্যতীত নিস্তরঙ্গ হয় না তেমনি মন কর্ম-চিন্তা-মুক্ত না হইলে স্থৈর্য লাভ করে না। সাধকের মন শান্ত বলিয়া ইহা বিশ্বের দর্পণতুল্য হইয়া যায়।" প্রসিদ্ধ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্যার জে. এ. টমসন একদা ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, জীবনের যে অংশ মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিল তখন সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যার সমাধান তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিত, যখন তিনি তাঁহার মনকে সর্বসমস্যামুক্ত করিয়া শূন্য ও শান্ত রাখিতেন। গভীরতম অন্তস্তল হইতে মহৎ ভাবরাশি বিকশিত হইবার একমাত্র সর্ত মনকে চিন্তাশূন্য ও অন্তর্মুখী করা। সমগ্র জীবনের সর্ব অংশ, সর্ব শক্তি ও সর্ব রহস্য অবগতির জন্য মৃত্যুতুল্য নিশ্চিন্ত ও নিষ্কর্ম অবস্থা প্রাপ্ত হও। ইহাই ভারতের সাধনা। আধুনিকদের নিকট দেশ-কালময় জগতে নিবাসই জীবনের উৎকৃষ্ট লক্ষণ। কিন্তু প্রাচীনগণ অধ্যাত্ম সাধনার আলোকে অবগত হইয়াছেন যে, দেশকালাতীত ভাব-জগতে প্রবেশ করিলে অনন্ত জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। তথায় আমরা সর্বোচ্চ মানসিক ভাবভূমিতে আরূঢ় এবং অজর অমর সত্ত্বার সহিত সংযুক্ত হই। উক্ত সংযোগকে পাশ্চাত্য মিষ্টিকগণ বর্ণনাতীত প্রশান্তির আকর বলিয়াছেন। এই ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থাকে বৌদ্ধ নির্বাণ ও হিন্দু সমাধি বলে। প্রাচীন পারস্যের শ্রেষ্ঠ সুফী জালালউদ্দিন রুমী[১] এই ভাবে উক্ত অবস্থা বর্ণনা করেন, "প্রাতঃকালে একটা চাঁদ আকাশে উদিত হইল। শ্যেন পাখী[২] যেমন শীকারের সময়ে

১ এফ. হ্যাডল্যাণ্ড ডেভিস কৃত Persian Mystics গ্রন্থে উদ্ধৃত।
২ বাজপাখী

পাখী ছোঁ মারিয়া লইয়া যায় তদ্রূপ উহা আমার দিকে কটাক্ষপাত করিল। সেই চাঁদ আমাকে ছোঁ মারিয়া শূন্যে তুলিয়া লইল এবং অসীম আকাশে ঘুরিতে লাগিল। যখন আমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম তখন দেখিলাম, আমার 'আমিত্ব' মুছিয়া গিয়াছে। কারণ আমার দেহ-মন দৈব কৃপায় সেই চাঁদের মধ্যে আত্মায় বিলীন হইয়াছে। আত্মলোকে আমি যখন ভ্রমণ করিতে লাগিলাম তখন সেই চাঁদ ব্যতীত অন্য কিছুই আমি দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে অনন্ত রহস্য আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইল। স্বর্গের নব ভূমি সেই চাঁদে নিজস্ব সত্তা হারাইল. মদীয় সত্তার পাত্র সম্পূর্ণরূপে ভাবসমুদ্রে নিমজ্জিত হইল। সেই সমুদ্রে উত্তাল ঊর্মিমালা গর্জন করিতে লাগিল এবং পুনরায় প্রজ্ঞার আলোকে আমার অন্তর আলোকিত হইল। সেই আলোক বাক্য ও মনের অগোচর এবং স্থূল দৃষ্টির অতীত।" পারস্যের বহু শতক পূর্বে ভারত এই দিব্য সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছে।

দৃষ্টিভঙ্গীর বিকারই পাশ্চাত্যের মহাব্যাধি। যন্ত্র-দানবের ধূলি-কঙ্করে পাশ্চাত্যের চক্ষুদ্বয়ে প্রদাহ-পর্দা পড়িয়াছে। কাব্য, শিল্প, সাহিত্য বা বিজ্ঞানের অধ্যাপক উক্ত রোগের চিকিৎসক নহেন। অধ্যাত্ম সাধক ধর্মগুরুগণই উল্লিখিত ভবরোগের বৈদ্যরাজ। প্রাচ্যের ধর্মাচার্যগণ উক্ত রোগ আরোগ্য করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। ভারতেও এই সকল আচার্য দলে দলে আবির্ভূত হইয়া সামাজিক জীবনকে ধর্মভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। রাজস্থানের অমর সাধিকা মীরাবাঈ অন্তিম জীবনে বৃন্দাবনের বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আগন্তুক পথচারী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগে ভুগিয়া বৈদ্যের সন্ধান করিতেছি। শ্যামল শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আমার চিত্ত-পীড়া আরোগ্য হইবে না।" বিশ্বসত্তার দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই জীবন-সমস্যার সমাধান সহজ হয়। পাশ্চাত্য জগতের যন্ত্রসভ্যতা মানবের অধ্যাত্ম উন্নতির প্রবল অন্তরায়। জীবন ও সমাজের বিকাশ বা গতি রুদ্ধ হইলে উহা জড়বৎ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সেই জড়তা নৈতিক সাধনা ব্যতীত দূরীভূত হয় না। ব্যক্তিগত নৈতিকতা যতই সুদৃঢ় হয় ততই সামাজিক

উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়। প্রাচ্যের প্রজ্ঞা, ভারতের সাধনা মানুষকে জড়জগৎ হইতে অন্তর্জগতে যাইতে প্রেরণা দেয়। অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হইয়া মানুষ বিস্ময়ে দেখে, তাহার আত্মাই বিশ্বময় এবং বিশ্বই তাহার আত্মা।

ইডেন উদ্যানে সুপক্ব সুমিষ্ট আপেলই প্রাচ্য, বিশেষতঃ ভারত, জগৎকে দান করিয়াছে। উক্ত ফল খাইলে পাশ্চাত্যবাসীরা অন্তর্জগতের কথা স্মরণ করিবে এবং বহির্জগতের ব্যাপৃতি কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইবে। উদ্দেশ্যবিহীন কর্মচাঞ্চল্যে মানবের অন্তরাত্মা প্রপীড়িত। কর্মব্যস্ততা হইতে অবসর লইয়া আধুনিক মানুষ চিন্তা করুক, "আমি কি করিতেছি?" যাহারা উল্লিখিত আপেলটি খাইবে তাহাদেরই জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইবে এবং তাহাদের আত্মবিস্মৃতির নেশা অচিরে কাটিবে। আধুনিক আলোচনা ও আদান-প্রদানের ফলে প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চাত্যের মনোভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। এসম্বে উইংফিল্ড ষ্ট্রাটফোর্ড তাঁহার History of British Civilization নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে বলেন, "জড়শক্তির সম্রাটগণের কাল্পনিক সুখ-স্বর্গরূপ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সাম্যবাদের ভিত্তিতে জাতিপুঞ্জের সম্মিলন দিবাস্বপ্নবৎ নিষ্ফল। যন্ত্র-যুগের অধিনায়ক ধর্মবিরোধী অতিমানবগণ যদি ভারত, তথা প্রাচ্যের অভিজ্ঞতা গ্রহণ না করে তাহা হইলে আধুনিক সঙ্কট অতিক্রান্ত হইবে না। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বন্ধন অপেক্ষা অধ্যাত্ম বন্ধনই দৃঢ়তর। জাতিপুঞ্জের সঙ্কট মোচন, পৃথিবীর উদ্ধার প্রাচ্যের সাধনা ব্যতীত অসম্ভব। কারণ প্রাচ্যের সাধনায় অসীম সম্ভাবনা নিহিত। আবহমান কাল হইতে প্রাচ্য আত্মা বা ভারতাত্মা ধর্মজীবনে ক্রিয়াশীল ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। ডাঃ কেনেথ সণ্ডারস্ তাঁহার The Heritage of Asia নামক পুস্তকে সত্যই বলেন যে, প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার মূল উৎসই ভারতাত্মা। তিনি মন্তব্য করেন, "ইহাই মানব জাতির প্রতি ভারতের অমূল্য অবদান যে, অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর মূল্যে বিশ্বাসই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মূল্যে বিশ্বাস অপেক্ষা প্রবলতর। ভারতের দর্শন এক স্বরে অবিচলিত অনুরাগে ঘোষণা করে যে, বহুর পশ্চাতে একই

বিদ্যমান, বহু একের ছায়ামাত্র।" প্রাচ্য প্রতিভা প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক ও ধর্মমূলক। আদর্শবাদের আলোকে যাবজ্জীবন যাপনান্তে প্রাচ্য আদর্শসমূহের চরম লক্ষ্য প্লেটোর ভাষায় এইরূপ হয়ঃ সর্বদা নৈষ্কম্য, হার্দিক স্থৈর্য, নির্জন-প্রিয়তা ও সংসার-বৈরাগ্যে সে সর্বদা অভিভূত থাকে। তিনি যেমন জগৎকে ভুলিয়া যান তেমনি জগৎও তাঁহাকে ভুলিয়া যায়। মঙ্গলময়ের একক অনুধ্যানে তিনি সর্বসুখ লাভ করেন। লণ্ডনের অধ্যাপক ই. জে. আরডইক 'প্লেটোর বাণী' নামক তাঁহার ইংরাজী পুস্তকে গ্রীক ঋষি প্লেটোর এই বাণীটি উদ্ধার করিয়াছেন।—"উল্লিখিত অবস্থা লাভের জন্য যত্নবান হও। সেই গুণগুলি সাধন কর। জীবন-নদীতে উক্ত আদর্শে তোমার আত্ম-নৌকার নঙ্গর ফেল। তাহা হইলে জরা ও মৃত্যু তোমার নিকট আর ভীতিপ্রদ হইবে না।"

প্রাচ্যের সাধনা এই যে, পৃথিবীতে স্বর্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া সকল মানুষকে শান্তিসুধা বিতরণ এবং এমন একটি কেন্দ্রীয় মন্দির স্থাপন, যাহার বহির্দ্বারে ক্ষোদিত থাকিবে—'সত্যাপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম আর নাই। উক্ত কেন্দ্রিয় মন্দিরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রীতির সাধনায় মিলিত হইবে। আধুনিক ভোগবাদ বা জড়বাদের আপাতমধুর আহ্বান প্রাচ্য, তথা ভারত নিশ্চয়ই কর্ণপাত করিবে না। বর্তমান ভারত ও প্রাচ্যের দৃষ্টি পাশ্চাত্য প্রগতির চাকচিক্যে মোহিত হইলেও অতীতের সাধনা তাহাকে জাগতিক উন্নতি হইতে পারমার্থিক উন্নতির পথে আকৃষ্ট করিবে। বুদ্ধদেব সত্যই বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সহস্র সৈন্যকে যুদ্ধে জয় করে তদপেক্ষা যে নিভৃতে আত্মজয় করে সে-ই বড় জয়ী। এই বুদ্ধ-বাণী ভারত, তথা প্রাচ্য সহজে বিস্মৃত হইবে না।

ভারতের অতীত উজ্জ্বল, ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর। ভারতই প্রাচ্য প্রজ্ঞার জন্মভূমি। প্রাচ্য আত্মার প্রাণ-পাখী ভারত হইতে সমাগত। সম্ভবতঃ প্রাচ্যের ভবিষ্যৎ ভারতীয় সাধনার প্রেরণায় গড়িয়া উঠিবে; পাশ্চাত্য মোহে সে আর অচেতন থাকিবে না। বৈদিক ঋষিগণ, উপনিষদের

ব্রহ্মর্ষিগণ, ইসলাম-প্রবর্তক মহম্মদ ও গ্যালিলির ক্রাইস্ট যে বিশ্বাসে বলীয়ান ছিলেন তাহা লাভ করিতে হইলে নির্জনে আত্ম-সংযম বা যোগাভ্যাস করিতে হয়। যাহারা ভবিষ্যৎ ভারত বা প্রাচ্যের ভাগ্য-বিধাতা হইতে চাহেন তাঁহাদিগকে সৃজনী শক্তি সাধনায় নির্জনে আত্মনীয়োগ করিতে হইবে। বিশাল বিশ্বের কর্ম-কোলাহল হইতে সরিয়া পড়িয়া মানুষ যখনই একক হয় ও আত্মবিশ্লেষণ করে তখনই তাহার প্রকৃত জীবন সাধনা আরম্ভ হয়। মৌন মন্দিরে প্রত্যেক মুহূর্তে জীবন-কলিকা ফুটিয়া উঠে ও সৌরভময় হয়। তখন পার্থিব দুশ্চিন্তা, দুঃখ-দৈন্য ও হাসি-কান্নার ওপারে শান্তি-সৌধ, আনন্দ-ধাম দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রাচীন ভারতে, তথা অতীত প্রাচ্যে রাজনীতি, শিক্ষা ও সর্ববিদ্যা ধর্ম-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রকৃত ধর্মের সাধনা অনুষ্ঠান বা উপাসনায় পর্য্যবসিত নহে। হৃদিস্থিত হৃষিকেশের ইঙ্গিতে দৈনিক জীবন নিয়ন্ত্রণই ধর্মসাধনার প্রথম সোপান। সেই সাধনায় দীক্ষিত হইলে ব্যক্তিগত কেন্দ্র হইতে বিশ্বপরিধি পর্য্যন্ত একই সুর ঝঙ্কৃত হয়। জাপানের মনীষী কে. ওকাকুরা তাঁহার Ideals of the East (প্রাচ্যের আদর্শ) নামক পুস্তকে বলেন, "ধর্মসাধনায় নিযুক্ত হইলে দেখা যায়, প্রত্যেক হৃদয়ে শান্তি-সঙ্গীত উদ্গীত হইতেছে। তখন শোনা যায়, সেই সঙ্গীত, যাহা সম্রাট ও শ্রমিককে একাসন প্রদান করে। তখন অনুভূত হয় সেই ঐক্য, যাহা হইতে সকল সমবেদনা, সকল শিষ্টাচার উদ্গত হয়।" ইহাই এশিয়ার রহস্য, ইহাই ভারতের সাধনা। এশিয়ার শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি ইহার পরম প্রেরণায় প্রাণবান্। এই ঐতিহ্য হইতে বঞ্চিত হইলে ভারত, তথা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সংঘর্ষানলে ভস্মীভূত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেন, "ভারতের সাধনা পার্থিব ঐশ্বর্য্যের পিয়াসী নহে। জগৎজয়ে তাহার আনন্দ নাই; আত্মজয়েই তাহার তৃপ্তি। অরূপ অনামী পুরুষের সন্ধানে ভারত যুগ যুগ ধরিয়া সাধনরত।" জে. এস. হয়ল্যাণ্ড তাঁহার Faith and History (বিশ্বাস ও ইতিহাস) নামক

পুস্তকে বলেন, "বিশ্বের ইতিহাসকে মানব জাতির জীবনের ইতিহাসরূপে পড়িতে হইবে এবং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের বিশেষ অবদানের ইতিবৃত্তরূপে জাতীয় ইতিহাস পড়া উচিত।" পাশ্চাত্য এবং আধুনিক প্রাচ্য অবিলম্বে প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন প্রাচ্যের ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ এবং জীবনে পরিণত করুক। নচেৎ উহাদের কল্যাণ সুদূরপরাহত। বর্তমান জগতে অসংযম, অনৈতিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার শক্তি উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যে জাগ্রত দেশসমূহ যে বিপুল তারুণ্য বিকশিত তাহা আত্মস্থ হইতে চাহিতেছে। নীতিশিক্ষা, দায়িত্ববোধ, ধৈর্য্যশীলতা ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত তারুণ্য সৎশক্তিতে পরিণত হইবে না। কেবল রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক স্বাধীনতায় ব্যক্তি বা জাতি বাঁচিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা আর্থিক স্বাতন্ত্র্য বাহ্য জীবনের প্রয়োজন দূর করে; কিন্তু অন্তর্জীবনের অভাব মিটাইতে পারে না। যদি ভারত বা চীন অতীতের সাধনায় দীক্ষিত হয় তাহা হইলে উহা বর্তমান জগতে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইবে। সর্বদেশের বিশ্ব-প্রেমিকগণ যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহা এই ভাবে সফল হইতে পারে।

যেমন জীশু খ্রীষ্টের জন্মকালে প্রাচ্য জ্ঞানিগণ প্রতীচ্যে আকাশস্থ ধ্রুবতারার ইঙ্গিতে যাত্রা করিয়াছিলেন তেমনি আর একবার ভারতের জ্ঞানিগণ পাশ্চাত্য বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ নব যুগের পথপ্রদর্শক। তাঁহারা অমর ভারতের অমৃতবাণী বর্তমান জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য হইতেই এই দেশে নবযুগ প্রবর্তিত এবং ভারতে জয়যাত্রা আরব্ধ। আধুনিক ভারতীয়গণ যতই অতীত ভারতের সাধনায় দীক্ষিত হইবেন ততই বর্তমান ভারতের যুগোপযোগী রূপায়ণ ঘটিবে। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত 'ভারতের সাধনা' পুস্তকে আলোচ্য বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত।

দশ

# ভারতের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য *

হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র মনু সংহিতায় (১১।২০) আছে—

এতদ্দেশ-প্রসূতস্য সকাশাৎ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরনং পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥

অর্থাৎ এই ভারতবাসী অগ্রজন্মাদের নিকট হইতে পৃথিবীর সর্বমানব ধর্ম ও নীতি শিক্ষা করিয়া ধন্য হইবে।

আর্য্য ঋষিদের এই ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপে যুগে যুগে সফল হইয়াছে, কিরূপে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি পুরা কাল হইতে অদ্যাবধি পৃথিবীর সভ্যতাকে পরিপুষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছে বর্তমান অধ্যায়ে তাহাই সংক্ষেপে আলোচ্য।

দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিবার পর ভারত স্বাধীন হইয়াছে। পূর্বে ভারত কি সুবিশাল সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা বিশদ ভাবে জানিবার সময় সমাগত। 'ভবিষ্যৎ অতীতের গর্ভেই জন্মগ্রহণ করে।' অতীতের অবগতি ব্যতীত ভবিষ্যতের স্বরূপ মানস পটে অঙ্কিত করা যায় না। এক ভারত ব্যতীত প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতির গৌরব পুরাবৃত্তে পরিণত হইয়াছে, পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারত অদ্যাপি জীবিত। ইহার কারণ অনেকের নিকট অবিদিত। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতেতিহাসের অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিয়া উক্ত কারণ সম্যক্

---

* ইহার সারাংশ 'উদ্বোধন' ১৩৬৮ আশ্বিন ও পরবর্তী কয়েকটী সংখ্যায় 'ভারতের নিকট জগতের ঋণ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত। এই অধ্যায়ে শ্রীশিশির কুমার মিত্র প্রণীত India's Cultural Empire নামক পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য লইয়াছি।

অবগত হইয়াছিলেন। তৎশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা ও শিষ্যপ্রতিম স্বামী প্রজ্ঞানন্দের গ্রন্থাবলীতে ভারত-রহস্যের গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ভারত-রহস্য সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রণীত Oxford History of India এবং র‍্যাপসন সম্পাদিত Cambridge History of India প্রভৃতি পুস্তক পড়িলে উহা অবগত হওয়া যায়।

মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে সত্যই বলিয়াছেন যে, বাংলা আজ যাহা চিন্তা করে সমগ্র ভারত কাল তাহাই চিন্তা করে। এই উক্তির গভীর ভাবার্থ আছে। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাই সমগ্র ভারতকে এই যুগে নব পথ দেখাইয়াছে। বৃহত্তর বাংলার অস্তিত্ব শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস প্রথমে পুস্তক লিখিয়া প্রচার করেন। বৃহত্তর বঙ্গের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন অমর হইয়াছেন। বৃহত্তর ভারতের আবিষ্কারকও বাঙ্গালী ঐতিহাসিক। অধ্যাপক অবিনাশ দাস তাঁহার Rigvedic India এবং Rigvedic Culture নামক গ্রন্থদ্বয়ে ভারতের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের যে ইতিবৃত্ত দিয়াছেন তাহা সকলের পাঠ করা উচিত। অধ্যাপক শ্রীরাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায়ের History of Indian Shipping, ডাঃ আনন্দ কুমার স্বামীর History of Indian and Indonesion Art, অধ্যাপক বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়ের Indian Cultural Influences in Combodia, স্বামী অভেদানন্দের India and Her People, ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের Outline of Ancient Indian History and Civilization এবং Suvarna Dwipa প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, রলিনসনের Intercourse Between India and the Western World এবং অধ্যাপক ফণীন্দ্র নাথ বসুর Indian Influence in Siam প্রভৃতি গ্রন্থে ভারতের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চনদের দেশকে এখন যেমন পাঞ্জাব বলে তেমনি চতুর্বেদের জন্মভূমিকে পূর্বে সপ্তসিন্ধু বলিত। সিন্ধু ও উহার পঞ্চশাখা—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা এবং সরস্বতী ও দৃশদ্বতী—এই সপ্তসিন্ধু বেদভূমিতে

প্রবাহিত বলিয়া উহার নাম সপ্তসিন্ধু। বেদের জন্মভূমি অর্থে আদি মানব সভ্যতার জন্মভূমি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ উত্তর মেরু, মধ্য এশিয়া, জার্মানী, এশিয়া মাইনর বা স্কাণ্ডিনেভিয়াকে মানব সভ্যতার আদি ভূমি বলিয়া নির্দেশ করিলেও তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। তাহারা বেদের বয়স তিন হাজারের অধিক বৎসর মনে করেন না। অধ্যাপক দাস তাঁহাদের সকল উক্তি অকাট্য যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া সপ্তসিন্ধুকে বিশ্ব সভ্যতার আদিভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার মতে বেদের বয়স পঁচিশ হাজার বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে। বালগঙ্গাধর তিলকও তাঁহার 'অরিয়ন' নামক ইংরাজী গ্রন্থে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। হারাপ্পা, মঃহঞ্জোদারো, মায়া প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা অধ্যাপক অবিনাশের সিদ্ধান্তই সম্যক্ সমর্থিত হয়। অধ্যাপক দাস তৎপ্রণীত গ্রন্থদ্বয়ে বৈদিক ভারতের একটি উজ্জ্বল আলেখ্য দিয়াছেন। রাজপুতানার থর মরুভূমির নিকট বলিয়া পাঞ্জাব এখন অতিশয় উত্তপ্ত। কিন্তু বৈদিক যুগে পৃথিবীর জল ও স্থল বিভাগ এবং সপ্তসিন্ধুর আবহাওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। কানিংহামের Ancient Geography of India গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক বিবরণ প্রদত্ত। পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম। ভূতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এই যে, যেখানে পূর্বে সাগর ছিল এখন সেখানে মরুভূমি হইয়াছে। নচেৎ মরুভূমির এত বালুকা কোথা হইতে আসিল? আর সমুদ্রই বালুকার অক্ষয় ভাণ্ডার। এখন রাজস্থানের যেস্থানে থর মরু অবস্থিত সেখানে বৈদিক যুগে বিশাল সাগর ছিল। উহা দক্ষিণে আরাবল্লী ও বিন্ধ্যাচল রাখিয়া পূর্বে বঙ্গোপসাগরে মিলিত ছিল। উক্ত সাগরের পূর্বাংশকে পূর্ব সাগর বলিত। ভূতত্ত্ববিৎ মিঃ আর. ডি. ওল্‌ডহ্যাম বলেন যে, হিমালয়ের উৎপত্তিতেই এই দুই সাগরের জন্ম হয় এবং পরে ভূমিকম্পজনিত পার্থিব আলোড়নে উভয়ে শুকাইয়া যায়। ইউরোপের ভূমধ্য সাগরের ন্যায় এশিয়াতেও দুইটি ভূমধ্য সাগর ছিল। তন্মধ্যে একটি বাল্‌খের নীচে—উত্তরে সাইবেরিয়ার শেষ পর্য্যন্ত ও পশ্চিমে কৃষ্ণসাগরের

মধ্যে দ্বিতীয় ভূমধ্য সাগরটি তুর্কীস্থানের পূর্বে অবস্থিত ছিল। আগ্নেয় গিরির উদ্‌গীরণের ফলে বসফোরাস যোজক খুলিয়া যাওয়ায় উহার জল ইউরোপীয় ভূমধ্য সাগরে গড়াইয়া যায়। প্রথমটির চিহ্ন কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, আরল হ্রদ ও বল্‌খাস হ্রদ এবং দ্বিতীয়টির চিহ্ন লবণ হ্রদ ও মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমি।

আর্যাবর্ত বা বৃহত্তর সপ্তসিন্ধু বলিতে তখন কান্দাহার, কাবুল, বাল্‌খ, পূর্ব তুর্কীস্থান, সমগ্র হিমালয় প্রদেশ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, তিব্বত ও গঙ্গা-যমুনার উপত্যকা বুঝাইত। উক্ত দেশে তখন চতুর্দিকে রাজপুতানা সাগর, পূর্ব-সাগর ও দুইটি ভূমধ্য সাগর—এই চারিটি সাগরে বেষ্টিত ছিল। আর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত স্থলপথ দ্বারা পারস্য ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্য দিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত ছিল। এই স্থল-পথেই আর্য সভ্যতার অদৃশ্য স্রোত পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা বলেন, হিমালয় ভারতের বাধাস্বরূপ না হইয়া সভ্যতা-স্রোতের রাজপথ ছিল। ভারতবর্ষকে হিন্দুশাস্ত্রে জম্বুদ্বীপ বলে। প্রাচীন ভারত যে এইরূপ আকারে ছিল তাহার বর্ণনা বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসেও আমরা পাই। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীন-তুর্কিস্থান কণিষ্ক কর্তৃক ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাজা সাইপ্রাসের সময় সমস্ত পশ্চিম এশিয়া গান্ধার রাজ্যের মধ্যবর্তী ছিল। বৈদিক আর্যগণ চার্লস ডারউইনের মত বিশ্বাস করিতেন না যে, বানর হইতে মানুষের ক্রম-বিকাশ হইয়াছে; পরন্তু প্রাণীতত্ত্ববিৎ আগাসিজ সাহেবের মত তাঁহারা মানুষের স্বতন্ত্র উৎপত্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

ভারতীয় আর্য্যগণ বেদকে সৃষ্টির মত অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কোন কোন ভূতত্ত্ববিৎ বলেন, ভারতের মধ্যে সপ্তসিন্ধুই জীবোৎপত্তির আদি ও শ্রেষ্ঠ স্থান। ডবলিউ. এফ. ব্লানফোর্ড এবং এডওয়ার্ড ক্লড সাহেবের মতে মায়োসিন যুগে ভারতে ও ইউরোপে মানব প্রথম আবির্ভূত হয় এবং সুপ্রাচীন সপ্তসিন্ধুই আর্যদের আদি নিবাসস্থল ছিল। সপ্তসিন্ধুকে বেদে

দেবনির্মিত দেশ বা ব্রহ্মাবর্ত বলে। প্রবাদ আছে যে, প্রলয় প্লাবনকালে মনু একটি জাহাজে করিয়া উত্তর গিরিতে যাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। এই প্লাবনকে মিশরের টেম বন্যা ও ব্যাবিলনের গিলগামেশ মহাকাব্যে প্রবল বারিপাত ও বাইবেলে নোয়া বন্যা বলে। মুইর সাহেব সত্যই বলেন, "ইন্দো-আর্যগণ অন্য দেশে জাত নহে এবং সপ্তসিন্ধুই তাঁহাদের জন্মস্থান।" বিন্ধ্যাচল-সহিত দাক্ষিণাত্য আর্যাবর্ত হইতে রাজপুতানা সাগর ও পূর্বসাগর দ্বারা দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। আলফ্রেড রাসেল ও ডবলিউ. এফ. ব্লান্‌ফোর্ড এই দুই জন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন, তখন দাক্ষিণাত্য অধুনালুপ্ত ইন্দো-ওসিয়েনিক মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লিখিত মহাদেশের সীমা ব্রহ্মদেশ হইতে আফ্রিকা এবং বিন্ধ্যাচল হইতে অষ্ট্রেলিয়া অবধি বিস্তৃত ছিল। সিংহল ও আন্দামান প্রভৃতি দ্বীপ ঐ মহাদেশের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। উক্ত দেশবাসী দ্রাবিড়, চোল ও পাণ্ড্যগণ অত্যন্ত অসভ্য ছিল। রামায়ণের যুগেও দেখা যায়, দক্ষিণ দেশের অধিবাসীরা অসভ্য ছিল। অষ্ট্রেলিয়া ও উক্ত দেশের ভাষার মধ্যে অসাধারণ সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। উভয় দেশের ভাষায় আমি, তুমি, সে, আমরা, তোমরা প্রভৃতি কথাগুলি অভিন্ন। পিটার এবং স্মিড্‌ট সাহেব মধ্য ভারতের মুণ্ডা ভাষা, নিকোবর দ্বীপের ভাষা, আসামের খাসিয়া ভাষা, ব্রহ্মদেশের রিয়াং ভাষা, মালয়ের সোমাঙ্গ ভাষা ও মনখেমার ভাষার মধ্যে নিকট সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।

মানব পূর্ববৎ এখনো আংশিক ভাবে যাযাবর ও ভ্রাম্যমান প্রাণী। প্রথমতঃ মানুষ নিরামিষাশী ছিল ও পরে আমিষাশী হয়। বৈদিক আর্যদের মধ্যে যাহারা দস্যু ও দাস (তাহাদের রাক্ষস বা অসুরও বলিত) ছিল তাহারা পশুশীকার ও গোপালন করিত। তাহারা হিমালয়ের অরণ্য হইতে কাঠ আনিয়া জাহাজ নির্মাণ ও বাণিজ্য বিস্তার করিত। অদ্যাপি উত্তরাখণ্ডে জঙ্গল হইতে গঙ্গাস্রোতে কাঠ ভাসাইয়া আনা হয়। বৈদিক ব্যবসায়ীগণকে পণিক বা বণিক বলিত। তাহারা দাক্ষিণাত্যে চোল ও পাণ্ড্যদের সহিত বাণিজ্য স্থাপন করে। পরে ইহারা মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, দক্ষিণ ইউরোপ, আফ্রিকা,

এমন কি ব্রিটেন অবধি বাণিজ্য ব্যপদেশে যাইয়া, বসবাস করিয়াছিল। এইরূপে আর্য সভ্যতা ধীরে ধীরে পশ্চিমে বিস্তৃত হয়। এই পণিকগণই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ফিনিসিয়ানদের পূর্বপুরুষ। প্রত্নতত্ত্বের আলোকে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতেও ইউরোপের সহিত ভারতে জলপথে বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। সেই পুরাকালেও সিন্ধুনদী এবং পারস্য সাগরের মধ্যে নিয়মিত ভাবে জাহাজ যাতায়াত করিত। শুধু যে এই সকল জাহাজ ভারত হইতে হাতীর দাঁত, ময়ূর ও বানর লইয়া যাইত রাজা সলোমানের মন্দির ও প্রাসাদ শোভনার্থ তাহা নহে; উহারা ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী শিক্ষাকেন্দ্র ও রাজদরবারে সাংস্কৃতিক দূতবৃন্দ বহন করিত।

উল্লিখিত পণিকগণ ধর্মমতের অনৈক্য-হেতু ঋগ্বেদের যুগে সপ্ত-সিন্ধু ত্যাগ করিয়া পারস্যে প্রবেশ করে। ইহাদিগকেই ইরাণী বলা হয়। তাহারা বৈদিক ধর্ম পালন করিত না বলিয়া আর্যগণ দীর্ঘ কাল রক্তপাতী যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আর্যাবর্ত হইতে তাড়াইয়া দেন। ইহাকেই বেদের দেবাসুর সংগ্রাম বলে। যাহারা এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আর্যাবর্তেই বাস করিল তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইল। তাহারা পশুশীকার ও গোপালন গ্রহণ করিল। নূতন শীকার ক্ষেত্র ও গোচারণ ভূমির অন্বেষণে তাহারা পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইল। এই অসভ্য আর্যদের সহিত মধ্য এশিয়ার অসভ্য মোঙ্গলদের সাক্ষাৎ হয়। ইহারাই বেলুচিস্থান, মিডিয়া ও পারস্যের আদিম অধিবাসী। উহাদিগকে তত্তৎ দেশে এখনো দাহাল বা দস্যু বলে। অতিচঞ্চল ও ভ্রমণশীল প্রকৃতির জন্য বেদে ইহাদিগকে সর্প বা গরুড় বলিত। প্লিনী সাহেব বলেন, "ইহারাই সারাওয়ানে সার্পিয়ার নামে ও আফগানিস্থানে অকুসাস নদীর তীরে সারাপারা নামে বাস করে। বেলুচিস্থানের গ্রেসিয়া ও গেড্রোসিয়া জাতি এই গরুড় জাতির বংশধর।"

জাহাজ নির্মাণের জন্য সেগুণ কাঠ পাওয়া যাইত বলিয়া উহারা সমুদ্র-তীরে জঙ্গলের ধারে উপনিবেশ স্থাপন করিত। ফিনিসিয়া বা পণিশদের দেশ

উহারাই স্থাপন করে। এই ফিনিসিয়া হইতে সমগ্র গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে সভ্যতা বিস্তৃত হয়। ফিনিশিয়াই পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতার আদিভূমি। দাক্ষিণাত্যের চোলগণ তাইগ্রীস নদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করায় উহাকে চালডিয়া বা কালডিয়া বলে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আসিরিয়া, বাবিলন, কালডিয়া প্রভৃতি দেশ সর্বাপেক্ষা সুসভ্য ও প্রাচীন। ভারতীয় আর্য্যগণের এক শাখাই পারস্যবাসীদের পূর্বপুরুষ। তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্র আবেস্তা বেদের ছয় শত বৎসর পরবর্তী। বেদ ও আবেস্তার মধ্যে ভাষা ও ভাবের নিকট সাদৃশ্য দেখিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এক ভাষা হইতে উভয় শাস্ত্রের উদ্ভব। ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ত্বষ্টা অরুরমাঘ বা মিত্রদেবতা আছে। তাঁহারাই আবেস্তায় উল্লিখিত। মিত্রাদি দেবতা আর্যদের ও ইরাণীদের উপাস্য। ইরান শব্দটীও সম্ভবতঃ আর্য্য শব্দের অপভ্রংশ। কেহ কেহ বলেন, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আইয়ার শব্দও আর্য্য শব্দ হইতে উৎপন্ন।

ইরাণীরা 'স' বর্ণটী 'হ'এর মত উচ্চারণ করিত। সেইজন্য সিন্ধুতীরবাসী লোকদিগকে তাহারা 'হিন্দু' বলিত। 'হিন্দু' শব্দ এইরূপে প্রচলিত এবং আবস্তাতে বহু বার উল্লিখিত। পারস্যের বাব দেবতাও বৌদ্ধ অবতারবাদ হইতে উদ্ভূত। বৈদিক আর্য্যদিগকে মিডিয়া দেশে ম্যাজি (পুরোহিত) বলিত। অনেক ইরাণী আর্য্য বাল্‌খে উপনিবেশ স্থাপন করেন। উক্ত উপনিবেশকে তাঁহারা 'আইরাণ বৈরো' ( আর্য স্বর্গ ) বলিতেন। মোক্ষমূলার বলেন, "জোরোয়াস্তার-বাদিগণ ভারতীয় আর্য্যদের এক শাখা মাত্র। উভয়ের ধর্মে ও পুরাণে অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান।" ইরাণীদের সপ্তম স্বর্গ ঠিক আমাদের স্বর্গতুল্য। সংস্কৃত শব্দ সরয়ু, সাধু, সরস্বতী, আর্য্য, সপ্ত সিন্ধু ও সোমকে জেন্দ ভাষায় সরয়ু, হাচু, হরহৈতী, আইর ( হিন্দুস্থানীরা এখনও আর্য্যকে আরিয় বলে ), হেপ্তহিন্দু ও হাওমা বলে। গেল্‌ডনার সাহেব বলেন, বৈদিক সংস্কৃত ও আবেস্তিক জেন্দ ভাষাকে এক মূল ভাষার দুইটী কথ্য ভাষা বলা চলে। শব্দশাস্ত্রের সামান্য নিয়ম দ্বারা জেন্দকে সংস্কৃতে পরিণত করা যায়। এডোয়ার্ড

মারার সাহেবের মতে যজ্ঞ, হোম, সোম, ঋত, মন্ত্র প্রভৃতি শব্দ উভয় ধর্মে সমান। সেতু, স্তম্ভ, যুদ্ধ, অস্ত্র, বর্শা, ধনুঃ, জ্যা, পুরোহিত, স্তব, লতাগুল্ম, দানব প্রভৃতি শব্দ উভয় ভাষায় সাধারণ। আমাদের মনুর প্লাবন তাহাদের হিম-প্রলয় নামে প্রচলিত। ইরাণীরা পরবর্তী কালে উত্তর রাশিয়াতে যাইয়াও উপনিবেশ স্থাপন করে। ডাঃ লাথাম বলেন, "রাশিয়ার পূর্বে অবস্থিত বাল্‌টিক সাগরের তীরবর্তী ও সুইডেনের নিকটস্থ লিথুয়ানিয়া দেশের ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।"

গ্রাসমান, বেনফে, সন্নে ও কেম্নু সাহেব বলেন, গ্রীক ও ইরাণী ভাষার মধ্যে ধাতুগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। স্মিড্‌ট্, আসকলি, লেসকিয়ান ও মিকলোসিক সাহেবের মতে ইরাণী ও শ্লাভ ভাষার মধ্যে মৌলিক সংযোগ আছে। শ্লাভ ইউরোপের প্রাচীন জাতি এবং জার্মানীর পূর্বপুরুষ। স্মিড্‌ট্ তাঁহার The Origin of the Aryans নামক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থে বলেন, "ভূগোলের দিক দিয়া আর্য ভাষাসমূহের মধ্যে যত স্থান-দূরত্ব আছে তাহাদের সাধারণ পার্থক্য তত কম। শ্লাভ, লিথুয়ানিয়া ও টিউটনের মধ্যে উনষাটটি সাধারণ শব্দ ও ধাতু আছে। শ্লাভ, লিথুয়ানিয়া ও ইরাণীদের মধ্যে একষট্টিটি; ইরাণী ও টিউটনের মধ্যে একত্রিশটি; লাটিন ও গ্রীকের মধ্যে একশত বত্রিশটি; গ্রীক ও ইরাণীর মধ্যে নিরানব্বইটি; ইরাণী ও লাটিনের মধ্যে বিশটি সমান শব্দ ও ধাতু আছে। সুতরাং সংস্কৃত ও লাটিন ভাষার মধ্যস্থ শ্লাভ ভাষা এবং সংস্কৃত ও লাটিনের মধ্যস্থ গ্রীক ভাষা। শ্লাভদের প্রধান দেবতা বগু এবং সংস্কৃত ও ইরাণী দেবতা ভগ সম্ভবতঃ একই।

উল্লিখিত পণিকগণ ভারতীয় আর্য ছিল। তাহারা জাহাজ নির্মাণ করিয়া সপ্তসিন্ধুর তীরে সমুদ্রোপকূলে বাস করিত। মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলে কাষ্ঠের প্রাচুর্য থাকায় তাহারা তথায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের একদল পূর্বসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর দিয়া দক্ষিণ ভারতে উপনীত হয়। তথায় তাহারা অসভ্য চোল, কেরল ও পাণ্ড্যদিগকে সভ্য করে। সেই অসভ্য আদিম অধিবাসীদের অবশিষ্ট অংশকে এখন পর্বতবাসী পুলিয়ার,

মুণ্ডা বা জুরাঙ্গ জাতি বলে। পণিকরা তাহাদিগকে জাহাজ নির্মাণ, কৃষি কার্য, কারুকার্য ও খনন প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দেয়। কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার এবং ডাক্তার হল্‌জ্র বলেন, "এই কার্যে ব্যবহৃত শব্দ তামিল ভাষায় বহু আছে এবং ইহা হইতে বুঝা যায়, চোলেরা সুনিপুণ জাহাজ-নির্মাতা ছিল।" এই পণিকরা সপ্তসিন্ধু হইতে পারস্য উপসাগরের উপকূল দিয়া যাত্রা করিয়া পশ্চিমে যায় এবং তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেন, "ফিনিসিয়দের পূর্বপুরুষ এই নদীদ্বয়ের তীরে বাস করিত ও পরে সিরিয়ার সমুদ্র-তীরে গমন করে। উহাই ফিনিসিয়া প্রদেশ। পুরুষানুক্রমে ক্রমাগত বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও নিবাসের ফলে তাহাদের আর্যরক্ত মিশ্রিত হইয়া যায় ও তাহারা আদিভূমির ভাষা বিস্মৃত হয়। উহাদের সংস্পর্শে আসিয়া প্রাচীন ইসরাইল জাতি সুসভ্য হয় ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেমিটিক সভ্যতা সৃষ্টি করে। ইহুদী সভ্যতা সেমিটিক সভ্যতা হইতে উৎপন্ন। ইশা ও মুসা ইহুদী সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফল। বেরোসাস সাহেব বলেন, "ব্যাবিলনের একটি প্রাচীন আখ্যায়িকায় আছে যে, সকালে সমুদ্র হইতে মৎস আসিয়া ক্যালডিয়া ও আসিরিয়ার পূর্বপুরুষগণকে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া সন্ধ্যায় সমুদ্রে ডুবিয়া যাইত। ইহারা আর কেহ নহে ; ইহারা সপ্তসিন্ধুর জাহাজবাসী পণিকদল। উহারা উপনিবেশ স্থাপনের আগ্রহে সমুদ্রতীরবাসী অসভ্য নরনারীগণকে শিক্ষা দিতে যাইত। দাক্ষিণাত্যকে কুশদ্বীপ বলে। হিব্রু প্রবাদ এই যে, সুশান্ত বাণিজ্যশীল জাতি তাহাদের পূর্বপুরুষগণকে সুসভ্য করিয়াছিল। জুলিয়াস আফ্রিকানাস সাহেব বলেন, "ফিনিসিয়ার ইতিহাসে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা বহু সহস্র বৎসর প্রাচীন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, পণিকদের উপনিবেশ কত প্রাচীন।

ফিনিসিয়ার সৃষ্টি-তত্ত্বে আছে, সৃষ্টির প্রাক্কালে অনন্ত গতিশীল তমসাচ্ছন্ন অবস্থা বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে গতিশীল বায়ু কামাসক্ত হয় এবং তাহা হইতে মট সৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত মট শব্দ সংস্কৃত 'মৃৎ' শব্দের অপভ্রংশ। মট হইতে অণ্ডাকারে বিশ্বসৃষ্টি হয়। ক্রমে চন্দ্র, সূর্য,

মেঘ ও আলোকের উৎপত্তি ঘটে। ফিনিসিয়ার প্রধান দেবতা বায়াল বা সূর্য। উহার অন্য নাম ছিল ঔরানস। বেদের বরুণ এবং ঔরানস একই দেবতা। সায়নাচার্য বেদের ঋভুদিগকে সূর্যবংশের বংশধরগণের সহিত অভিন্ন মনে করেন। বেদে অগ্নিকে সূর্যের সন্তান বলা হয়। ফিনিসিয়ার প্রধান দেবতা রেস্‌চুফই বেদের ঋভুদেব। পণিকগণ গ্রীসদেশে যাইত এবং তথা হইতে সুদর্শন বালক-বালিকা চুরি করিয়া আনিয়া প্রাচ্যে বিক্রয় করিত। গ্রীসের দ্বীপপুঞ্জে তাহারা হোমারের সময়েও গিয়াছিল। মোক্ষমূলার, গার্বে ও উইণ্টারনিজ বলেন, "গ্রীস ও পারস্যের প্রাচীন আখ্যান হইতে জানা যায়, ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ তত্তৎ দেশে যাইয়া বাস করিতেন।" মোক্ষমূলার বলেন, "গ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে সক্রেটিশের সময়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ এথেন্সে গিয়াছিলেন।" প্লেটো দর্শন সম্বন্ধে এরিষ্টটল একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের বাক্য ইউসিবিয়াস উদ্ধার করিয়াছেন। উহাতে আছে, "এরিষ্টটল ও তৎশিষ্য এরিষ্টোফেনিসের মতে একজন দার্শনিক এথেন্সে আসেন এবং সক্রেটিশের সহিত দার্শনিক বিচার করেন। এরিস্টোফেনিসের উক্তিতে আছে, ভারতীয় দার্শনিক সক্রেটিশকে কি উত্তর দিয়াছিলেন। সক্রেটিশ বলিলেন, মানব জীবন সম্বন্ধে তত্ত্ব সন্ধান করাই তাহার দর্শনের উদ্দেশ্য। তখন ভারতীয় দার্শনিক সহাস্যে উত্তর দিলেন, "ঈশ্বরতত্ত্বের অবগতি ব্যতীত মানব জীবনের নিগূঢ় রহস্য জানা যায় না।"

পণিকরা জলযাত্রী ছিল বলিয়া জলদেবতা সূর্যের উপাসনা প্রথমে প্রচলন করে। এই ফিনিসিয়া সমগ্র ইউরোপ, গ্রীস, রোম, মিসর প্রভৃতি স্থানের সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। কার্থেজেও ফিনিসিয়াদের উপনিবেশ ছিল। কার্থেজের সভ্যতা দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, জুডিয়া ও প্রাগৈতিহাসিক আমেরিকার সহিত সমুদ্রপথে ভারতের সংযোগ ছিল। মিশরের দেবতা হোরাস সংস্কৃত সূর্য শব্দের অপভ্রংশ। তাহাদের দেবতা ওসিরিস ও আইসিস এবং বৈদিক দেবতা ঈশ্বর ও ঈশী অভিন্ন। প্রাচীন মিশরবাসিগণের মধ্যে যে জাতিপ্রথা

প্রচলিত ছিল তাহা ভারতীয় প্রথার সমতুল্য। হিন্দু পুরাণসমূহে মিশর মিশ্র দেশ নামে উল্লিখিত। উক্ত দেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকে পুরাকালে বাণিজ্যাদি ব্যপদেশে আসিয়া বাস করিত বলিয়া উহার উক্ত নাম হয়। বর্তমান ভারতে প্রচলিত মিশর শব্দটি মিশ্র শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। হেরোডোটাস লিখিয়াছেন যে, অনেক মিশরীয় প্রথা মূলতঃ আর্য।

সপ্তসিন্ধুর আর্যগণ যে সূক্ষ্ম মসলিন তৈয়ার করিতেন তাহার নাম ব্যাবিলনের অধিবাসিগণ দিয়াছিলেন সিন্ধু। মনুর বন্যা এবং অন্যান্য ভারতীয় আখ্যায়িকা ও ধর্মপ্রথা প্রাচীন ব্যাবিলন ও আসিরিয়াতে প্রচলিত ছিল। ব্যাবিলনীয় সৃষ্টিতত্ত্বে বৈদিক প্রভাব লক্ষিত হয়। যে জ্যোতির্বিদ্যায় বাবিলনীয়গণ উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষসাধন কারিয়াছিলেন তাহা ভারতের আর্য-ভাবাপন্ন দ্রাবিড়গণের অবদান। আসিরিয়ার সর্বোচ্চ দেবতা অন বৈদান্তিক ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া কথিত হয়। আসিরিয়ার কোন কোন শিলালিপিতে যে "অসুর' শব্দ দেখা যায় তাহা কোন কোন পণ্ডিতের মতে বেদের অসুর ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আসিরিয়াতে এই প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত যে, উক্ত দেশের আদিম অধিবাসী অসুরগণ সপ্তসিন্ধু হইতে সমাগত। পেণ্টাটুয়াকের ইয়াভিস্ট অংশের জোশুয়া ও সামুয়েলের যুদ্ধ এবং মহাভারতের কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধ সুসদৃশ। এই সৌসাদৃশ্য দর্শনে কোন কোন পণ্ডিত মন্তব্য করেন, "জুডিয়ার সেমাইটগণ ভারতের আর্যগণ কর্তৃক প্রভাবিত।"

অধ্যাপক নিলসন বলেন, ফিনিসিয়াগণ গল, কেণ্ট ও নরওয়েতে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপনপূর্বক বায়াল দেবতার পূজা প্রচলিত করে। বহু দেশে এই বায়াল দেবতাকে একটি প্রস্তর লিঙ্গের আকারে পূজা করিত। স্কাণ্ডিনেভিয়ায় এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, বিশেষ উপলক্ষে পাহাড়ের উপর কাঠের অগ্নি জ্বালিয়া প্রাচীন বায়াল উপাসকদের মত তাহার চতুর্দিকে অনেকে নৃত্য করে। এই মহানিশার অগ্নিকে বায়াল অগ্নি বলিত। এই বায়াল দেবতার নাম হইতে উক্ত দেশের বহু স্থানের নাম করণ হইয়াছে। বালটিক সাগর, ছোট ও বড় বেল্ট, বালটিবার্গা, বালেসাঞ্জেন, বালস্ত্রান্দেন প্রভৃতি শব্দ বায়াল

হইতে উৎপন্ন। নিলসন সাহেবের মতে তাহাদের সভ্যতা মূলতঃ সেমিটিক। যুদ্ধজয় করা ও মাছ ধরা প্রভৃতি বহু বিষয়ে ফিনিশীয়দের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে। এই নিলসন সাহেব জগদ্বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ। সুতরাং তাঁহার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। যেমন করোমণ্ডল নাম চোলমণ্ডল হইতে উৎপন্ন তেমনি চালডিয়া নাম চোল দেশ হইতে হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিতেন যে, চালডিয়া, বাবিলন প্রভৃতির সভ্যতা সম্ভবতঃ সেমিটিক। কিন্তু ভনক্রেমার, গুইডি, ইগন, হোমেল প্রভৃতি সাহেবগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাবিলন ও আসিরিয়ার আদিম অধিবাসিগণ মধ্য এশিয়ার কোন দেশ হইতে আসিয়াছে। সম্প্রতি শব্দশাস্ত্রবিদ্‌গণ গভীর গবেষণার ফলে নির্ণয় করিয়াছেন যে, দ্রাবিড় ভাষা ও উহাদের ভাষার মধ্যে নিকট সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুমেরু জাতিবর্গ আর্য, দ্রাবিড় ও ইরাণীদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। চ্যালডিয়ার তেলো সহরে যে সকল প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সহিত দ্রাবিড়ী মস্তকের নিকট সাদৃশ্য আছে। সুমেরু ভাষাও দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। চোলদিগের মত চ্যালড়িয়াবাসিগণ কৃষক, ক্যানেল খনক, ব্যবসায়ী ও সমুদ্রযাত্রী ছিল। পুরাকালে দক্ষিণ ভারত ও পারস্য উপকূলের মধ্যে যে বানিজ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা সর্ববাদীসম্মত। এইচ. আর. হল সাহেব বলেন যে, সুমেরু জাতির মাথার সহিত ভারতীয় মাথার আশ্চর্য্যজনক সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। বর্তমান সাধারণ ভারতবাসীর মুখমণ্ডল নিঃসন্দেহে দ্রাবিড় জাতির পূর্ব পুরুষের মত। হল সাহেবের মতে সুমেরুগণ দক্ষিণ ভারতের হিন্দুদের তুল্য ছিল। ফ্রাঙ্কোইস লেনোরমণ্ট সাহেব বলেন, "বৈদিক শব্দ 'মানা' (সোনার নির্দিষ্ট ওজন) প্রাচীন চ্যালডিয়াতে ও ব্যাবিলনে সমান অর্থে ব্যবহৃত হইত। গ্রীক 'ম্না', লাটিন 'মিনা', ফিনিসিয়ার 'মানা' ও দ্রাবিড়ী মানা একার্থ বোধক।" মা অর্থে মাপ করা, মানা অর্থে মূল্য বা ওজন। একটী বৈদিক ঋকে আছে, "আমাদিগকে গো, অশ্ব, ধন, রত্ন ও স্বর্ণ-মানা দান কর।" অতএব মানা নিশ্চয়ই কোন বৈদিক মুদ্রা। পনিক বা আর্য ব্যবসায়ীরা উহা তথায়

লইয়া যায়। রাগোজিন সাহেব বলেন, যুক্ত ব্যাবিলনের প্রথম রাজা উর বাগাস কর্তৃক খ্রীষ্টপূর্ব ত্রিংশৎ শতকে নির্মিত চ্যালডিয়াস্থ মুঘের প্রাসাদে দক্ষিণ ভারতের মালাবার প্রদেশে উৎপন্ন একখণ্ড টিক কাঠ পাওয়া গিয়াছে। রাগোজিন সাহেব আরো বলেন, বৈদিক আর্য্যগণ যে সক্ষ মশলিন তৈয়ার করিত ব্যাবিলনবাসীরা তাহা জানিত। দক্ষিণ ভারতের, বিশেষতঃ মহীশূরের রাজাদের নামের সহিত 'উর' শব্দ সংযুক্ত থাকে, মহীশূর শব্দও মহীশ+উর হইতে নিষ্পন্ন। বোধ হয়, ব্যাবিলনের মুঘের মহীশূরের অপভ্রংশ। ঋগ্বেদের প্রথম ইংরাজি অনুবাদক এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব বলেন, বেদের সূক্তসমূহে সুমত্র শব্দ বহু আছে। তাহারা উক্ত শব্দ এখনও প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করে। গ্রীক ও লাটিন পণ্টস শব্দই সংস্কৃত পন্থা শব্দ। সংস্কৃত মৃ ধাতু হইতে স্লাভ মরি, লাটিন মার, ইটালীয় ও স্প্যানিশ মারে, ফ্রেঞ্চ মার, জার্মান মুর, ইংরাজি মেরে ও কেণ্ট মুইর সমান অর্থ বোধক ধাতু হইয়াছে। হিব্রু সাহিত্যে আছে, তাহাদের রাজা সলোমন যে সকল চন্দন কাঠ, হাতির দাঁত, ময়ুর, সোনা ও বহুমুল্য প্রস্তর ব্যবহার করিতেন তৎসমুদয় শব্দ দ্রাবিড়ী ও হিব্রু ভাষায় অদ্যাপি বর্তমান। ময়ুরকে হিব্রুতে তাকিয়িম ও তামিলে তোকেই বলে। তামিল কুলক্ক ( ঠাণ্ডা ), এ্যাংলো-সাক্‌সন কোল, জার্মান কুউল এবং ইংরাজি কুল ( cool ) একার্থ বোধক। রাজা সলোমনের সময় ভারত, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের মধ্যে বানিজ্য প্রচলিত ছিল।

যখন হিব্রু গ্রন্থ 'বুক অব কিং' লেখা হয় তখন ভারত হইতে পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বানিজ্য চলিত। ব্যাবিলন ও ফিনিসিয়ার পবিত্র প্রতীক সর্প। ইহা ধনরত্ন ও রহস্য সহিত পৃথিবী দেবতার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত। যে এরিধু সহর হইতে ক্যালডিয়ার প্রথম সভ্যতা উদ্ভূত ও প্রচারিত হয় সেই এরিধুর পবিত্রতম দেবমন্দিরে সর্পাকারে অহি দেবতা পুজিত হইত। ইহাই অক্কাডিয়ান সর্পদেবতা ইত্র। তজ্জন্য অহি ফিনিশিয় জাতি ও ধর্মের প্রতীক। মিডিয়ায় ও পারস্যে উক্ত অহি প্রতীক অদ্যাপি প্রচলিত। ঋগ্বেদে ব্রহ্মবিদুষী সর্পরাজ্ঞীর কথা পড়া

যায়। এই বৈদিক অহি নিশ্চয়ই চ্যালডিয়া বা সুমের দেশের ইত্র। দ্রাবিড়গণ মনুকে সত্যব্রত নামে তাহাদের প্রথম রাজা বলিয়া সম্বোধন করে। চ্যালডিয়ার হসিসদ্র ও গ্রীক শিশুপ্রাস অহি শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। বেদের অহি-হনই (ইন্দ্রই) চ্যালডিয়ার ইত্র-হন, যাহার সহিত মনসরম বা মৎস্য নাম যুক্ত হইয়াছে। বাইবেলে আছে যে, ইসরাইলগণ চ্যালডিয়ার 'উর' হইতে আসিয়াছে। চ্যালডিয়ার সৃষ্টি-তত্ত্ব, ঈশ্বর-তত্ত্ব, শিল্পকলা ও জ্যোতিষ প্রভৃতির সহিত বেদোক্ত বিদ্যার নিকট সাদৃশ্য আছে। আসিরিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ইলু বা অন ধর্মের অবনতি হইলে শরীর ধারণ করেন। তিনি নিরাকার ও নির্গুণ হইলেও সাকার ও সগুণ রূপে অবতীর্ণ হন। উক্ত অন ও বৈদিক ব্রহ্ম সম্ভবতঃ একই সত্তা। বেদে ইন্দ্র শক্তিমান দেবতা। তাঁহার অন্য নাম ইলাপতি পর্জন্য। সম্ভবতঃ ইন্দ্র শব্দ ইলু ও শ্রেষ্ঠ দেবার্থক আরবী আল্লা শব্দের জনক। অহি-হন হইতে অন শব্দ উৎপন্ন। আসিরিয়গণ অহি-হনকে অস্-হুর, আর ইরানীরা অহুর বলিত। অস্-হুর ও অহুর সংস্কৃত অসু শব্দজাত। তাহাদের তৃতীয় দেবতা অনুই বৈদিক অগ্নি। ব্যাবিলনীরা উহাকে দহনু (সংস্কৃত দহন) বলিত। তাহাদের রাত্রি দেবতা শিনই আমাদের সোম, চন্দ্র। সংস্কৃত বায়ু বা বৈদিক বেন তাহাদের পবন দেবতা বেইন। বেদের মরুৎ হইতে ব্যাবিলনের ঝড়-দেবতা মতু বা মর্তু এবং রোমান মর্ভেস আবির্ভূত। ভারতের দীন দেবতা দীনেশ হইতে আসিরিয়ার দায়ানিসু ও গ্রীক দাইওনিসাস দেবতা উৎপন্ন। সেসি সাহেব আসিরিয়ার কোন প্রস্তর-লিপিতে বৈদিক মিত্র দেবতার নাম পাইয়াছেন। ব্যাবিলনের জরপনিত ও তমোদেবতা তম্মুজই যথাক্রমে বৈদিক সর্পরাজ্ঞী ও সংস্কৃত তমস্। তাহাদের ইস্টারই বৈদিক উষা, গ্রীক জিউস ও লাটিন ইয়স্। গ্রীক জিউস হইতে ইংরাজি জুপিটার উৎপন্ন। উল্লিখিত জিউস, ইয়স, নিক্স, হেলিয়স, ইগ্নিস ও ভগ যথাক্রমে সংস্কৃত দ্যৌ, উষা, নক্ত, সূর্য্য, অগ্নি ও ভগ হইতে আগত। ইরাণী এগ ও স্লাভ বগু সংস্কৃত ভগ শব্দের অপভ্রংশ। বেদের ত্রিত্ববাদ (Trinity) মিশরীয় ও খ্রীষ্টান ত্রিত্ববাদে পরিণত। ল্যাসেন বলেন, "খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে

বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাবিলনে পৌঁছিয়াছিল এবং জেন্দাবেস্তাতে বুদ্ধদেবের নাম উল্লিখিত।* ভগিনী নিবেদিতা বলেন, ইহুদীরা মিশরের আধ্যাত্মিক অধিকারী বা ঋণধর। সংস্কৃত বাক্=গ্রীক ভক্স=রাশিয়ান ভক। সংস্কৃত সারমেয়, প্রমথ, ঋভু, সারণ্য, পবন ও যমুনা যথাক্রমে গ্রীক হারমিস, প্রমেথিউস, অরফিউস, এরিনিস, পান ও যমানিস হইয়াছে। বেদের পর্জন্য লিথুয়ানিয়ার বজ্র দেবতা পারকুনিস, প্রাসিয়ার পরিউনিস, লেটিসের পারকাউস ও স্লাভের পেরুনা অভিন্ন। আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের সৃষ্টিতত্ত্বে আছে, সৃষ্টির অগ্রে বিশৃঙ্খল মহাশূন্য জলীয় পদার্থে পরিপূর্ণ ছিল। তথায় মাত্র দুইটী প্রাণী ছিল—অপসু সমুদ্র ও জগন্মাতা তিয়ামৎ। অপসু ও তিয়ামৎ সংস্কৃত অপ্ ও তমস্ শব্দের অপভ্রংশ। বৈদিক পুরুষ মার্দিকের মত তাহাদেরও মার্দ্ক হইতে চারি জাতি ও মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের পুরোহিত তাহাদের পেট্টসিস। দাক্ষিণাত্যের দেবদাসী প্রথাও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহাদের তরুণীরা দেবমন্দিরে বেশ্যাবৃত্তি করিত। আমাদের মত তাহাদেরও দ্বাদশ সূর্য্য। আমাদের শ্রেষ্ঠী, বর্তমান দাক্ষিণাত্যের চেট্টি, মাড়োয়ারী শেঠ ও চ্যালডিয়ার শেইট একার্থ বোধক শব্দ। পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ ইউরোপ সভ্যতা ও কৃষ্টির জন্য ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার নিকট ঋণী। এই দুই দেশ সুমেরু জাতির উত্তর অধিকারী। সুমেরু শব্দ সমরু (সংস্কৃত মরুর নিকটবর্তী স্থান) হইতে আসিয়াছে।

ব্যাবিলনের মত মিশরও প্রাচীন ও সুসভ্য দেশ। মিশর নাইল নদীর উপত্যকা। উহার পূর্ব-পশ্চিমে শাহারা মরুভূমি ও উত্তরে ভূমধ্য সাগর। ইহার প্রস্থ ১৫ হইতে ৩৩ মাইল এবং দৈর্ঘ্য ৫৭০ মাইল। ইহা অবশিষ্ট আফ্রিকা মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম দেশ; বেলজিয়াম অপেক্ষা উহা অবশ্য বড়। ইহার পরিমাণ বার হাজার বর্গ মাইল। প্রাচীন অধিবাসীরা উহাকে কামিত (কাল দেশ) বলিত। মিশরীয় ভাষায় উহার নাম কেম। গ্রীকরা উহাকে আইজিপ্টস বলিত। ইহা হইতে ইংরাজি ইজিপ্ট হইয়াছে। ইজিপ্ট সংস্কৃত অগুপ্ত শব্দের অপভ্রংশ

হইতে পারে। সংস্কৃত মিশ্র হইতে হিব্রু মিজ্‌রেন, সেমিটিক মুশর ও আরবী মাশর উৎপন্ন। প্রাচীন মিশর নাইল নদীকে হাপি বলিত ; কিন্তু গ্রীক ও রোমানগণ উহাকে বলিত নাইলস, তাহা হইতে ইংরাজি নাইল শব্দ। সংস্কৃতে ইহার নাম নীল নদী। শব্দশাস্ত্রবিৎ ও ঐতিহাসিক বলেন, এশিয়ার কোন কোন জাতির সহিত মিশর জাতির নিকট সংযোগ ছিল। মিশর-তত্ত্ববিৎ ( ইজিপ্টোলজিষ্ট ) মন্তব্য করেন, "লোহিত সাগরের দক্ষিণে পুণ্ট দেশ হইতে উহারা আসিয়াছে এবং পিউনিক জাতির বংশধর। পিউনিকগণ পারস্য উপসাগর হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিত। ইহারাই মিশরের পূর্বপুরুষ।" পিউনিক বা পণিকগণই সপ্তসিন্ধুর বণিক। পাণ্ড্য-দেশকে উহারা পুণ্ট বলিত। চোলগণ দক্ষিণ ভারত হইতে চ্যালডিয়াতে এবং পাণ্ড্যগণ লোহিত সাগর দিয়া মিশরে গিয়াছিল। অধ্যাপক ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি বলেন, "মিশরবাসীরা ফিনিশিয়ানদের সহজাত এবং লোহিত সাগর দিয়া পুণ্ট দেশ হইতে সমাগত।"

মিশরের প্রাচীন অধিবাসীরা পুণ্টদেশের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন ; "সমুদ্র-বিধৌত দূরদেশটী উপত্যকা ও পাহাড়ে পূর্ণ এবং কাঠ, ধূপ, মণি-প্রস্তর, পশু, চিতাবাঘ ও বানর প্রভৃতিতে সকুল।" এই বর্ণনা হইতে পুণ্ট দেশকে মালাবার বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন সভ্য জগৎ ভারতের মালাবার হইতে ধূপাদি আমদানী করিতে উৎসুক ছিল। সংস্কৃত সূর্য হইতে মিশর দেবতা হোরাস ও গ্রীক সিরিয়াস উৎপন্ন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, "স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সহিত এশিয়ার কোন জাতির সংমিশ্রণে মিশর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।" তাহাদের দেবতাযুগল ওসিরিস ও আইসিস সংস্কৃত ঈশ্বর ও ঈশীর, অথবা অসূর্য ও উষার অপভ্রংশ মনে হয়। রাত্রিতে সূর্যের আলোক থাকে না বলিয়া বেদেও নৈশ সূর্যকে সুপ্ত রবি বলে। মিশরের একটি প্রবাদ আছে যে, নিদ্রাই আমাদের দৈনিক মৃত্যু। বেদে আছে, উষা সূর্যের শক্তি ও গাভীবৎ বৃষের অনুসরণ করে। মিশরের সর্বশক্তিমান্ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা আমেন, আমু অথবা রা। রা দেবতা

বাক্যমনাতীত এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের অধীশ্বর। রা দেব বেদের ব্রহ্মবৎ একমেব ও অদ্বিতীয়।

এম. ডি. রাউজি সাহেব বলেন, "মিশরের ধর্মশাস্ত্রে এক অদ্বিতীয় দেবতার কথা আছে, যিনি স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, ত্রিলোকের স্রষ্টা, গুণাতীত ও গুণময়। ইনি নিঃসন্দেহে বেদের নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম। শিব বা হরকে পরবর্তী পুরাণসমূহে অব্যক্ত ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। বোধ হয়, রা দেবতা হর দেবতার অপভ্রংশ। কারণ মিশরীয় উচ্চারণে হ বর্ণ লুপ্ত থাকে। সংস্কৃত ওম্ই মিশরের আমেন বা আমু। মিশরে একটি আখ্যায়িকা আছে যে, অসিরিস ও সেথ দেবতাদ্বয়ের মধ্যে চিরকলহ বিদ্যমান। উক্ত যুদ্ধে অসিরিস আহত হন এবং তাঁহার ভগিনী আইসিস ও নেফথিস দেবের শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করেন। সেথ দেবের শক্তি নেফথিস ও বেদের বস্তু একই। সেথ চন্দ্রের জ্যোতি বা শ্বেতরশ্মি। মিশরের থিবীস দেবতার সহিত এক হিন্দু দেবতার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। বেদের সাবিত্রী বা পুরাণের শিবাই তাহাদের সেব দেবতা। তাহাদের আইসিসকে পকত ও সেকেত বলা হয়। সম্ভবতঃ সংস্কৃত প্রকৃতি ও শক্তি হইতে পকত ও সেকেত উৎপন্ন। তাহারা শক্তিকে মুত বলে। সংস্কৃত মাতা হইতে উক্ত মুত শব্দ হইয়াছে। তাহারা বলিত, আমেন বা আমু দেবতা পুণ্ট দেশের দেবতা। বেদের বিষ্ণু মিশরের বেস দেবতা। হীরেন ও পেট্রি সাহেবদ্বয় বলেন, "ভারতীয় ও মিশরীয় ভাষার মধ্যে নিকট সাদৃশ্য আছে।" আর্যদের মত মিশরীরা তাহাদের রাজাকে ধর্ম, দেশ ও ঈশ্বরের প্রতিনিধি, বিচারক এবং আইনদাতা বলিত। ভারতের মত মিশরেও জাতিবিভাগ ছিল এবং ব্রাহ্মণদের মত এক জাতির প্রাধান্য সর্বোপরি স্বীকৃত হইত। এই পুরোহিতগণ তাহাও রাজাদের মন্ত্রী, পরামর্শদাতা ও অর্থনীতিজ্ঞ ছিলেন।

ভারতের মত মিশরও পুরোহিতদের নিম্নে যুদ্ধবিশারদ ক্ষত্রিয়দের সম্মান করিত এবং পরাজিত ও আশ্রিত শত্রুদিগকে মুক্তি দিত। হেরোডোটাস বলেন, "অবশিষ্ট মানব জাতির মধ্যে তাহারা হিন্দুদের মত

স্মৃতিশক্তি লাভের জন্য বিশেষ মনোযোগী ছিল।" তাহাদের সামাজিক প্রথা ও জীবনযাত্রা হিন্দুদের মত। গুরুজনের সঙ্গে পথে দেখা হইলে তাহারা পথ ছাড়িয়া দিত বা গুরুজন গৃহে আসিলে তাহারা আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইত। পিতামাতাদি গুরুজনকে তাহারা নতজানু হইয়া করজোড়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সম্মান জ্ঞাপন করিত। তাহাদের প্রত্যেক মাস এক একটি দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত। তাহারা আত্মার অমরত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিল এবং দুঃখ ও মৃত্যুর পরে মাথা মুড়াইত। তাহাদের পুরোহিতরা দিনে দুইবার স্নান করিত। তাহারা প্রথমে গরুবলি দিত, পরে আর্যদের মত ঘোড়া ও মহিষ এবং শেষে ছাগল বলি দিত। আমাদের শিবের মত তাহাদের সিরিস দেবতার পবিত্র বাহন ছিল ষাঁড়। আমরা যেমন বিড়ালকে ভালবাসি তাহারা তেমনি বিড়ালকে পূজা করিত। তাহারা জননেন্দ্রিয়কে ব্রহ্মযোনিস্থানে লিঙ্গপূজা করিত। বৈদিক যুগে সপ্তসিন্ধুতেও শিশ্নদেবের পূজা (লিঙ্গপূজা) প্রচলিত ছিল। এশিয়াবাসীদের ফ্যালাস পূজাই মিশর, গ্রীস ও রোমের প্রায়াপাস পূজা এবং কানাইট ও ইহুদীদের পোয়েয়ার পূজা উদ্ভূত। সম্ভবতঃ সংস্কৃত পেল শব্দের অপভ্রংশ ফ্যালাস।

ডিওডোরাস বলেন, "যেমন হিন্দু মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম হইতে জগৎ সৃষ্ট তেমনি মিশরীদের মতে এই বিশ্ব পঞ্চ ভূত হইতে সম্ভূত। সকল পদার্থের জননী পৃথিবীকে তাহারা মেতেরা (সংস্কৃত মাতৃ) বলিত। গ্রীক মেটেরা (মাতৃভূমি) ও মাতৃশব্দজাত। বেদের সূর্য ও চন্দ্র বংশকে তাহারা শ্বেত ও রক্ত বংশ বলিত। আরবের আঠাইশ দিনের মঞ্জিল ভারতের চান্দ্রমাস হইতে গৃহীত।

আর্যদস্যু ও যাযাবরগণ পশ্চিম এশিয়ার মিডিয়া, লিডিয়া, কাপাডোসিয়া, আর্মেনিয়া ও গ্যালেসিয়াতে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ভূমধ্য সাগরের জন্য তাহারা আরও পশ্চিমে অগ্রসর হইতে না পারিয়া ইউরোপে প্রবেশ করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অহঙ্কার করিয়া বলেন যে, ঐতিহাসিক যুগে পারস্যই পৃথিবীর মধ্যে প্রথম বৃহত্তম সাম্রাজ্য। কিন্তু তাহারা বিস্মৃত হন,

আসিরিয়া, ব্যাবিলন, ফিনিসীয়া ও মিশরের সমৃদ্ধির অনেক পরে পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। পারসীকগণ খাঁটি আর্যবংশধর। পারস্য সম্রাট দরায়ুস খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন।

দরায়ুস নিজেকে পারস্যবাসী না বলিয়া একজন আর্য বলিয়া গর্ব অনুভব করিতেন। তাঁহার সমাধি প্রস্তরে এই কথা ক্ষোদিত আছে। রোজারস্ সাহেব বলেন, "মিট্টানিরা জগতের সভ্যতায় গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের ইতিবৃত্ত কিছু পাওয়া যায় না।" মিট্টানিদের মত পোসিয়ান, হিট্টাইট ও ফ্রাইজিয়ানরা প্রাচীন কালে সুসভ্য ছিল। মিট্টানিরা ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে বাস করিত। বাইবেলে তাহাদিগকে অরম নহরেণ এবং মিশরে শুধু নহরেণ বলিত। খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতকে মিশরের প্রথম রাজা তেহুতাইম তাহার এশিয়া অভিযানে আসিয়া মিট্টানিদের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া একটি প্রস্তরফলক প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় হইতে নাইল নদী ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যে গমনাগমন চলিত। তেলেল অমর্না বর্ণমালা হইতে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৭০ এবং ১৪০০ অব্দের মধ্যে মিট্টানিতে অর্থতন, অর্থসুম, সুতর্ণ ও দশরথ নামে চারিজন রাজা রাজত্ব করিতেন। এই শব্দগুলি ভারত হইতে গৃহীত মনে হয়। স্পষ্টতঃ মিট্টানি দশরথ শব্দ সংস্কৃত দশরথের অপভ্রংশ হুগ্ উইঙ্কলার সাহেব ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কাপাডোসিয়া দেশে বোগাজ কুই দেশে একটি মৃন্ময় ফলক আবিষ্কার করেন। তাহাতে বৈদিক মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) নামক দেবতা চতুষ্টয় উল্লিখিত। উক্ত ক্ষোদিত ফলক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে লিখিত। নাসত্যকে ইরাণীরা নাহত্য বলিত। আসিরিয়ার পূর্বে মিট্টানিরা সমৃদ্ধ হয়। কারণ, প্রায় তিন হাজার বৎসর অগ্রে আসিরিয়ার রাজধানী বিখ্যাত নিনেভা শহরে ব্যাবিলনের পুরোহিতগণ রাজত্ব করিতেন। মিশরের রাজারা মিট্টানী মহিলা বিবাহ করিতেন। ইহাতে মনে হয়, মিট্টানিরা এক সুপ্রাচীন আর্যজাতি।

ব্যাবিলনের পূর্বে এলামের জেগ্রস পর্বতে পোসিয়ান নামে আর এক আর্যশাখা বাস করিত। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকে তাহারা ব্যাবিলনের শেষ রাজাকে পরাস্ত করিয়া প্রায় ছয় শত বৎসর রাজত্ব করেন। ব্যাবিলনই তাহাদের রাজধানী ছিল। রোম যেমন প্রাচীন ইউরোপের কেন্দ্রস্থল ছিল তেমনি ব্যাবিলন পুরাকালে সমস্ত পশ্চিম এশিয়ার তীর্থস্থান ছিল। আসিরিয়া ব্যাবিলনের সমসাময়িক। তথায় পুরোহিতগণই রাজত্ব করিতেন। আসিরিয় সম্ভবতঃ বৈদিক অসুর। মিশরের ফারাওদের সহিত উহাদের বিবাহ চলিত। ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে পোসিয়ার রাজশক্তি নষ্ট হইলে আসিরিয়ার রাজাগণ ব্যাবিলনের রাজা হন। তাঁহাদের প্রধান দেবতাদের নাম সূর্য, মরুৎ প্রভৃতি। তাহাদের ভাষার সহিত সংস্কৃতের নিকট সাদৃশ্য আছে। তাহাদের প্রস্তরলিপিতে পাওয়া যায়, তাহারা নিজদিগকে আর্য বলিত। সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্তে বিতাড়িত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ত্রিংশৎ শতকে তথায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহাতে প্রমাণিত হয়, পোসিয়ানগণ আর্যজাতির বংশধর।

হিট্টাইট নামে আর্যজাতির আর একটি শাখা মিট্টানি সহরের নিকট বাস করিত। তাহারা শক্তিশালী ও যুদ্ধপ্রিয় ছিল। তাহাদিগকে মিশরীয়গণ খেট ও আসিরিয়গণ খাট্টি বলিত। এই খেট্ট বা হিট্টাইট সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ। ইটালি ও আফ্রিকা অবধি বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্য তাহারা স্থাপন করিয়াছিল। প্রস্তরক্ষোদিত হিট্টাইট আকৃতিতে ভারতীয়দের মত। একবার তাহারা মিশরের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে। তখন তাহারা খাট্টি রাজা খাতুশীলের সহিত সন্ধি করে। সংস্কৃত ক্ষত্রশ্রী শব্দের অপভ্রংশ খাতুশীল। তাহারা খাতুশীলকে খাতাশর (সংস্কৃত ক্ষত্রেশ্বর) বলিত। সেই সন্ধিপত্রে প্রধান দেবতা সুখতের (সংস্কৃত শতক্রতু বা ইন্দ্র) নাম উল্লিখিত। হিট্টাইটদের প্রধান দেবী বিশ্বমাতার নাম মা ও প্রধান দেবতার নাম অস্তিস (বেদের অগ্নি, সূর্য্য) ও মিত্রস্ (বেদের মিত্র) এবং মেন্ (ইরানী মাও)।

পর্বতোপরি যশেলিকার মন্দিরে মা দেবী সিংহাসনে উপবিষ্টা ও মুকুট-পরিহিতা। মা দেবী হিন্দুদেবী জগদ্ধাত্রীর মত। আমাদের শিবের মত তাহাদের বৃষবাহন দেবতাও ছিলেন।

পশ্চিম এশিয়ার মধ্যস্থলে ফ্রাইজিয়া দেশ ছিল। উহার অধিবাসিগণ নিঃসন্দেহে আর্য। ফ্রাইজিয়া নদীবহুল পর্বতময় দেশ। তাহাদের ভাষায় দেবীকে আম্মা (তামিল আম্মা, সংস্কৃত অম্বা) ও সিবিব বলিত। এই সিবিবই বেদের পৃথিবী দেবতা। উহাকে পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন জাতি লিডিয়ানগণ উক্ত নামে অভিহিত করিত। সিবিব দেবতাকে স্বর্গভ্রষ্ট নিরাকার প্রস্তরখণ্ডরূপে পূজা করা হইত। তাহাদের প্রধান দেবতা ছিল বেজাইয়স্। ইহা বেদে ও আবেস্তাতে ভগদেব নামে কথিত। শ্লাভদের প্রধান দেবতাও এই বগু। ঋগ্বেদের বৃজিদের এক শাখা ফাইজিয়ান বলিয়া মনে হয়। উহাদের একদল এশিয়া মাইনরে বসবাস করে এবং অবশিষ্ট অংশ ইউরোপে যাইয়া থ্রেস শহরে ব্রিগ নামে অভিহিত হয়।

জার্মান পুরাতত্ত্ববিৎ হুগো ভিঙ্কলার ১৯০৭ খ্রীঃ এশিয়া মাইনরের বোগাজকাই সহরে এইটী প্রস্তর-লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহাতে আছে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতক হইতে ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত প্রায় নয়শত বর্ষ এশিয়া মাইনরে বৈদিক সভ্যতা প্রবল ছিল। উক্ত ফলকে মিত্র, বরুণ ও ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার নাম উল্লিখিত। লিডিয়াও এশিয়া মাইনরের একটি প্রাচীন দেশ। তাহাদের প্রধান দেবতা ছিল মেডেনস্, যাহাকে বেদে মিত্র বলে। বৈদিক সূর্য্য বা অত্রি তাহাদের অত্তিস দেবতা। তাহাদের প্রধান শহরের নাম শর্ডিস (বৎসর)। সম্ভবতঃ শর্ডিস বেদের শরদ। লিডিয়ার এক প্রসিদ্ধ নগরের নাম ছিল এশিয়া, যাহা হইতে এশিয়া মহাদেশের নামকরণ হইয়াছে। এশিয়া নামটি লিডিয়ার মহাবীর এসিসের নাম হইতে উৎপন্ন। লিডিয়ার মুদ্রাকে মিনা (বেদের মানা) বলিত। লিডিয়ানগণ লিঙ্গপূজা করিত এবং অক্ষক্রীড়া ভালবাসিত। ইহা হইতে অনুমিত হয়, লিডিয়া পর্য্যন্ত আর্য প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

বৌদ্ধদের গল্পসমূহ পালি হইতে ফার্সীতে অনূদিত হয়। সেগুলি ফার্সী হইতে আরবী এবং আরবী হইতে লাটিন প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এশিয়া মাইনরে উপস্থিত এবং ঈসপ কর্তৃক গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়। লিডিয়ার রাজা ক্রোসাসের দরবারে ঈসপ উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের কতিপয় উপাখ্যান হেরোডোটাসে দৃষ্ট হয়। তাইবিরিয়াসের সময় ফিড্রাস কর্তৃক উহাদের লাটিন অনুবাদ হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ার বাব্রিয়াস কর্তৃক উহাদের গ্রীক অনুবাদ হয়। প্রসিদ্ধ ভারতীয় উপাখ্যান শুকসপ্ততি ফার্সী আকারে দশম শতকে ইউরোপে গমন করে। আরব্য উপন্যাসে নাবিক সিন্ধবাদের গল্পটি জনৈক হিন্দু কর্তৃক রচিত। উহাও তখন ইউরোপে উপস্থিত হয়। ভারতীয় ঋষি পিল্‌পের গল্প লা-ফন্টেন কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন, পিল্‌পে শব্দটি বিদ্যাপতির অপভ্রংশ। এই সকল উপাখ্যান ইউরোপীয় সাহিত্যে চিরস্থায়ী রেখাপাত করিয়াছে। ভারতীয় ময়ূর, শৃগাল, হস্তী ও সিংহ প্রভৃতি পশুপক্ষী ইউরোপীয় গল্পসমূহে প্রবেশ করিয়াছে। ওয়েলসের বিখ্যাত গল্প—লিওয়েলিন্ ও গিবার্ট-পঞ্চতন্ত্রের বেজী ও সর্প গল্পের অবলম্বনে রচিত। প্রাচীন গল্পের বেজী ও সর্প পরবর্তী গল্পে কুকুর ও ব্যাঘ্রে পরিণত। লা-ফন্টেনের একটি গল্পে আছে, গোয়ালার দুহিতা আকাশ-কুসুম চিন্তা করিতেছে। ভারতীয় উপাখ্যান 'ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক' উহাতে প্রতিধ্বনিত। চসারের ক্যাণ্টারবেরি গল্পগুলি এবং গেস্টা রোমানোরাম ও বেকামেরন আখ্যানসমূহে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। ক্ষমাকারী গল্পটি পালি ভাষায় বেদব্ভা জাতক হইতে গৃহীত। প্রসিদ্ধ বারলাম ও জোসাফৎ গল্পটিতে আছে, খ্রীষ্টান রাজকুমার জোসাফৎ জীবনের দুঃখে গভীর ভাবে বিচলিত হইয়া সংসার ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসী হন। অষ্টম শতকে উক্ত গল্প দামস্কাসের জন কর্তৃক গ্রীক ভাষায় লিখিত এবং খলিফা আল্-মনসুরের সময় আরবী ভাষায় অনূদিত। উক্ত গল্প আরবী অনুবাদ

হইতে ইউরোপীয় ভাষাসমূহে প্রচারিত হয়। অধুনা প্রমাণিত হইয়াছে যে, জোসাফৎ বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য কেহ নহেন এবং 'ললিত বিস্তরে' উক্ত গৌতম বুদ্ধের সংসারত্যাগ অবলম্বনে উহা রচিত।

ভাব ও গল্প ব্যতীত ভারতের অন্যান্য বিদ্যাও প্রাচীন পাশ্চাত্যে প্রভাব বিস্তার করে। তথাকথিত আরবী সংখ্যা দশক এবং দশমিক প্রণালী প্রথমতঃ ভারতে আবিষ্কৃত ও পরে আরব দেশ দিয়া ইউরোপে বাহিত হয়। কোন মনীষী বলেন, দশ সংখ্যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও স্বল্পতম সংখ্যা শূন্যটি মানব জাতির প্রতি ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ দান। বীজগণিতও ভারতে উৎপন্ন এবং আরবদের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপে প্রেরিত। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদী নির্মাণকালে জ্যামিতি জাত হয়। জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ ডাঃ থিবো, যিনি এলাহাবাদ মুইর সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন, মন্তব্য করেন যে, বৈদিক যজ্ঞবেদী নির্মাণে যে গাণিতিক প্রণালী ব্যবহৃত হইত তাহাই প্রাচীন গ্রীসে যাইয়া জ্যামিতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরবর্তী কালে ইউক্লিড প্রমুখ গ্রীক পণ্ডিতগণকে জ্যামিতি রচনায় প্রেরণা দেয়।

ঔষধ-বিজ্ঞানের শরীর তত্ত্বাদি শাখাও হিন্দুগণ কর্তৃক সমধিক সমৃদ্ধ হইয়াছিল। ডাঃ রইল দেখাইয়াছেন যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটীস তাঁহার মেটিরিয়া মেডিকা রচনায় ভারতের নিকট ঋণী। প্যারিসন বলেন, সম্রাট আলেকজ্যাণ্ডারের সময় হিন্দু চিকিৎসক ও সার্জনগণ গভীর জ্ঞান ও কুশলতার জন্য যথাযোগ্য প্রসিদ্ধি উপভোগ করিতেন। কোন বিশেষজ্ঞের মধ্যে এরিস্টটলও ভারতের নিকট ঋণী। অন্যান্য দেশে সঙ্গীত বিজ্ঞানে পরিণত হইবার বহু শতক পূর্বে ভারতে উহা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আকারিত হয়। কথিত আছে যে, জার্মানির ওয়াগ্নার লাটিন তর্জমার মাধ্যমে হিন্দু সঙ্গীতের সহিত সুপরিচিত ছিলেন এবং উহা অবলম্বনে স্বীয় সঙ্গীতের মূল সূত্র রচনা করেন। এক কথায়, ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে ভারতীয় প্রভাব সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

মিশর ও ব্যাবিলনের সভ্যতা, যাহা সাত হইতে দশ হাজার বৎসর প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়, ভারতীয় সভ্যতা হইতে উদ্ভূত। সংস্কৃত পশু শব্দ হইতে লাটিন পেকাশ ও ইংরাজী পিকিউনিয়ারী শব্দ উৎপন্ন। প্রাচীন পাশ্চাত্যে সম্পদকে Pacu (পশু) বলিত। ইস্থমাস যোজক দিয়া এশিয়া হইতে ইউরোপ গমনের মধ্যে পণ্টাস (সংস্কৃত পন্থ, ইংরাজি high way) দেশ ছিল রাজপথ। বৈদিক আর্য্য ও ইরাণীদের মধ্যে যুদ্ধই মূলতঃ বেদের দেবাসুর সংগ্রাম। আর্য্য ভাষা-ভাষী উত্তর আফ্রিকা হইতে আগত আইবিরিয়ানগণ এবং কনস্ট্যাড্‌সগণই ইউরোপের আদিম নিবাসী। তাহাদের উপর এশিয়ার অসভ্য তুরাণীদের গভীর ছাপ ছিল। ইউরোপীয় লিগুরিয়ানগণ এশিয়াবাসীদের সদৃশ। তুরাণীদিগকে কেল্ট বলিত। কেল্টগণ ইউরোপের সর্ব দেশের পূর্বপুরুষ। পারস্যবাসিগণ সপ্তসিন্ধুর মমতা ছাড়িতে পারে নাই। তাহাদের রাজা খসরু নাশরবান তাঁহার চিকিৎসক বারজোইকে ভারতে পাঠান সংস্কৃত গ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র'কে পহলবী ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য। রিজ ডেভিড্‌স বলেন, সংস্কৃত সৎ, ইংরাজি সুদ ও লাটিন সন এক শব্দ। প্লেটো যে সিংহচর্ম-পরিহিত ব্যাঘ্রের গল্প বলিয়াছেন তাহা ভারতীয়। মোক্ষমুলার বলেন, "ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, দেনমার্ক, সুইডেন ও রাশিয়াতে ভারতের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ দেখা যায়।" জার্মান ভাষায় সর্বোত্তম কবিতা Wei Sheit des-Brahmanen রুকার্ট রচিত। ইহার অর্থ ব্রাহ্মণদের প্রভাব। ভারতের শতদ্রু, তিন্নভেলি, বিতস্তা ও ব্রোচ গ্রীসের জরাদ্রাস, তাপ্রোবেন, হাইডাসপেস ও বার্ণগাজা নামে প্রচলিত।

স্ট্রাবোর বিবরণে আছে, আলেকজান্দ্রিয়ার নাগরিকগণ ভারতে পণ্যদ্রব্য লইতে আসিত। স্ট্রাবো বলেন, আগস্টাসের রাজত্বে মিয়শ হারমোশ বন্দর হইতে প্রায় ১২০ জন বণিক বাণিজ্যার্থ ভারতে যাত্রা করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে Periplus নামক একটী পুস্তক প্রকাশিত হয়। উহাতে আছে, গ্রীকগণ ও রোমানগণ 'পশ্চিম

ভারতের সহিত বাণিজ্য স্থাপন করিত এবং দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যরাজ্যে বাস করিত। সংস্কৃত বিদ ধাতু হইতে বেদ নিষ্পন্ন। সংস্কৃত বিদ্ ধাতুই এ্যাংলো স্যাক্সন উইতান = ইংরাজি উইত বা উইসডম = লাটিন বিদ্ এশ। আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমনের পূর্বেই ভারতীয় প্রভাব ইউরোপে উপস্থিত হয়। উক্ত সম্রাটের প্রবুদ্ধ শিক্ষক তাঁহাকে একটী ভারতীয় দার্শনিক আনিতে অনুরোধ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াশিংটন প্রণীত এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস হইতে প্রকাশিত Commerce Between India and Roman Empire পুস্তকে আছে, "রাজা পুরু গ্রীক ভাষায় লিখিত পত্র সহ এক দূত গ্রীসে প্রেরণ করেন। তৎসহ এক বৌদ্ধ শ্রমণ গ্রীসে প্রেরিত হয়। উক্ত শ্রমণ এথেন্স নগরে এক জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করেন।" আলেকজাণ্ডার ভারতে আসিয়া নগ্ন যোগী বা জিম্‌নোসফিষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গ্রীসে যাইতে অনুরুদ্ধ হইয়া কোন যোগী অনিচ্ছা প্রকাশ করায় গ্রীক সম্রাট তাহাকে ভয় দেখাইয়া বলেন, "যদি তুমি গ্রীসে না যাও এই অসি দিয়া তোমাকে হত্যা করিব।" উক্ত যোগী সম্রাটের দম্ভোক্তি শ্রবণে উপহাস সূচক মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর দিলেন, "তুমি এত বড় মিথ্যা কথা জীবনে আর বল নাই। আমি অজর, অমর আত্মা; আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। কে আমাকে বিনাশ করিতে পারে?" এই বলিয়া জ্ঞানী নীরব হইলেন। আমাদের নেতি নেতি, হইতে তাহাদের নেসিও নেসিও উৎপন্ন। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশর, ব্যাবিলন, সিরিয়া, আরব, ফিনিসিয়া, চীন, একেসিয়া প্রভৃতি দেশের ছাত্রগণ বিদ্যালাভার্থ আসিতেন। বিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া নগরস্থ লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ এরাটোস্থিনিশ ভারতজ্ঞ ছিলেন।

মধ্য আমেরিকাতেও ভারতীয় ভাবধারা প্রচারিত হয়। হিন্দু পুরাণে যে পাতাল শব্দ পাওয়া যায় তাহা প্রাগৈতিহাসিক আমেরিকাকে নির্দেশ করে। জার্মাণ মনীষী হামবোল্ড বলেন যে, হিন্দু প্রথা ও রীতি আমেরিকায় প্রবল ছিল, যখন ইউরোপীয়গণ তথায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। মেক্সিকোতে হিন্দু দেবতা গণেশের ধাতুমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা

হইতে অনুমিত হয়, মেক্সিকোতে গণেশ পূজা প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্যের সহিত দক্ষিণ আমেরিকার মায়া সভ্যতার সাদৃশ্য আছে। মায়া জাতির পূর্বে শূন্য (০) আবিষ্কৃত হয়। ইলিয়ট স্মিথ্ বলেন, "মায়া জাতি শূন্যের উপর গুরুত্ব অরোপ করে বলিয়া মনে হয়, আমেরিকা ভারতের নিকট ঋণী।" মধ্য আমেরিকার কোপান সহরে ভারতীয় হস্তীর একটি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। স্যার উইলিয়াম জোন্স বলেন, "দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন পেরুবাসিগণ সূর্য্যোপাসক ছিলেন এবং সূর্য বংশের বংশধর বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহাদের উৎকৃষ্ট উৎসব রাম সীতোয়া নামে অভিহিত। সম্ভবতঃ ইহা ভারতের রামনবমী উৎসব।" পোকক সাহেব বলেন, "পেরু দেশের পূর্বপুরুষগণ ভারতীয়দের সহিত সংযুক্ত ছিলেন।" ইহা আদৌ আশ্চর্য নহে যে, রামায়ণের কাহিনী পেরুবাসীদের মধ্যে প্রচলিত হইবে। শ্রীচমনলাল তৎপ্রণীত 'হিন্দু আমেরিকা' নামক ইংরাজী গ্রন্থে বলেন, "এই সকল আমেরিকানদের চারি হিন্দু যুগে বিশ্বাস আছে। তাহাদের গুরুকুল শিক্ষাপ্রথা, পঞ্চায়েৎ পদ্ধতি, ইন্দ্র ও গণেশ ও অন্যান্য হিন্দু দেবতার পূজা, হিন্দু নৃত্য অভ্যাস, জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু এবং সতীপ্রথা ইত্যাদি প্রমাণিত করে যে, হিন্দুগণই আমেরিকার প্রথম আবিষ্কারক।"

হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বেও আরবে ভারতের প্রভাব প্রকটিত ছিল। তখন বহু হিন্দু, প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগণ, তথায় প্রবাসী ছিলেন। তাঁহারা তথায় শিবপূজা ও অন্যান্য হিন্দুধর্ম অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের শিব 'মক্কেশ' নামে অভিহিত ছিলেন। মক্কা নামটি মক্কেশ হইতে উৎপন্ন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ যবনাচার্য উক্ত কোন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল ব্রাহ্মণের নিকট আরবীয়গণ গণিত, জ্যোতিষ, বীজগণিত ও দশমিক প্রণালী শিক্ষা করেন। মধ্য এশিয়ার ভারতীয় ভাবধারা কিরূপে প্রভাব বিস্তার করে তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে জানা যায়। মধ্য এশিয়ার খামিয়ন, ব্যাকট্রিয়া, খোটান, মিরাণ, কুচার, তুরফান এবং তুনহুয়াং প্রভৃতি শহরে ব্যাপক ভারতীয় প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

তুর্কীস্থানে যে সকল বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিশাল অংশ। ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা যে, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর হইতে অসংখ্য ভারতীয় তারিম নদীর অববাহিকায় উপনিবেশ স্থাপন এবং বহু শহর নির্মাণ করেন। তাঁহারা তথায় বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় শতাব্দীর পর হইতে অনেক শতক ধরিয়া প্রচার করেন। খোটান এবং তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে বহু বৌদ্ধ মঠ, স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। কথিত হয় যে, খোটান শব্দটি সংস্কৃত গো-দান শব্দ হইতে উৎপন্ন। গোদান=গাভীদান শব্দ প্রমাণ করে যে, উক্ত দেশে ব্রাহ্মণ প্রভাব বিস্তৃত ছিল। বিরোচন নামক এক কাশ্মীরী সাধু তথায় যাইয়া প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। ক্রমশঃ খোটান একটী এসিয়া-প্রসিদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হয়। তথায় গোতমী বিহার মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের একটী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছাত্রগণ গোতমী বিহারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। উহার চ্যান্সেলার বুদ্ধ সেন ভারত হইতে সমাগত। উত্তর-পশ্চিম ভারতের তৎকালীন কথ্য ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভারতীয় সংস্কৃতির ঐ সকল প্রচারকেন্দ্রে প্রচলিত ছিল। উল্লিখিত অঞ্চলের অধিকাংশ স্থলে গুপ্ত ও খরোষ্ট্রি লিপি প্রধানতঃ প্রচলিত ছিল। ভারতীয় কারুকার্য্য, শিল্পকলা ও অজন্তার প্রভাব তথায় পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন প্রাচীর-শিল্পে জাতক কাহিনী বর্ণিত। ভারতীয় ইতিহাসের কুশনরাজত্বে যে লিপি প্রচলিত ছিল তাহাতে তালপাতায় লিখিত পাণ্ডু-লিপিতে অশ্বঘোষের নাটক পাওয়া যায়। আর এক পাণ্ডুলিপিতে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত সমগ্র 'ধর্মপদ' দৃষ্ট হয়। শ্রীশিশির কুমার মিত্র তৎপ্রণীত India's Cultural Empire নামক তথ্যপূর্ণ পুস্তকে সত্যই বলিয়াছেন, "মধ্য এসিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির একটী মূল কেন্দ্র ছিল। সুতরাং ইহাকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের একটী প্রধান অংশ বলা যায়।"

ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী আলেকজান্দ্রিয়া নগর এবং পারস্য ও এসিয়া মাইনর দেশদ্বয়—এই স্থানত্রয়ে প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ

মিলিত হইয়া ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা করিতেন। জার্মান মনীষী গার্বে বলেন, "গ্রীক দর্শনের পিতা থেলসের মতে জল হইতে বিশ্ব জাত। এনাক্সিমেণ্ডার বলেন, আদি ভূত জল নয়, অনন্ত বায়ুমণ্ডল। তৎশিষ্য এ্যানাক্সিমেনসের মতে বায়ুই সৃষ্টির মূলীভূত উপাদান। মূলতঃ এই সকল বৈদিক সিদ্ধান্ত গ্রীক দার্শনিকগণ দার্শনিক অধ্যয়নের তীর্থযাত্রায় যাইয়া পারস্যে শিক্ষা করেন।" ঐতিহাসিক রলিনসন বলেন, "চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সিরিয়া ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে গ্রীকগণ ভারত দর্শনে আসিতেন।" হেরাক্লিটাসের মতে সর্বভূত অগ্নিজাত হয় এবং অন্তে অগ্নিতে প্রত্যাগত হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপে বর্ণিত। গার্বে বলেন, সাংখ্য দর্শনের সহিত হেরাক্লিটাসের সাদৃশ্য আছে। এম্পিডোকল্স কর্তৃক জড় বস্তুর চিরন্তনত্ব ও অবিনাশিত্ব স্বীকৃত। উক্ত মত সাংখ্য দর্শনোক্ত সৎকার্য্যবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। জেনোফেনিস ইলিয়াটিক দর্শনের জনক। তাঁহার মতে ঈশ্বর ও জগৎ এক, নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-রচয়িতা আর্ডমান বলেন, "ইলিয়াটিক দর্শনকে গ্রীক দর্শনের মতবাদ না বলিয়া ভারতীয় দর্শনের প্রতিধ্বনি বলাই যুক্তিসঙ্গত।" পাইথাগোরাসের সহিত ভারতের সংযোগ ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। পাইথাগোরাস খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত এবং বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। হিন্দু প্রবাদ আছে, পৃথ্বী-গুরু নামক হিন্দু যোগী গ্রীসে যাইয়া ভারতীয় দর্শন প্রচার করেন এবং তিনিই পরে পিথাগোরাস নামে অভিহিত হন। আমরা এই প্রবাদ বিশ্বাস না করিলেও ইহা অবিশ্বাস করিতে পারি না যে, পিথাগোরাস ভারতে না হইলেও পারস্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসেন। তৎপ্রচারিত পুনর্জন্মবাদ নিঃসন্দেহে ভারতীয়। তন্নামে সংযুক্ত ইউক্লিডিয় জ্যামিতির প্রসিদ্ধ ৪৭ উপপাদ্য প্রতিজ্ঞা বোধায়নের 'শুল্ব সূত্রে' উল্লিখিত। সাংখ্য দর্শন ও পাইথাগোরাসের মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য প্রথমে উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক লক্ষিত হয়। জোন্সের মতে পাইথাগোরাসের সংখ্যার উপর প্রবল নজর তাঁহার ভারতীয় প্রেরণা প্রমাণিত করে। কোলব্রুক ও শ্রেডার দেখাইয়াছেন যে, পিথাগোরাস দর্শন ভারতে উদ্ভূত।

গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তৎশিষ্য প্লেটো ভারতীয় প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। একদা প্লেটো এশিয়ার দেশসমুহে সাংস্কৃতিক পর্য্যটনে বহির্গত হন। কথিত আছে, তিনি পারস্য দেশও দর্শন করেন এবং একমতে তিনি ভারতেও কিছু দিন ছিলেন। তাঁহার পুনর্জন্মবাদ এবং আত্মার জন্ম ও মৃত্যু সাংখ্য দর্শনের প্রতিধ্বনি। হপকিন্স বলেন, "প্লেটো সাংখ্য ভাবে পূর্ণ। তবে তিনি পিথাগোরাসের মাধ্যমে সাংখ্য দর্শন প্রাপ্ত হন।" কঠ উপনিষদে যেমন আছে তেমনি প্লেটো বলেন, "দেহ-রথ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসমূহ দ্বারা চালিত হয়।" ই. জে. আরউইক তাঁহার Message of Plato গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, প্লেটো তাঁহার প্রসিদ্ধ 'রিপাবলিক' গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদয় ভারতীয় ভাবধারার পুনরাবৃত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রিপাবলিকের সপ্তম খণ্ডে যে গুহার উপমা আছে তাহা দ্বারা বেদান্তের মায়াবাদ সমর্থিত। গ্রীসে অরফীয় প্রবাদ আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের সন্তান ফেনিশ গলাধঃকৃত হইবার পর জিউসের দেহে বিশ্ব সৃষ্ট হয়। মনু সংহিতার দশম অধ্যায়ে উক্তরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত। ঐতিহাসিক রলিনসন বলেন, "এই সকল সাদৃশ্যকে আকস্মিক বলা অযৌক্তিক।" মোক্ষমুলারের মতে উপনিষৎ ও প্লেটোর ভাবের মধ্যে সাদৃশ্য কখনো কখনো আশ্চর্য্যজনক। সুতরাং গ্রীক জগৎ নিশ্চয়ই প্রাচীন ভারত কর্তৃক গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষ ভাগে টোলেমিদের রাজত্ব কালে আলেকজান্দ্রিয়া সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তথায় ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি অধ্যাপনা ও প্রচার করিতেন। প্লিনি তাঁহার Natural History (প্রাকৃতিক ইতিহাস) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশরে অসংখ্য বৌদ্ধ অধিবাসী ছিলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ার নস্টিক ভাবধারা বৌদ্ধ ধর্ম কর্তৃক প্রভাবিত।" মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম আলেকজান্দ্রিয়ার চিন্তারাশির উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস 'মহাবংশ' নামক পুস্তকে আছে,

"যবন দেশের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া সহর হইতে প্রায় ত্রিশ হাজার যবন এক বিখ্যাত চৈত্য নির্মাণকালে সিংহলে আসেন এবং অশোক মহারক্ষিত নামক শ্রমণকে ধর্মপ্রচারার্থ গ্রীসে পাঠান। ফ্রেডরিক খ্রীষ্টান বাউর বলেন, "একদল নস্টিকের মতে মানুষসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা নিশ্চয়ই সাংখ্য ত্রিগুণ অনুসারে হইয়াছিল।" আলেকজান্দ্রিয় দার্শনিক ফাইলো, যিনি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে আবির্ভূত হন, ভারতীয় নগ্ন যোগীদিগকে জানিতেন। তিনি লোগসবাদের প্রসিদ্ধ প্রবর্তক। ঋগ্বেদীয় বাক্ ও খ্রীষ্টান লোগস অভিন্ন। আমোনিয়াস সাক্কাস আর এক আলেকজান্দ্রিয় দার্শনিক, যিনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আবির্ভূত হন। তিনি ভারতাদি সুদূর দেশের ধর্ম-প্রচারকদের সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি কঠোর নৈতিক জীবন যাপন করেন এবং ভারতীয় যোগীদের নিকট জ্ঞান লাভার্থ প্লটিনাশকে প্রেরণা দেন। আর্ডমান বলেন, "ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা প্লটিনাশের হৃদয়ে বলবতী ছিল। কিন্তু তাঁহার যে সামান্য জীবনী পাওয়া গিয়াছে উহাতে তাহা উল্লিখিত নাই। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি ভারতীয় বেদান্তের ভাবে অভিভূত ছিলেন।" তিনি স্বীয় গুরু আমোনিয়াসের মত তপস্বীর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। নিয়মিত ধ্যানাভ্যাসের ফলে হিন্দু যোগীর মত তাঁহার সমাধি হইত। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখন আমি আমার জীবাত্মাকে পরমাত্মায় একীভূত করিতে চাই।" ইহা কি ভারতীয় বৈদান্তিকের উক্তি বলিয়া মনে হয় না? গার্বে বিশ্বাস করেন যে, প্লটিনাশের উপর ভারতীয় প্রভাব নিঃসন্দেহে পড়িয়াছিল। ইংরাজ মনীষী বোসাঙ্কে "প্লটিনাশের দর্শন" নামক যে গ্রন্থ দুই খণ্ডে লিখিয়াছেন তাহা পড়িলে বোঝা যায়, বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ দর্শন তাঁহাকে কত গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।"

প্লটিনাশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন পরফাইরি। ইনি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে আবির্ভূত এবং স্বীয় গুরু অপেক্ষাও ভারতীয় দর্শনে অধিকতর অনুরক্ত। তাঁহার সমসাময়িক বিখ্যাত ব্যাবিলনীয় নস্টিক শিক্ষক

বার্দিসেনিস রচিত ভারত সম্বন্ধে পুস্তক পাঠে তাঁহার ভারত-প্রেম বর্দ্ধিত হয়। সম্রাট আণ্টোনিয়াস পায়াসের দরবারে প্রেরিত ভারতীয় রাজদূতদের নিকট হইতে তিনি ভারত-তথ্য অবগত হন। বার্দিসেনিস রচিত পুস্তকের একাংশ পরফাইরী কর্তৃক অত্যাপি কোন গ্রন্থে রক্ষিত আছে। ইহাতে আছে, ব্রাহ্মণগণ এবং বৌদ্ধগণের আচার-ব্যবহার ও বৌদ্ধ মঠের জীবনযাত্রার বর্ণনা। পশ্চিম ভারতে কোন গুহা-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিরাট শিবমূর্তি দর্শনের ইতিবৃত্তও ইহাতে পাওয়া যায়। পরফাইরি প্রাণীহত্যা ও ধর্মার্থে যজ্ঞানুষ্ঠান বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্য মনে হয়, তিনি বৌদ্ধ ভাবে ভাবিত ছিলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে বৌদ্ধ ধর্ম অতিশয় কার্য্যকরী হয়। বুদ্ধের নাম তাঁহার পরিনির্বাণের পরে প্রথম শতকেই ব্যাকৃট্রিয়াতে উপস্থিত হয়। মোক্ষমুলার বলেন, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে ব্যাকৃট্রিয়াতে বৌদ্ধগণের উপস্থিতি কতিপয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত। ডি. এ. ম্যাকেঞ্জি তৎপ্রণীত Buddhism in Pre-Christian Britain গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব ব্রিটেনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল। বৌদ্ধ মৈত্রী বা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্রাট অশোক—যিনি ছিলেন ইতিহাসের প্রথম আন্তর্জাতিক ব্যক্তি—সিরিয়া, মিশর, সিরিন, এপিরাস ও ম্যাসিডোনিয়া দেশে শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণ করেন। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশত্রয়ের বহু দেশে তৎপ্রেরিত বৌদ্ধ শ্রমণগণ যাইয়া নিবাস ও প্রচার করেন। তৎভ্রাতা মহেন্দ্র ও তৎকন্যা সংঘমিত্রা কর্তৃক সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ার মনীষী ক্লিমেণ্টের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম সুবিদিত ছিল। আলেকজান্দ্রিয়াতে বৌদ্ধগণের উপস্থিতি তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন এবং বলেন, "গ্রীকগণ বর্বরদের নিকট হইতে তাহাদের দর্শন চুরী করিয়া লয়।" তিনিই প্রথম গ্রীক, যিনি বুদ্ধের নাম উল্লেখ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার থেরাপিউটিসগণ এবং প্যালেষ্টাইনের এসেনগণ, যাঁহারা গ্রীক জগতে সুপরিচিত ছিলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষু ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। তাঁহারা পাশ্চাত্যে বৌদ্ধ নীতি এবং ধর্ম সাধন ও

প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। পালি শব্দ থেরাপুত্রের গ্রীক অপভ্রংশ থেরাপিউটিস, অর্থাৎ বৌদ্ধ শিষ্য। গ্রীষ্টান ইতিহাসিক মাহাফি বলেন, "এই সকল বৌদ্ধ প্রচারক জিশু গ্রীষ্টের অগ্রদূত ছিলেন।" শেলিং ও সোপেনহাওয়ার প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণ এবং ডিন ম্যান্সেল ও ডি. মিলম্যান প্রভৃতি গ্রীষ্টান মনীষীগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, বিশেষতঃ অশোকের রাজত্ব-কালে ভারত হইতে আগত বৌদ্ধ প্রচারকগণের প্রভাবে এসেন ও থেরাপিউটিস সংঘ সৃষ্ট হয়।

গ্রীষ্টান ধর্মের উপর বৌদ্ধ প্রভাব সুগভীর। বালফোর তাঁহার Indian Cyclopœdia নামক পুস্তকে বলেন, "গ্রীষ্টান গির্জাসমূহে প্রচলিত গ্রেগরিয়ান সঙ্গীত বৌদ্ধ সঙ্গীতের অনুকরণ।" বৌদ্ধ জাতকের গল্প অনুকরণে বাইবেলে গল্প রচনা প্রচলিত। ইংরাজ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন, "গৌতমের উপদেশের নিকট গ্রীষ্টান ধর্মের কোন কোন অংশ ঋণী।" উইণ্টারনিজ বিশ্বাস করেন, "ইহুদী ও গ্রীক ভাবধারাদ্বয়ের সংমিশ্রণে গ্রীষ্টান গস্পেলের বাণী উৎপন্ন। উহাতে বৌদ্ধ ভাব ও গল্পের কিঞ্চিৎ প্রভাবও অনুমেয়। বাইবেলের এ্যাপোক্রাইফাল গস্পেলে বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ঋণ-গ্রহণ দেখা যায়।" বাইবেলে গ্রীষ্ট-জীবনী রচনায় বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ 'ললিত বিস্তার' এর প্রভাব পড়িয়াছে। বৌদ্ধ জাতক ও বাইবেলোক্ত আখ্যায়িকাসমূহের সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। ভক্ত শিষ্যের সলিলোপরি গমন জাতকে ও বাইবেলে দেখিয়া মোক্ষমূলার মন্তব্য করেন, "উভয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক সংযোগ ও আদান প্রদান নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল। কারণ, জাতক গস্পেল অপেক্ষা বহু শতক প্রাচীনতর।" বাইবেলোক্ত নষ্ট পুত্রের গল্পটী প্রায় একই আকারে বৌদ্ধ গ্রন্থ 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরীকে' পাওয়া যায়। রুশীয় আবিষ্কারক লুটোভিচ তিব্বতের কোন বৌদ্ধ মঠে এক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। তদবলম্বনে তিনি The Unknown Life of Jesus Christ (জীশুগ্রীষ্টের অজ্ঞাত জীবন) নামক পুস্তক লিখিয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ তিব্বত ভ্রমণকালে উক্ত মঠ পরিদর্শন ও উক্ত পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করেন। জেরুজালেম

হইতে জিশুখ্রীষ্টের বার বৎসর অনুপস্থিতির বিবরণ লুটোভিচের পুস্তকে পাওয়া যায়। লুটোভিচ বলেন, "ঐকালে খ্রীষ্ট উত্তর ভারত ভ্রমণ এবং তথায় প্রধান প্রধান ভারতীয় সহর ও সন্ত দর্শন করেন।" স্বামী বিবেকানন্দ ভূমধ্য সাগরে জাহাজে নৈশ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, ক্রীট দ্বীপস্থ থেরাপুত্র সম্প্রদায় হইতে খ্রীষ্টান ধর্মের উৎপত্তি। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্রীট দ্বীপে বৌদ্ধ শ্রমণগণ ধর্মপ্রচারার্থ প্রেরিত হন।

এশিয়া মহাদেশের প্রায় সমস্ত দেশেই ভারতীয় প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। চীনের সহিত ভারতের সংযোগ অতি প্রাচীন। চৈনিক ঋষি লাউৎজের উপদেশে উপনিষদের প্রভাব সুস্পষ্ট। চীনা গ্রন্থে আছে যে, লাউৎজে স্বদেশ হইতে অদৃশ্য হইয়া ভারতে যোগ শিক্ষার্থ আসেন। চীনাগণকে মনুসংহিতা 'পতিত ক্ষত্রিয়' বলেন। মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে আসামের রাজা ভগদত্ত অস্ত্র ধারণ করেন এবং চীনাগণ ভগদত্তের মিত্র পক্ষ ছিলেন। শক্তিমঙ্গল তন্ত্রমতে মহাচীন বৃহত্তর ভারতের এক অংশ রথ-ক্রান্তার অন্তর্গত। চীন দেশীয় তাও-ধর্মে যে শক্তিবাদ প্রচলিত তাহা ভারত হইতে গৃহীত। ঐতিহাসিক যুগে চীনের সহিত ভারতের প্রথম সংযোগ হয় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের ৬০ অব্দে। উক্ত সালে চৈনিক সম্রাট মিং-তি বুদ্ধদেবকে স্বপ্নে দর্শন করেন। স্বপ্ন দর্শনান্তে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহার্থ একদল রাজদূত ভারতে পাঠাইলেন। তখন হইতে ভারত ও চীনের মধ্যে পণ্ডিতগণ ও প্রচারকবৃন্দের গমনাগমন আরম্ভ হয়। এইরূপে পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশদ্বয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। ভারতীয় পণ্ডিত কাশ্যপ মাতঙ্গ এবং ধর্মরক্ষ প্রথমে চীনে গমন করেন এবং তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার্থ যে প্রথম বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা তিন শত বৎসর ধরিয়া চীনও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মূলকেন্দ্র হয়। পরে চীনে বহু বৌদ্ধ মঠ স্থাপিত হয় এবং তৎসমুদয়ে ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। চীনে যে সকল প্যাগোডা দেখা যায় তাহাতে ভারতীয় কারুকার্য্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। হ্যানকিংএর নিকটবর্তী

ছু-সিয়া তুং গুহাসমূহে এবং প্রসিদ্ধ কাইফং প্যাগোডাতে যে সকল মানুষের চিত্র দেখা যায় তাঁহারা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয়। বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু উল্লিখিত মন্দিরসমূহ পরিদর্শনান্তে মন্তব্য করিয়াছেন যে, উহারা নিশ্চয়ই বাঙ্গালী। পেকিংএ উ-তা-স্থ মন্দিরে বাংলা হরফে তান্ত্রিক মন্ত্রাবলী ক্ষোদিত আছে। উক্ত মন্দির বাংলার পঞ্চরত্ন মন্দিরবৎ কারুকার্য্যসম্পন্ন।

চতুর্থ শতকের মধ্য ভাগে চীন কর্তৃক কোরিয়া বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়। কোরিয়ার অন্যতম প্রাচীন সহর সিলাতে অবস্থিত একটী মন্দিরে ভারতীয় কারুকার্য্য দেখা যায়। কোরিয়ার কোন রাজা কর্তৃক এক কৃষ্ণবর্ণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর স্মৃতি-রক্ষার্থ উক্ত মন্দির নির্মিত হয়। তিনি ৫৩৮ খ্রীঃ জাপান দরবারে একটী বুদ্ধ-মূর্তি ও বৌদ্ধ গ্রন্থ কয়েকটী উপহার দেন। উল্লিখিত উপহারের সহিত এই বাণীও প্রেরিত হয় যে, বুদ্ধ-ধর্ম সর্বোত্তম এবং ইহা বিশ্বাসিগণের অপরিমিত কল্যাণ সাধন করে এবং ভারত ও কোরিয়ার মধ্যবর্তী সর্ব দেশে উক্ত ধর্ম গৃহীত। ক্রমশঃ জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। অষ্টম শতকে জাপান সম্রাট শোমু বৌদ্ধ ত্রিরত্নের দাস বলিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। উক্ত সম্রাট নারা নামক স্থানে যে বিরাট পিত্তল বুদ্ধ-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন তাহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। সেই কালে জাপানে হরিয়ুজী মন্দিরে অজন্তার অনুকরণে চিত্রাদি অঙ্কিত হয়। বিশেষজ্ঞের মতে প্রাচীন জাপানের বুগাকু বা নৃত্য-সঙ্গীত চীনা ও ভারতীয় সঙ্গীতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। জাপানের জন-প্রিয় সঙ্গীত-যন্ত্র 'বিয়া' ভারতীয় 'বীণা' হইতে প্রস্তুত। অনেক ভারতীয় ব্রাহ্মণ জাপানে নিমন্ত্রিত হইয়া ধর্মপ্রচারার্থ গমন করেন।

পঞ্চম শতকের মধ্য ভাগে তিব্বতের রাজার সহিত নেপালী রাজকুমারীর বিবাহ হয়। উক্ত রাজকুমারী নেপাল হইতে অনেক ভারতীয় দেব-দেবী লইয়া যান। পরবর্তী যুগে ত্যাং সম্রাটের কন্যা কর্তৃক তিব্বতে বহু বৌদ্ধ দেবতা আনীত হয়। এইরূপে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ করে। অষ্টম

শতকে শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব নামে দুই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তিব্বতে গমন করেন। বাংলার বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সাধক এবং বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া তিব্বতে গমন এবং বৌদ্ধ তন্ত্র অধ্যয়নার্থ একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অদ্যাপিও তিব্বতের বহু মঠে বুদ্ধের পরেই দীপঙ্কর পূজিত হন।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বাঙ্গালী রাজকুমার সিংহলে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারে লঙ্কার নাম সিংহল হয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্র কর্তৃক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। অনুরাধাপুরে মহেন্দ্রের প্রস্তর মূর্তি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শ্রমণ বুদ্ধ ঘোষ, যাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্মের শংকরাচার্য্য বলা হয়, পঞ্চম শতকের মধ্য ভাগে সিংহলে গমন এবং হীনযানের পালি গ্রন্থ সম্পাদন ও টীকা প্রণয়ন করেন। পঞ্চম শতকের শেষ ভাগে সিংহলের সিগিরিয়াতে অজন্তার মত চিত্রাদি অঙ্কিত হয়। একাদশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতের চোল রাজাগণ সিংহল অধিকার করেন। তাঁহারা পোলানারুয়া নামক স্থানে অনেক হিন্দু মন্দির নির্মাণ করেন। তৎসমুদয় অদ্যাপি বর্তমান।

সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুসারে বর্মার সংস্কৃতি ও সভ্যতা মূলতঃ ভারতীয়। ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে একমত যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বর্মায় হিন্দু উপনিবেশ গঠিত হয়। সিংহলী বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে অশোকের প্রচারকগণ সুবর্ণভূমি বা নিম্ন বর্মা (ব্রহ্মদেশ) পর্যটন করেন। তৃতীয় শতকে মধ্য বর্মায় প্রায় এক লক্ষ বৌদ্ধ পরিবার দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েক হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ ছিলেন। প্রোম, পেগু, থাটন ও পাগান প্রভৃতি প্রাচীন সহরসমূহে আবিষ্কৃত লিখিত রেকর্ড হইতে জানা যায়, তৃতীয় হইতে দশম শতক পর্যন্ত সংস্কৃত এবং পালি ভাষা ও সাহিত্য এবং বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মমত বর্মায় প্রবল ছিল। মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম এবং শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম তথায় প্রভাব বিস্তার করে। প্রোম সহরের হিন্দু নাম ছিল শ্রীক্ষেত্র। অন্ধ্র দেশ হইতে অসংখ্য হিন্দু নরনারী

তথায় যাইয়া বাস করেন। বৈশালী নামে কাশীরাজকুমার আরাকানে যাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন। মনু, নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্মশাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া বর্মায় বৌদ্ধ 'ধম্মশথ' পালি ভাষায় রচিত হয়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন বর্মায় ব্যাপক ভাবে হইয়াছিল। বর্মায় শিল্প ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত। ডুরোইসেলের মতে পেগুর আনন্দ প্যাগোডা ভারতীয়গণ কর্তৃক নির্মিত।

প্রাচীন কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার নদী মেকংএর নাম মা গঙ্গা হইতে উৎপন্ন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে দক্ষিণ ভারতস্থ কাঞ্চির পল্লভ রাজধানী হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কৌণ্ডিণ্য কাম্বোজে গমন করেন। তিনি কাম্বোজ রাজবংশের এক কুমারীর সহিত বিবাহিত ও প্রজাবৃন্দ কর্তৃক রাজা রূপে নির্বাচিত হন। পঞ্চম শতকে রাজা শ্রুতবর্মন সমগ্র কাম্বোজকে ভারতীয় ভাবাপন্ন করেন। দক্ষিণ ভারতীয় পল্লভ অক্ষরে দুই ভাষায় লিখিত শিলালিপি হইতে জানা যায়. রামায়ণ, মহাভারত, বেদ ও পুরাণাদি কাম্বোজে প্রচলিত ছিল। কাম্বোজ রাজগণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ছিল কাম্বোজের রাজধর্ম ও প্রজাধর্ম। বৈষ্ণব ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষা শৈব ধর্মই তথায় অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। একাধারে শিব-বিষ্ণুর মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়। সমাজ গঠনে হিন্দু জাতি-প্রথা কার্য্যকরী ছিল এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন হইত। ভারতীয় রাজকুমারগণের ন্যায় কাম্বোজ রাজকুমারগণও বাল্যে বর্মা গুরুগণের নিকট শিক্ষালাভ করিতেন। কাম্বোজে বহু আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, যথায় ব্রাহ্মণ সাধকগণ অধ্যক্ষতা করিতেন। কাম্বোজের প্রাচীন মন্দিরসমূহ ভারতের গুপ্ত মন্দির-সমূহের সমতুল্য। গ্রসলিয়ার সাহেবের মতে কাম্বোজের বহু মন্দির ও মূর্তি ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ কর্তৃক আনীত শিল্পীগণ দ্বারা নির্মিত। অনেক মন্দিরের গাত্রে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী চিত্রিত আছে। কাম্বোজের বৃহত্তম মন্দির আঙ্গোরভাট রাজা দ্বিতীয় সূর্য্যবর্মা কর্তৃক দ্বাদশ শতকে নির্মিত।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে শ্যামে ভারতীয় ভাব-গঙ্গা প্রবাহিত হয়। উক্ত দেশে গুপ্ত যুগের আদর্শে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়। পেচাবুনের নিকট মুং-সি-টেপে চতুর্থ শতকে ক্ষোদিত সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। শ্যামের নানা স্থানে পিত্তল মূর্তি আবিষ্কৃত। পংতুকে যে পিতল বুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে দ্বিতীয় শতকের অমরাবতী শিল্প রূপায়িত। শ্যাম দেশের মন্দিরসমূহে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শিল্প মিশ্রিত। একাদশ শতকের য়ুনান ঘণ্টাদ্বয়ে চীনা ও সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি দেখা যায়। হ্যানচাও নরপতির উপাধি ছিল মহারাজা। তাঁহার আর একটী উপাধি ছিল, যাহার অর্থ প্রাচ্যরাজ। শ্যামীয় ধর্মগ্রন্থ ও মন্দির শিল্পে বিশ্ব-কেন্দ্র-রূপে মেরু-শৃঙ্গের নাম উল্লিখিত। উহা প্রধানতঃ হিন্দু প্রথা। ব্যাঙ্ককের রাজমন্দিরসমূহের গাত্রে রামায়ণ কাহিনী চিত্রিত। ভারতে বসন্ত ঋতুতে যে দোলোৎসব হয় তাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে বর্তমান শ্যামেও অনুষ্ঠিত হয়।

আন্নামের বর্তমান প্রদেশ চম্পাতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব এখনও প্রবল। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় দশকে চম্পাতে ভারতীয় ভাব-স্রোত প্রবিষ্ট হয়। যে সকল রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের অনেকের হিন্দু নাম ছিল। স্থানীয় সাহিত্য ও শিলালিপি হইতে জানা যায়, তথায় ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ হিন্দু সমাজ স্থাপন করেন। উহার হিন্দু জাতি-প্রথা, সতীদাহ, বিবাহ-প্রণালী, নৃত্য-গীতাদি ভারত হইতে গৃহীত। চম্পাতে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষা ব্যাপক ভাবে অনুশীলিত এবং সরকারী দরবারে সংস্কৃতই রাজভাষারূপে প্রচলিত হয়। আবিষ্কৃত শতাধিক সংস্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায়, শুধু যে সংস্কৃত গ্রন্থাবলী ভারত হইতে চম্পাতে আনীত হয় তাহা নহে, অনেক নূতন সংস্কৃত পুস্তক তথায় রচিত হয়। রাজা ভদ্রবর্মণ, ইন্দ্রবর্মণ ও ইন্দ্রবর্মদেব বেদাদি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভারতীয় মহাকাব্যদ্বয় ও পুরাণসমূহ এবং মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থাবলী চম্পার জনপ্রিয় পাঠ্য পুস্তক ছিল। তথায় শৈব

ধর্মের প্রভাব প্রবল ছিল। বস্তুতঃ ভদ্রেশ্বর শিবই বহু শতাব্দী ধরিয়া জাতীয় দেবতারূপে চম্পায় পূজিত হন। বিষ্ণু, শক্তি ও মহাদেবীর পূজাও চলিত। হিন্দু প্রথার অনুকরণে কতিপয় নরপতি নিজদিগকে বিষ্ণুর অবতাররূপে ঘোষণা করেন। বৌদ্ধ ধর্মও চম্পায় সমান ভাবে প্রবল ছিল। কোন বিজয়ী চীনা সেনাপতি ১৩৫০ খানি বৌদ্ধ গ্রন্থ চম্পা হইতে চীনে লইয়া যান। দক্ষিণ ভারতের মামাল্লাপুরম্, কাঞ্চী ও বাদামিতে অবস্থিত মন্দিরসমূহের অনুকরণে চম্পার মন্দিরাদি নির্মিত।

মালয় দ্বীপপুঞ্জও ভারতীয় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান প্রদেশ। ভারতীয় প্রবাসিগণ এখনও তথায় 'ওরাঙ্গ ক্লিঙ্গ' নামে অভিহিত হন। উড়িষ্যাবাসিগণ কলিঙ্গ নামেই পরিচিত এবং কলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশই মালয়ের ক্লিঙ্গ শব্দ। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে উল্লিখিত দ্বীপপুঞ্জে উড়িষ্যা ও বেঙ্গীর কলিঙ্গ ও অন্ধ্রগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। আধুনিক সুমাত্রার পূর্ব নাম ছিল শ্রীবিজয়। উহা বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি সুখ্যাত কেন্দ্র ছিল। তথায় এক সহস্র ভিক্ষু মিলিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়নার্থ একটী বিশাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সুখ্যাতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে বিদ্যার্থী আকৃষ্ট করে। বাংলার বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর তথায় দর্শকরূপে উপস্থিত হন। তথায় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত আচার্য্য চন্দ্রকীর্তির সহিত দীপঙ্করের সাক্ষাৎ হয়। দীপাঙ্কর শ্রীবিজয়কে প্রাচ্যের বৌদ্ধ ধর্মের মূলকেন্দ্র বলিয়া ঘোষণা করেন। শোনা যায়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মপাল সুমাত্রায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

জাভা দ্বীপকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের একটী প্রধান উপনিবেশ বলা যাইতে পারে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কোন কলিঙ্গ রাজকুমার তথায় যাইয়া একটী হিন্দু রাজ্য স্থাপন ও হিন্দু ধর্ম প্রচার করেন। পরবর্তী কালে মধ্য জাভায় হোলিঙ্গ (বা কলিঙ্গ) নামে আর একটী হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। চতুর্থ শতকে যখন ফা-হিয়েন জাভা ভ্রমণ করেন তখন হিন্দু ধর্ম

তথায় প্রভাবশালী ছিল। কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মণ রাণী মাতাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের পথ সুগম করেন। জাভার শিল্প, সাহিত্য ও ভাষা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর ছাপ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। জাভার কবিতা, নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্য প্রধানতঃ ভারতীয়। জাভার শিল্পে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব অসীম। উল্লিখিত মহাকাব্যদ্বয়ের জাভা সংস্করণ পাওয়া যায়। প্রাচীন জাভা সাহিত্যে কয়েকখানি আয়ুর্বেদীয় ও বৈজ্ঞানিক পুস্তক অনূদিত হইয়াছিল। শিব, শক্তি, কার্তিক ও গণেশ প্রভৃতি দেবতা জাভায় পূজিত হইত। জাভা শিল্পে গরুড়-বাহন বিষ্ণু এবং তাঁহার দশাবতার চিত্রিত। পরবর্তী কালে জাভার ধর্ম-জীবনে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাব বিস্তার করে। জাভার শৈলেন্দ্র রাজাগণ ভারতীয় রাজশক্তির সহিত অতিশয় মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন। জাভার শিল্প ভারত-জাভা মিলনের শ্রেষ্ঠ ফল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গুপ্ত যুগের ভারতীয় মন্দির অনুকরণে জাভার ডিউগ উপত্যকায় যে সকল মন্দির নির্মিত হয় তাহাদের নামকরণ মহাভারতের বীর নর-নারীগণের নামানুসারে হইয়াছিল। উল্লিখিত মন্দিরসমূহে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রসিদ্ধ বরোবুদুর মন্দির মন্দির-শিল্পের সর্বোত্তম নিদর্শন। ফার্গুসন বলেন, জাভাস্থ বরোবুদুর ও অন্যান্য মন্দিরের কারিগর পূর্ব ভারত হইতে গিয়াছিল। বরোবুদুর ভাস্কর্যে বুদ্ধের জীবন ও জাতক গল্প বর্ণিত এবং জাভার বুদ্ধ মূর্তিসমূহে সূক্ষ্ম শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত।

বোর্ণিও দ্বীপেও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রভাবশালী হইয়াছিল। পঞ্চম শতকে ক্ষোদিত সংস্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণগণকে উক্ত দ্বীপে স্বর্ণ ও গাভী দান করা হইত। কথিত আছে, ব্রাহ্মণগণের আচার-অনুষ্ঠান রাজদরবারে সমাদৃত হইত এবং ব্রাহ্মণদের সংখ্যাও অধিক ছিল। শিব, গণেশ, নন্দী, অগস্ত্য, ব্রহ্মা ও মহাকালাদি দেবতাগণের মূর্তিও বোর্ণিওতে ভূমধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যে বালি দ্বীপের স্থান অতি উচ্চে। কারণ

উক্ত উপনিবেশে এখনও হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুরা মাত্রায় বিদ্যমান। উহাকে হিন্দু ভারতের একটি প্রদেশ বলিলেও চলে। ভারতের মত এখনও তথায় রামায়ণ ও মহাভারত শুনিতে শ্রোতৃবহুল সান্ধ্য সভা বসে। ভারত কর্তৃক সাক্ষাৎ ভাবেই বালি হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়। পরে জাভার অধীন হইয়া বালি আরো হিন্দু ভাবে ভাবিত হয়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হইতে জানা যায়, একদা দক্ষিণ ভারতের নরনারীগণ তথায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফিলিপিনো ভাষার হরফ অনেকাংশে দক্ষিণ ভারতীয় হরফের মত। বিশিষ্ট ফিলিপিনো বিচারপতি রমুয়াল ডেজ বলেন, "আমাদের কথ্য ভাষাসমূহ দ্রাবিড়ীয় পরিবারভুক্ত।" লুজান ও মানিলা উপসাগরের তীরবর্তী বহু স্থানের নাম সংস্কৃতের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। সালিবি বলেন, "লুজান ও মিন্দানাও স্থানদ্বয়ের পার্বত্য জাতিদের নিকট এখনও ভারতীয় ত্রিমূর্ত্তি এবং প্রাচীন বৈদিক দেবতাগণ পূজা পাইয়া থাকেন।" এটিনিও দে মানিলাতে রক্ষিত হিন্দু দেবতার মূর্তিটী কোন ডাচ প্রত্নতাত্ত্বিক কর্তৃক গণেশ-বিগ্রহ বলিয়া অনুমিত হয়। ক্রোইবারের মতে ফিলিফিনোদের অধিকাংশ আখ্যান ও কাহিনী ভারতীয়। প্রাচীন মুদ্রা ও হস্তনির্মিত দ্রব্যে এখনও হিন্দু প্রভাব সুস্পষ্ট। উল্লিখিত দ্বীপপুঞ্জে অধুনা যে সকল সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা প্রচলিত তৎসমুদয় ভারতীয় প্রথার সুসদৃশ। বেয়ার বলেন, "ভারত অতিশয় গভীর ভাবে ফিলিপাইন সভ্যতাকে প্রভাবিত করিয়াছে।"

ওসেনিয়াতে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জকে পলিনেশিয়া বলা হয়। উহাতে ভারতীয় প্রভাব কয়েক বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত অবিদিত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি. মিত্র পলিনেশিয়ার কতিপয় পণ্ডিতের সহযোগিতায় উক্ত সুদূর দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত উদ্ধার করেন। ঠিক কখন ভারতের সহিত উক্ত দ্বীপপুঞ্জের সংযোগ স্থাপিত হয় তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমাংশে উক্ত সংযোগ ঘটিয়াছিল। পার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জের নরনারী অপেক্ষা ভারতীয় আর্য্যগণের

সহিত পলিনেশিয়দের শারীরিক সাদৃশ্য অধিকতর বিরাজমান। ভারতের সাঁওতাল ও মুণ্ডাদি অসভ্য জাতির ভাষার সহিত পলিনেশীয় ভাষার নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়। পলিনেশিয়ার অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক প্রথা ইন্দোনেশিয়ার মাধ্যমে ভারত হইতে গৃহীত। তদ্দেশীয় শঙ্খ, নাক-বাঁশী ও অন্যান্য বাদ্য-যন্ত্র ভারতীয়। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হুল-নৃত্য এবং সেমোয়াদের শিব-নৃত্যের সহিত বাংলার লোক-নৃত্যের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। স্কিনার বলেন যে, পলিনেশিয়ার অনেক অলঙ্কার-শিল্প ভারত ও কম্বোজ হইতে আনীত। বিশেষজ্ঞগণের মতে পলিনেশিয়ার খাদ্যদ্রব্য ও গৃহপালিত পশু ভারতীয়। পলিনেশিয়ার পুরাতত্ত্বে হিন্দু পুরাণের ব্রহ্মাণ্ড ভাবটি এবং গীতোক্ত ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ সংসারের বর্ণনা পাওয়া যায়। ক্রেইগহিল হ্যাণ্ডি বলেন, "ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার সাংস্কৃতিক নিদর্শন রূপে পলিনেশিয়ার নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—হিন্দু জাতকর্ম, সান্ধ্যকৃত্য, মূর্তিপূজা, শিবলিঙ্গ, ধর্মানুষ্ঠান, পৌরহিত্য প্রথা, প্রাচীর-বেষ্টিত গুম্বজযুক্ত মন্দির এবং সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি ভারতীয়।

দিল্লীর সম্রাট শাজাহানের পুত্র দারা শিকো কাশী হইতে পণ্ডিত আনাইয়া পঞ্চাশখানি উপনিষৎ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহা হইতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যে নবযুগ আরম্ভ হইল। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ার উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ ( পাণ্ডুলিপি ) ফ্রান্সে লইয়া যান। তৎপরে কতিপয় ফরাসী প্রচারক ও জার্মান জেসুট উক্ত মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং বেদাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে একজন জার্মান জেসুট কর্তৃক একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী পণ্ডিত এ্যাঙ্কোয়েটিল ডুপেরন ফার্সী অনুবাদ অবলম্বনে উপনিষদের লাটিন অনুবাদ করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম ঔপনেখৎ। ইহার অল্প পূর্বেই ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপে চিন্তাধারার প্রসারতা ও উদারতা আসায় এশিয়ার দিকে ইউরোপের অধিক দৃষ্টি পড়িল। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপে এশিয়ার চিন্তাস্রোত প্রবল বেগে প্রবেশ করায় পাশ্চাত্যে নবযুগ আসিল। বিগত

সার্ধশতক ধরিয়া পাশ্চাত্যের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ এশিয়ার সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিশেষভাবে ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রচার করিয়াছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ফরাসী মনীষী ভলটেয়ারের ভারত-প্রেম এবং পরবর্তী যুগে এমিয়েলের ভারত-প্রীতি উল্লেখযোগ্য। এমিয়েল বলিতেন, "মানব জাতির অধ্যাত্ম উন্নতির জন্য ব্রাহ্মণ্যভাবাপন্ন পুরুষ প্রয়োজন।" তিনজন ইংরাজ মনীষী—স্যার চার্লস উইলকিন্স, স্যার উইলিয়াম জোন্স এবং কোলব্রুক—হিন্দু ও ইউরোপীয় শিক্ষার সমন্বয়ার্থ পাশ্চাত্য জগতে উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তক প্রচার করেন। উইলকিন্স কর্তৃক গীতা প্রথমে ইংরাজীতে অনূদিত হয়। উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক ১৭৮৪ খ্রীঃ কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত এবং মনুসংহিতা, শকুন্তলা এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদিত হয়। কোলব্রুক ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা এবং পাণিনি ব্যাকরণ ও হিতোপদেশের সম্পাদক।

উনবিংশ শতকে ভারতীয় সংস্কৃতির সম্প্রসারণে আমেরিকায় আর একটি ঘটনা ঘটে। কংকর্ডে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার লেখকবৃন্দ ও মনীষিগণ মিলিত হইতেন। এমার্সন তাঁহাদের নিকট গীতা ও উপনিষদাদি হিন্দু শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। ওয়াল্ট হুইটম্যান ও থোরো কংকর্ড সভার সভ্য ছিলেন। 'ওয়াল্ডেন' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন থোরো। তিনি ত্যাগী তপস্বীর জীবন যাপন এবং ফলমূলাদি আহার করিতেন। পুণা ডেক্কান কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এডুইন আর্নল্ড কর্তৃক ইংরাজী পদ্যে অনূদিত গীতা থোরোর নিত্যপাঠ ছিল। থোরো শকুন্তলা ও মনুসংহিতাদি সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। মনুসংহিতা পাঠান্তে তিনি লিখিয়াছেন, "হিন্দুদিগের এই গ্রন্থখানির একটি বাক্য পড়িলেই আমি উচ্চতর ভাব-ভূমিতে উন্নীত হই।" তাঁহার 'ওয়াল্ডেন' গ্রন্থখানি পড়িলে মনে হয়, উহা হিন্দুচিন্তার মার্কিন সংস্করণ মাত্র। হুইটম্যান এমার্সনের ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ ছিলেন এবং তৎকর্তৃক ভারতীয় ভাবধারায় দীক্ষিত হন। হুইটম্যানের 'লিভ্‌স অফ্‌ গ্রাস' (Leaves

of Grass) নামক পুস্তকে 'ভারতযাত্রা' শীর্ষক একটি কবিতা আছে। উক্ত কবিতায় তিনি প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের সহিত পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবাদের সমন্বয়ে প্রয়াসী ছিলেন। এমার্সন যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সেগুলি বেদান্তদর্শনে পরিপূর্ণ। তাঁহার 'ওভার-সোল' (Over-Soul) এবং 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কবিতা ঔপনিষৎ ভাবধারার অনুবাদ মাত্র। তিনি একদা লিখিয়াছেন, "প্রকৃতি আমাকে অধুনা ব্রাহ্মণ করিয়াছে।" ইংরাজ মনীষী কার্লাইলের রচনাবলীর মধ্যেও বৈদান্তিক ভাবধারা সুস্পষ্ট। এমার্সনের সহিত যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি তাঁহাকে একখানি গীতা উপহার দেন।

হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস হইতে প্রকাশিত Emerson and Asia নামক পুস্তকে ফ্রেডরিক আইভেস কার্পেন্টার বলেন যে, এমার্সনের চিন্তারাশি উপনিষদের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত। ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের কবিতাবলীতেও ভারতীয় ভাবধারা বিদ্যমান। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে গীতার উইলকিন্স কৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ভারতের প্রথম গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংশ উহার একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেণ্টকে গীতার ইংরাজী অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হেস্টিংশ উক্ত ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ শাসন লুপ্ত হইবার পরেও হিন্দু দর্শন ও বৈদিক ঋষিগণ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।" চীনা, হিন্দু, ফার্সী, হিব্রু প্রভৃতি শাস্ত্র অবলম্বনে থোরো এক সার্বজনীন বাইবেল রচনা করিতে পরামর্শ দেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যে ধর্মালোক আসিবে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ টমাস কনান ডয়েল থোরোর সহিত আমেরিকায় সাক্ষাৎ করেন এবং ইংলণ্ডে ফিরিয়া তাঁহাকে চুয়াল্লিশ খণ্ড প্রাচ্য পুস্তক উপহার পাঠান। টমাস কার্লাইল অসামান্য ভারত-প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার Sartor Resartus পুস্তকে ভারতীয় প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। ওয়াল্ট হুইটম্যানকে স্বামী বিবেকানন্দ মার্কিন সন্ন্যাসী বলিতেন। তাঁহার প্রধান পুস্তক Song of Myself কবিতা বেদান্তের ভাবে পরিপূর্ণ।

তাঁহার পুস্তকে বহু স্থানে ব্রহ্ম, বুদ্ধ, মায়া, হিন্দু, নির্বাণ, ইণ্ডিয়া ( ভারত ) প্রভৃতি শব্দ আছে। প্রসিদ্ধ মার্কিন কবি এডগার এলান পো রচিত Eureka পুস্তক ১৮৪৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ইহাও উপনিষদের ভাবে পরিপূর্ণ। ওয়াল্‌ডো ফ্রাংক বলেন, এলান পো যখন রাশিয়া ভ্রমণে যান তখন হিন্দু চিন্তার স্পর্শে আসেন। ক্রীশ্চান সায়েন্স নামক মার্কিন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী মেরী বেকার এডি তাঁহার প্রধান পুস্তক Science and Health এর চতুর্বিংশ সংস্করণে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। হিন্দু বৈদান্তিকের মত ক্রীশ্চান সায়েন্টিস্টগণ বলেন, "আমি আত্মা। আমার কোন অসুখ নাই।" এই ভাবে ধ্যান করিয়া তাঁহারা রোগ আরোগ্য করেন। উক্ত মত অবলম্বী হোরেশিও, ড্রেশার, হেনরী উড ও রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো ট্রাইনের উপর বেদান্ত প্রভাব গভীর ভাবে পড়িয়াছিল। ট্রাইনের In Tune with the Infinite এবং ওরিসন সোয়েট মার্ডেনের Peace, Plenty and Power নামক পুস্তকদ্বয়ে যেন ভারতীয় বেদান্ত ফলিত বিজ্ঞানে পরিণত। ট্রাইন ও মার্ডেন স্বামী অভেদানন্দের বেদান্ত ক্লাশের ছাত্র ছিলেন। মার্কিন মনীষী থিয়োডোর পার্কারও যথেষ্ট হিন্দু ভাবাপন্ন ছিলেন। চার্লস বেদুইন বলেন, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ফ্রান্সের ফলিত মনোবিজ্ঞানের উপর বেদান্তের প্রভাব পড়িয়াছে। হিপ্‌নোটিজ্‌ম এবং Auto-Suggestion বিজ্ঞান-যুগলের আবিষ্কারক যথাক্রমে মেসমার ও এমিল কুয়ে হিন্দু প্রভাবের অধীনে আসিয়াছিলেন। আমেরিকায় ১৮৬৭ খ্রীঃ গীতা প্রথমে প্রকাশিত হয়। মার্কিন ঋষি থোরো তাঁহার 'ওয়াল্‌ডেন' পুস্তকে বলেন, "আমি যখন স্নান করিতাম তখন ভাবিতাম আমি হিন্দুদের গঙ্গাতে স্নান করিতেছি এবং উহার তীরে মুনিঋষিগণ ধ্যানে উপবিষ্ট।" আমেরিকার শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণও হিন্দুচিন্তায় প্রভাবান্বিত ছিলেন। উইলিয়াম জেম্‌স, জোশিয়া রয়েস এবং নারী কবি ইলা উইল কক্‌স প্রভৃতি মার্কিন মনীষিগণ স্ব স্ব পুস্তকে হিন্দু চিন্তার নিকট তাঁহাদের অপরিশোধনীয় ঋণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া

জোসিয়া রয়েস ও উইলিয়াম জেম্‌সের জীবন এবং মতবাদ উভয়ই পরিবর্তিত হয়। উইলিয়াম জেম্‌স তাঁহার Pragmatism পুস্তকে (পৃঃ ১৫১) বলেন, "সকল অদ্বৈত দর্শনের শিরোমণি হিন্দুস্থানের বেদান্ত দর্শন এবং বৈদান্তিক প্রচারকদের মধ্যে শিরোমণি ছিলেন স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন।" জোসিয়া রয়েস তাঁহার World and the Individual নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে কর্মজীবনে বেদান্তকেই নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উক্ত গ্রন্থে উপনিষদের অনেক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। রয়েস হিন্দু সমাধিকে Immidiacy বলেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গ্রীক ও লাটিন ভাষার ন্যায় সংস্কৃত ও পালি ভাষার অধ্যাপনা হয়। উক্ত দেশের বৃহৎ গ্রন্থাগারসমূহ সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থাবলী রাখিতে গর্ব অনুভব করে। আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডের সংস্কৃতাধ্যাপক লানমান ১৮৯১ খ্রীঃ বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ স্থাপনপূর্বক ভারতীয় দর্শন ও ধর্মগ্রন্থ প্রায় ত্রিশ খানি প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত সিরিজের অন্তর্গত পাতঞ্জল যোগসূত্র ও ব্যাসভাষ্যের ইংরাজি অনুবাদ অতিশয় উপাদেয়। কানেক্‌টিকাট সহরে ১৮৪২ খ্রীঃ আমেরিকার ওরিয়েনণ্টাল সোসাইটী প্রতিষ্ঠা করিয়া মার্কিন পণ্ডিতবৃন্দ একশতাধিক প্রাচ্য দর্শন আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। উক্ত সোসাইটী কর্তৃক ১৮৭২খ্রীঃ হইতে একটী জার্ন্যাল প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রায় ৭০ খণ্ড অদ্যাবধি প্রকাশিত। বোষ্টন সহরে যে মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস আছে, উহার ভারতীয় বিভাগের কিউরেটার ছিলেন সিংহলের ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী প্রায় ত্রিশ বৎসর। ডাঃ কুমারস্বামী পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ভারতীয় শিল্পাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিতেন। তিনি ও ভগিনী নিবেদিতা উভয়ে মিলিত ভাবে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা অদ্ভুত ও অপূর্ব।

১৮৯৩ খ্রীঃ চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রচার পাশ্চাত্যে যুগান্তর আনিয়াছে। তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্য-প্রশিষ্যবৃন্দের

প্রাণপাতী প্রচেষ্টায় নিউইয়র্ক, বোস্টন, চিকাগো, হলিউড. প্রভিডেন্স, সানফ্রান্সিস্কো, লণ্ডন ও প্যারিস প্রভৃতি নগরে বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত ও ভারতীয় ধর্ম-দর্শন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রচারিত হইতেছে। থিয়জফিক্যাল সোসাইটীর এ্যানি বেসান্ত পৃথিবীর নানা দেশে ভারতীয় দর্শন প্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। স্বামী যোগানন্দ ও প্রেমানন্দ ভারতী ও স্বামী রামতীর্থ আমেরিকায় এবং উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ইংলণ্ডে এবং স্বামী আনন্দাচার্য্য নরওয়েতে হিন্দুধর্ম প্রচারার্থ প্রাণদান করিয়াছেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপিত হয়। উহার শাখা চীনের শাঙ্ঘাই সহরে এবং ভারতের বোম্বাই নগরে অবস্থিত। প্রত্যেক বৎসর ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরিণ্টালিষ্টস পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে অধিবেশনের ফলেও ভারতীয় ভাবধারা সভ্য জগতে ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইতেছে। ভারত সম্বন্ধে আয়ারলণ্ডের আগ্রহও উল্লেখযোগ্য। এই কেল্‌টিক জাতির জন্মগত আধ্যাত্মিকতা আর্যভাবাপন্ন। প্রসিদ্ধ জুরিস্ট মেইনে সাহেব যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন যে, আয়ারলণ্ডের প্রাচীন ব্রেহন আইন ভারতের বেদ-বিধি হইতে প্রেরণা-প্রাপ্ত। ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে আয়ারল্যাণ্ডে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ আসে ইহার ফলে ভারতের সহিত ইহার সাংস্কৃতিক সংযোগ পুনর্জীবিত হয়। ইহাতে আইরিশ সাহিত্যিক ও নাটকীয় জাগৃতি ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং তজ্জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়। উল্লিখিত আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত কবিদ্বয় জর্জ রাসেল ও উইলিয়াম ইয়িট্‌স। রাসেলের কবিতাবলী ভারতীয় ভাব পরিপূর্ণ। তৎপ্রণীত Candle of Vision পুস্তকে তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ভারতের উপনিষৎ ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি নিজেকে হিন্দু বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশেও বেদান্ত প্রচারিত হইয়াছে। বেলুড় মঠের জনৈক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী কর্তৃক তথায় স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দুধর্ম প্রচারিত হইতেছে। ব্রাজিলের সাও পলো সহরে সারকুলো

এসোটারিকো দা কমুনহাও দো পেন্সামাণ্টো নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতের অধ্যাত্ম বিদ্যা অধ্যয়ন। সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠান বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছে। উহার অনেক সভ্য চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম সাধনায় নিযুক্ত। ভিনসেণ্টি এভিলিনো ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ব্রাজিলের কন্সাল জেনারেল ছিলেন। তিনি উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের একজন বিশিষ্ট সদস্য। তিনি পরম বৈষ্ণব এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। পাণিহাটিতে গ্রীষ্মকালে যে চৈতন্য উৎসব হয় তাহাতে একটি সভায় ভিনসেণ্টি এভিলেনো বলিয়াছেন, "ভারতই একমাত্র দেশ, যাহা ঈশ্বরকে জানিয়াছে। যদি কেহ ঈশ্বরকে জানিতে চায় তাহার উচিত ভারতকে সর্বাগ্রে ভাল ভাবে জানা।"

ইউরোপের মধ্যে জার্মানীই ভারতের চিন্তা সর্বাপেক্ষা অধিক হজম করিয়াছে। উক্ত দেশের লিপজীগ শহরে সর্বপ্রথম সংস্কৃত অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। হিন্দুগণের ন্যায় জার্মানগণ কর্মজীবনে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অভ্যাস করেন। যুদ্ধ-বিরতির সময় ইংরাজ সৈনিকগণকে ছয় পেনি দামের নভেল পড়িতে দেখা যাইত; কিন্তু জার্মান সৈনিকগণ তখন কাণ্ট, হেগেল আদির দর্শনগ্রন্থ পড়িতেন। এই দেশের পল ডয়সন ও ফ্রেডারিক মোক্ষমূলার প্রথমে ইউরোপে বেদ ও উপনিষদাদি প্রচার করেন। মোক্ষমূলার কর্তৃক সম্পাদিত Sacred Books of the East নামক বিখ্যাত সিরিজে ভারত, চীন ও পারস্য প্রভৃতি প্রাচীন দেশের বহু ধর্মগ্রন্থ ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। কোপেন-হেগেনে প্রথম পালিচর্চা আরম্ভ হয়। পরে উহার কেন্দ্র লণ্ডনে উঠিয়া যায়। ডাঃ রিজ ডেভিড্‌স কর্তৃক ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পালি টেক্‌স্ট সোসাইটি লণ্ডনে স্থাপিত হয়। ইহাতে প্রায় সত্তর খানি পালি গ্রন্থ ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার বিদুষী পত্নী তৎপতির মৃত্যুর পর উক্ত সোসাইটির অধ্যক্ষপদে অভিষিক্তা হইয়াছেন। ডাঃ রিজ ডেভিড্‌স তাঁহার Buddhist India নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড, লণ্ডন, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ান

হয়; অথচ জার্মানীর প্রায় ২০।২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চেয়ার আছে, যেন জার্মানী ইংলণ্ড অপেক্ষা সংস্কৃত অধ্যয়ন অধিক ভালবাসে।" ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে হিবার্ট সাহেবের দানে হিবার্ট লেকচার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক বৎসর তুলনামূলক ধর্ম ও দর্শন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক আলোচিত হয়। ভারতের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ যে হিবার্ট লেকচার দিয়াছিলেন তাহা যথাক্রমে Religion of Man এবং An Idealist View of Life নামক পুস্তকরূপে প্রকাশিত। প্রথম হিবার্ট লেকচারার নিযুক্ত হন ফ্রেডারিক মোক্ষমূলার। উক্ত বক্তৃতায় মোক্ষমূলার উপনিষদের দর্শন আলোচনা করেন। উক্ত বক্তৃতা Origin And Growth of Religion নামক পুস্তকরূপে প্রকাশিত। ডাঃ রিজ ডেভিড্‌স ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় হিবার্ট বক্তারূপে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। উক্ত বক্তৃতা Buddhism নামক পুস্তকরূপে প্রকাশিত। মোক্ষমুলারকে স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই পাশ্চাত্যের সায়নাচার্য বলিতেন। যখন গ্রামোফোন আবিষ্কৃত ও প্রথম রেকর্ড প্রস্তুত হয় তখন আবিষ্কর্তা এডিসনের অনুরোধে মোক্ষমূলার প্রথম রেকর্ডে ঋগ্বেদের আদি মন্ত্র—"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্‌...."উচ্চারণ করেন। হিন্দুগণ ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, বেদ-মন্ত্রেই প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড বিশুদ্ধ হইয়াছিল। মোক্ষমূলার Sacred Books of the East গ্রন্থ-মালায় প্রায় পঞ্চাশ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত করিয়া পাশ্চাত্যের দ্বারে দ্বারে প্রাচ্যের পরাজ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন।

নরওয়ে দেশে ভারতীয় ভাবধারা স্বামী আনন্দাচার্য কর্তৃক বিংশ শতাব্দীতে প্রচারিত হইয়াছে। উক্ত বাঙ্গালী সন্ন্যাসী তথায় প্রায় ত্রিশ বৎসর বাস করিয়া সম্প্রতি তথায় দেহরক্ষা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ইংলিশ, নরওয়েজিয়ান ও সোয়েডিশ ভাষাত্রয়ে তাঁহার ২৫।৩০ খানি গ্রন্থ আছে। নরওয়ে দেশের অধ্যাপক স্টেনকনো ভারতধর্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়াছেন। জার্মানীর গ্লেসেনাপ, জেকোশ্লাভোকিয়ার উইণ্টারনীজ, ইটালীর ফরমিকি এবং টুকী, ইংলণ্ডের

ম্যাকডোনেল, রাপসন ও স্মিথ প্রভৃতি ভারত-তত্ত্ববিৎগণ ইউরোপে ভারত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

রাশিয়াতেও হিন্দু প্রভাব প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। কাউণ্ট লিও টলস্টয় স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' পড়িয়াছিলেন এবং হিন্দু সাধুর মত জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার জীবন-সঙ্গী বিরুকফ্ বলেন, "বিশ্বের সমস্ত লোক ভারতের সম্মুখে নতজানু হইবে। কারণ তাহাদের সাধনা ও সভ্যতা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও উত্তম। ইউরোপকে বাঁচিতে হইলে ভারতীয় সংস্কৃতির আলোক গ্রহণ করিতে হইবে।" বহু বৎসর পূর্বে সেণ্ট পিটার্সবার্গ (অধুনা লেলিনগ্রাড) শহর হইতে অতি বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ রুশীয় অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ এবং স্কারবাট্স্কি বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দু দর্শন আলোচনার্থ একটি প্রাচ্য সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়া তথাকথিত খ্রীষ্টধর্ম আফিং বলিয়া বিসর্জন করিলেও বৌদ্ধ ধর্মকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে ও আমেরিকায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক পাশ্চাত্য বিজয়ের পর উক্ত মহাদেশদ্বয়ে বেদান্ত প্রচারিত হইতেছে। লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরিক কার্ন, টুবিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যপক রিচার্ড গার্বে, হার্ভাডের হেনরি ওয়ারেন, রাইডার, লানমান ও রোরিক, ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেন কনো, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম হুইট্নি, বালটি-মোরের ব্লুমফিল্ড, বার্লিনের পিশ্কেল, অক্সফোর্ডের আর্থার কীথ, প্যারিসের সেনার্ট, জেনেভার আল্ট্রামোর, প্রেগের লেশনি, লণ্ডনের বার্নেট, বার্লিনের ডাঃ ওয়াল্ডস্মিথ, ব্রাসেল্সের ভেলি পুসিন, ও প্যারিসের সিলভ্যাঁ লেভি প্রভৃতি শতাধিক প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ সংস্কৃত ও পালির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লাপ্লাশ বলিয়াছিলেন, দশ সংখ্যায় গণনা করিবার কৌশল আমরা হিন্দুদের নিকট হইতে শিখিয়াছি। প্রাচীন ইউরোপের আর্কিমিডিস এবং এ্যাপোলোনিয়াসের প্রতিভা উহা আবিষ্কার করিতে

পারে নাই। গ্রীক প্রতিভা হিন্দু প্রতিভার নিকট এই খানে হার মানিয়াছে। ডাঃ টোবিয়াজ ডান্টিজিগ তৎপ্রণীত Number the Languge of Science পুস্তকে বলেন যে, গণিত বিজ্ঞানের নিকট আমরা ভারতের নিকট চির ঋণী। ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত (ওরফে স্বামী বিদ্যারণ্য) প্রণীত History of Hindu Mathematics নামক গ্রন্থে উহার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য্য দ্বাদশ শতকে আবির্ভূত এবং ইউরোপের গণিতজ্ঞ ইটালীর বোম্বেলি ষোড়শ শতাব্দীর লোক। ১৬৬৩ খ্রীঃ ডাচ মিশনারী এব্রাহাম রোগার মান্দ্রাজে ধর্মপ্রচার করিতে আসেন। তিনি কয়েকটী ভারতীয় পুস্তক ডাচ ভাষায় লিডেন হইতে প্রকাশ করেন। এইগুলি পরে জার্মান ভাষায় নুরেনবার্গ হইতে অনূদিত হয়। কোন পুস্তকে রোগার ভর্তৃহরির দুই শত শ্লোক পদ্মনাভ নামক ব্রাহ্মণের সাহায্যে অনুবাদ করেন। ইহার পূর্বে জার্মানিতে 'পঞ্চতন্ত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল। জার্মানির মহাকবি গেটে ও হার্ডার উক্ত রোগারের পুস্তকপাঠে অনুপ্রাণিত হন। উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক অনূদিত 'শকুন্তলা' পড়িয়া গেটে প্রীত এবং হিন্দু সাহিত্য পাঠে উৎসুক হন। গেটের মহাকাব্য 'ফাউষ্ট' (Faust) পুস্তকে গভীর হিন্দু প্রভাব পড়িয়াছে। ভারত-প্রেমিক হার্ডার তাঁহার Talks on the Conversion of the Hindu by European Christians নামক পুস্তকে বলেন, "ভারতীয় দর্শনের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। ইহার দ্বারা মানব জাতি মহীয়ান হইবে।" হিন্দু নীতির প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন, "হিন্দুগণ জগতের মহত্তম জাতি। তাঁহাদের মিতব্যয়িতা ও পানদোষের প্রতি ঘৃণা অদ্ভুত।" তিনি নিজে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টান হইলেও ভারতীয় ভাবধারার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধান্বিত। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক হেলমুথ ভন গ্লেশনাপ বলেন যে, প্রথমে ভারত-প্রভাব জার্মানির প্রধান মনীষীদের উপর পড়িয়াছে। গেটে সংস্কৃত জানিতেন না; তথাপি সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। দেবনাগরী অক্ষরে তাঁহার হাতের লেখা এখনও তাঁহার স্মৃতি-মন্দিরে

সুরক্ষিত। জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-বিশারদ ওয়াগনার উপনিষদাদি পড়িয়াছিলেন এবং হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। কবি কার্ল অগাস্ট হিন্দু দর্শন শিক্ষা করিতে ভারতে আসিয়া ১৭৮৯ খ্রীঃ মাদ্রাজে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতা ফ্রেডারিক শ্লেগেল ১৮০৩ খ্রীঃ জনৈক ইংরাজ কর্মচারী হ্যামিল্‌টনের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় সাহিত্য শিক্ষা করিয়া On the Language and Wisdom of Indians : A Contribution to the Foundation of Antiquity নামক একটী সারগর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আগস্ট উইলহেল্‌ম আরও সংস্কৃত-অনুরাগী ছিলেন। বস্তুতঃ তিনিই জার্মানিতে সংস্কৃত শব্দশাস্ত্র প্রথমে প্রচার করেন। তৎকর্তৃক লাটিন ভাষায় গীতা, হিতোপদেশ ও রামায়ণ টীকা সহ প্রকাশিত হয়। ইনিও ফ্রান্স বপ্‌ প্যারিসে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে লেসেন, ওয়েবার, রথ, বটলিঙ্ক, বুহ্‌লার, কিলহর্ন এবং ওল্ডেনবার্গ প্রমুখ অনেক জার্মান পণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন, সম্পাদন ও অনুবাদ করেন। উইলিয়ম্‌ ভন্‌ হামবোল্ড হিন্দু সাহিত্য অধ্যয়নান্তে গীতা সম্বন্ধে একটি বই লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "গীতা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সারগর্ভ গ্রন্থ। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি জীবনে গীতাপাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছি।" তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। কবি রুকার্ট সংস্কৃত কবিতা অবলম্বনে মৌলিক কবিতা রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন। তিনি বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতাদি পাঠ করিয়াছিলেন এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অকালে দেহরক্ষা করেন।

জার্মান দর্শনও হিন্দু দর্শন কর্তৃক গভীরভাবে প্রভাবিত। হেগেল হিন্দু দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত Philosophy of Religion পুস্তকের বহু স্থানে ভারতীয় ধর্মের উপমা ও তুলনা দেখা যায়। উক্ত পুস্তকে তিনি বলেন, "আমার ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য আছে। হিন্দুগণ এই পরম পদার্থকে ব্রহ্ম বলে। এই সনাতন সত্তা স্বয়ম্ভূ ও বিশ্বব্যাপী। পরব্রহ্ম বিশ্বাত্মা। ব্রহ্ম যখন সৃষ্টি করেন তখনও স্বীয় শরীরের মধ্যেই সৃষ্টি করেন ;

অথচ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আত্মস্থ থাকেন। ব্রহ্মই সর্বদেহে অহংরূপে বিরাজিত। 'অহং ব্রহ্ম অস্মি' বলা মাত্র সমস্ত সৃষ্টি লুপ্ত হয়। ব্রহ্ম লিঙ্গবর্জিত এবং বিশ্বরূপে প্রকাশিত। ব্রহ্ম বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইলেও স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকেন।" ব্রহ্ম ও ত্রিমূর্তি প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ তৎকর্তৃক স্বীয় গ্রন্থে ব্যবহৃত। হেগেল মহাভারত ও গীতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকে তিনি কোলব্রুক কর্তৃক অনূদিত বেদ ও গীতা হইতে শ্লোকোদ্ধার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে হিন্দু, বিশ্বামিত্র, গঙ্গা, হিমালয়, রুদ্র, শিব, ব্রহ্ম, নল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, কৃষ্ণ, বশিষ্ঠ, পরমেশ্বর, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ এবং পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বও উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব ও বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। ফার্সী ভাষা হইতে লাটিনে অনূদিত ভারতের ইতিহাসাদি তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে হেগেল দর্শন ভারতীয় দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কবি শেলিং শেষ জীবনে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। তিনি উপনিষদের একান্ত অনুরাগী পাঠক ছিলেন এবং উপনিষৎকে মানব জাতির প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডার মনে করিতেন এবং বাইবেলের বহু উচ্চে স্থান দিতেন। তিনি বলিতেন, ভারতের বা ভারতেতর দেশের কোন ধর্মগ্রন্থের সহিত উহার তুলনা হয় না। তিনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মোক্ষমূলারকে কয়েকটি উপনিষৎ অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। শোপেনহওয়ারের উপনিষৎ-প্রীতি সুবিদিত। তিনি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে উইমারে অবস্থান কালে প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ ফ্রেডারিক মেজারের মাধ্যমে উপনিষদের সহিত পরিচিত হন। তাঁহার লাইব্রেরীতে অনেক ভারতীয় পুস্তক ছিল। তিনি উপনিষৎ সম্বন্ধে বলিতেন, "জীবনে উহা আমাকে শান্তি দিয়াছে ; মৃত্যুতেও ইহা আমাকে শান্তি দিবে।" তাঁহার উপনিষৎ-প্রীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া পল ডয়সন উপনিষৎ দর্শন ও বেদান্ত দর্শন লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার শয়ন-কক্ষে একটি বুদ্ধমূর্তি রক্ষিত ছিল। তৎপ্রচারিত দুঃখবাদ ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ভারতীয় সাহিত্য হইতে অনেক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন,

"আমি হিন্দু দর্শনের ব্যাখ্যা করিতেছি।" তৎপ্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ World as Will and Idea তিন খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাকে ভারতীয় বেদান্তের জার্মাণ সংস্করণ বলা চলে। রিচার্ড ওয়াগনার ভারতীয় ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। ফ্রেডারিক নীটশেও মনুসংহিতাদি হিন্দুগ্রন্থ পাঠ করেন। শোপেনহওয়ারের প্রধান শিষ্য এডোয়ার্ড ভন হার্টম্যান তাঁহার Philosophy of History নামক পুস্তকে বলেন, "ভবিষ্যতের দর্শনে অদ্বৈত বেদান্তের প্রবল প্রভাব থাকিবে।" গ্রাউল সাহেব কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত 'পঞ্চদশী' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করেন। তৎপ্রণীত Philosophy of the Unconscious নামক বিখ্যাত পুস্তকে কেনোপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত। উক্ত পুস্তকে সৎ, চিৎ, আনন্দ, ব্রহ্ম, হিন্দু, বেদ, বেদান্ত, কূটস্থ, জীব, সাক্ষী প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত। বেদান্তের চিৎসত্তা ও শোপেনহাওয়ার E.ernal I বলেন এবং হার্টম্যান Unconscious বা জ্ঞানাতীত সত্তা বলেন।

আর. এস. মীড সাহেব বলেন, "গত তিন শত বর্ষ যাবৎ পাশ্চাত্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচ্যবিদ্যা প্রচারের ফলে তথায় চিন্তার গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে।" ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য চিন্তাজগৎ বৌদ্ধমুখী ছিল; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে উহা বেদান্তাভিমুখী হইয়াছে। জার্মানীর স্ট্রাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলফ্রেড ওয়েবার Indian Studies নামক বিশ পঁচিশ খানি গ্রন্থ জার্মান ভাষায় রচনা করেন। অধ্যাপক উইণ্টারনিজ তৎপ্রণীত Indian Literature and the World Literature নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর গ্রীস ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটিয়াছিল।" আর্থার লিলি সাহেব তৎপ্রণীত Buddhism in Christendom পুস্তকে জীশু খ্রীষ্টকে এশিয়া মাইনরস্থ এসেন নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়-ভুক্ত বলেন। জেম্‌স ফাগু´সনের মতে খ্রীষ্টান ধর্মের ঋণ বৌদ্ধ ধর্মের নিকট অসীম।

পঞ্চম ও দশম শতাব্দীর মধ্যে মনুষ্য জাতির অর্ধেকেরও অধিক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। নেপালের ইংরাজ রেসিডেণ্ট ১৮৩৩ হইতে ১৮৪৩

খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এক দশকের মধ্যে ৮৫ বস্তা বৌদ্ধগ্রন্থ কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে, ৮৫ বস্তা পাণ্ডুলিপি লণ্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে, ৩০ বস্তা পাণ্ডুলিপি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে, ৭ বস্তা বই অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরীতে এবং ১৭৪ বস্তা পুঁথি প্যারিস এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, তিব্বতে ও নেপালে একশত ধর্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত তৎপ্রণীত Indian Civilisation in Buddhist Ages নামক গ্রন্থে বলেন যে, ইউজেন বার্ণফ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং বিগাণ্ডেট ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক রচনা করেন। হাঙ্গেরীর পণ্ডিত আলেকজাণ্ডার সোমা করোসি কর্তৃক তিব্বতে বহু বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত ও কলিকাতায় প্রেরিত হয়। সোমাকরোসি তিব্বত হইতে দার্জিলিঙে ফিরিয়া তথায় দেহরক্ষা করেন। পাদ্রী স্যামুয়েল বিল ভারতে ও চীনে ভ্রমণপূর্বক প্রায় দুই হাজার পাণ্ডুলিপি করিয়া ইংলণ্ডে পাঠান। ভগিনী নিবেদিতা জাপানী মনীষী ওকাকুরা লিখিত Ideals of the East নামক পুস্তকের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাহাতে নিবেদিতা বলেন, "গ্রীসকে এশিয়ার একটি প্রাচীন প্রদেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" তৎপ্রণীত Footfalls of Indian History নামক পুস্তকে আছে, "গ্রীক ও লাটিন সভ্যতার উপর এশিয়ার প্রভাব প্রচুর পরিমাণে পড়িয়াছিল।"

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্যার জন উড্রফ ইংরাজীতে যে তন্ত্রগ্রন্থসমূহ অনুবাদ করিয়াছিলেন সেইগুলি দ্বারা তান্ত্রিক দর্শন পাশ্চাত্যে প্রচারিত হইয়াছে। তন্ত্র সম্বন্ধে তৎপ্রণীত ইংরাজী গ্রন্থাবলী পাশ্চাত্যে ভারতীয় দর্শনের নির্ভরযোগ্য বাহক হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য মনীষীগণও ভারতীয় ভাবধারা অবলম্বনে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আলডার্শ হাক্সলী, জেরাল্ড, হার্ড, সমারসেট মঘাম, রোমাঁ রোলাঁ, পল রিশার্ড, কাউণ্ট কাইসারলিং, জেম্‌স কাজিন্‌স প্রভৃতি বহু পাশ্চাত্য মনীষী কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী ভারতীয় ভাবে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি

মহাপুরুষদের প্রভাবও বিদেশে উপনীত হইয়াছে। শিল্পী নন্দলাল বসু এবং বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতির সাধনাও পাশ্চাত্যে প্রশংসিত। শিল্পী নন্দলাল ছাগশিশু বহনকারী বুদ্ধদেবের একটি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। জেনেভার এক প্রদর্শনীতে উক্ত চিত্র দর্শনে কোন সুইস সমালোচক মন্তব্য করেন, "এই ছবির পশ্চাতে আমি এক মহাসভ্যতা দেখিতেছি।" উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারসমূহ জ্ঞাত হইয়া কোলাম সাহেব তৎপ্রণীত Life's Unity and Rhythm নামক পুস্তকে বলেন, "বসু একটি দিগ্‌দর্শন-চিহ্ন, যাহা হইতে অভিনব ভাবধারার অরুনোদয় সূচিত হয়।' বৌদ্ধযুগে যেমন সমগ্র প্রাচ্য ভারতীয় চিন্তায় প্রভাবিত হইয়াছিল তেমনি বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগৎ ভারতীয় ভাবে অভিভূত হইবে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের ন্যায় বর্তমান যুগেও ভারতীয় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য সমগ্র শিক্ষিত পৃথিবীতে প্রসারিত হইবে।

## এগার

# ভারতের ভবিষ্যৎ

অধুনা ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। যাহা পূর্বে মুষ্টিমেয় যুগনায়কগণের মনে উদিত হইয়াছিল তাহা এখন চিন্তাশীল দেশবাসীদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কেহ কেহ এই সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, আলোচ্য বিষয়ে শিক্ষিত নরনারীগণের মনোভাব। কাহারো মতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হইলেই ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। কেহ বলেন, অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাই ভারতের উন্নতির প্রধান অন্তরায় এবং অন্ন-বস্ত্রের অভাব

মোচন দ্বারাই উন্নতির রাজপথ উন্মুক্ত হইবে। কাহারো মতে পাশ্চাত্য আদর্শে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হওয়া সম্ভব। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, অতীতের আলোকে বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিবে। মতভেদ সত্ত্বেও সকলে এই বিষয়ে একমত যে, ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। স্বামী বিবেকানন্দ যোগদৃষ্টি সহায়ে অর্ধ শতকেরও অধিক পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন ভারত অপেক্ষা ভবিষ্যৎ ভারত শতগুণে উজ্জ্বলতর।

ভারতের বর্তমান অধঃপতন যেমন সুগভীর তেমনি ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতিও সমুজ্জ্বল। ঋষি অরবিন্দ সত্যই বলিয়াছেন যে, মহত্তর ভবিষ্যৎই মহৎ অতীতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করেন, "প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান্ হয়, পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক পতনের পর আর্য সমাজও যে শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান্ হইতেছে ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক পতনের পর আমাদের পুনরুত্থিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছে। বারংবার এই ভারত-ভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তি দ্বারা ইহা পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন। কিন্তু ঈষন্মাত্র যামা গতপ্রায়া বর্তমান গভীর বিষাদ রজনীর ন্যায় কোন অমানিশা ইতিপূর্বে এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এই পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতনসমূহ গোষ্পদের তুল্য। সেই জন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় আর্য সমাজের পূর্ব পূর্ব যুগের বোধনসমূহ সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায় মহিমা-বিহীন হইবে এবং উহার এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পূর্ব পূর্ব যুগে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে।"

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করিলে ইহা আরও সুস্পষ্ট হইবে। মহাভারতের প্রথম জাগরণ দেখা যায় উপনিষৎ যুগে। সেই যুগে বৈদিক ঋষি মর্ত্যগণকে অমৃতের পুত্ররূপে সম্বোধনপূর্বক ঘোষণা করিলেন, "শোন শোন, আমি সেই আদিত্যবর্ণ ব্রহ্মপুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিলে

মৃত্যু বা অজ্ঞান চিরতরে অতিক্রম করা যায়, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" উক্ত সত্যের বহু দ্রষ্টাও সেই যুগে আবির্ভূত হন। বামদেব, নচিকেতা, শ্বেতাশ্বতর, যাজ্ঞবল্ক্য ও কৌষীতকী প্রভৃতি ঋষিগণ এই সত্য উপলব্ধি করিয়া বৈদিক ভারতে প্রচার করেন। সত্যদ্রষ্টা ঋষিসংঘ এই সনাতন সত্যের ব্যাপক অনুভূতির জন্য ভারতের সমাজ গড়িলেন। যুগে যুগে এই সত্য ভারতে ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত জীবনে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের দ্বিতীয় জাগরণ আসে মহাভারতের যুগে, যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ-পদ্ম হইতে গীতামৃত বিনিঃসৃত হইল। গীতার যুগেও বেদ-বাণীই সমন্বয়-সুরে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে আছে, সেই সৎপুরুষ এক হইলেও বিপ্রগণ তাঁহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা প্রভৃতি নামে বর্ণনা করেন। ঋগ্বেদের এই সিদ্ধান্ত গীতার যুগে আরো ব্যাপক ও বিশাল আকার ধারণ করিল। ভারতের তৃতীয় জাগরণ হয় বৌদ্ধ যুগে, যখন বেদ-বাণী বুদ্ধদেবের মাধ্যমে বহির্ভারতে এবং সমগ্র প্রাচ্যে প্রচারিত হইল। বৌদ্ধ যুগে সমগ্র প্রাচ্য বৃহত্তর ভারতে পরিণত হয়। ভারতের চতুর্থ জাগরণ শঙ্করাচার্যের সময়ে হয়। বৌদ্ধ যুগে যে সকল অবৈদিক ভাব ও ক্রিয়া ভারতে প্রবেশ করে শঙ্কর তৎসমুদয়কে বৈদিক বর্ণে রঞ্জিত করিলেন। তিনি যে বেদান্ত প্রচার করিলেন তাহার ফলে বৌদ্ধ ভারত বৈদিক ভারতে পরিবর্তিত হইল। শঙ্করের মুখে যে বেদ-বাণী ধ্বনিত হইল তাহা সমগ্র ভারতকে ধর্ম-ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করিল। ভারতের পঞ্চম জাগরণ মধ্য যুগে আসিল। সেই যুগে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এক বা একাধিক ধর্মগুরু আবির্ভূত হইয়া বৈদিক ধর্মকে জনসমাজে প্রচার করিলেন। মুসলমান রাজত্বে যে সেমিটিক ধর্ম-স্রোত উত্তর ভারতে প্রবাহিত হয় তাহা মধ্যযুগের ধর্মগুরুগণ কর্তৃক পুনরায় বৈদিক আদর্শে প্রভাবিত হয়। বর্তমান জাগরণকে ভারতের ষষ্ঠ জাগরণ বলা চলে। উনবিংশ শতাব্দী হইতে বর্তমান জাগরণের সূত্রপাত হয়। রাজা রামমোহন রায় বর্তমান জাগরণের প্রবর্তক ও পুরোহিত ছিলেন।

এই ছয় জাগরণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, পরবর্তী

জাগরণ পূর্ববর্তী জাগরণ অপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক। ভারতশক্তি বহুবার পুনরভ্যুত্থানের পরেও নিঃশেষিত হয় নাই। যে রেনার্শাঁ বা মহাজাগৃতি এই যুগে আসিয়াছে তাহা পূর্ব পূর্ব জাগৃতি অপেক্ষা সর্ব দিকে বিপুলতর। ইহা শুধু ধর্মে আবদ্ধ নহে, জাতীয় জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই এই জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। তাই ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে ও সঙ্গীতে নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুগাচার্যগণ এই নব যুগের প্রবর্তক। এই অপূর্ব জাগরণের পরিণতি নিশ্চয়ই সমুজ্জ্বল। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া নিষ্প্রয়োজন। বৈদিক যুগে ভারত যে স্বর্গীয় অমৃত আস্বাদ করিয়াছে তাহার ফলে সে মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছে। ভারত স্বধর্ম পরিত্যাগ না করিলে তাহার অগ্রগতি কেহই রোধ করিতে পারিবে না। যাঁহারা পাশ্চাত্য মোহে অন্ধ তাঁহারাই ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়েন। ভারতীয় আদর্শে আস্থা হারাইয়া তাঁহারা ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিতেছেন। ঋষি অরবিন্দ বলেন, "ভারত অদ্যাপি জীবিত। বর্তমান ভারত শাশ্বত ভারতের সহিত তাঁহার মন, চিত্ত ও আত্মার যোগ হারায় নাই। বিদেশী আক্রমণ ও শাসন, গ্রীক ও পার্থিয়ান ও হূনদের অত্যাচার, ইসলামের প্রবল পরাক্রম এবং ব্রিটিশ অধিকার ও শাসনের সমতলকারী স্টিম-রোলারবৎ গুরুভার এবং পাশ্চাত্যের পর্বততুল্য চাপ ভারতাত্মাকে বিনাশ করিতে পারে নাই। বৈদিক ঋষিগণ ভারতের যে অমর দেহ নির্মাণ করিয়াছিলেন ভারতাত্মা তন্মধ্যে এখনো বিদ্যমান। প্রত্যেক পদক্ষেপে, প্রত্যেক সংকটে ও আক্রমণে ও শাসনে ভারত সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়াছে। আধ্যাত্মিক গভীরতা এবং প্রবল প্রতিক্রিয়া ও সত্বর আত্মসাৎকরণের শক্তি দ্বারা ভারত এই অসম্ভব সম্ভব করিতে পারিয়াছে। যাহা স্বাঙ্গীকৃত হয় নাই ভারত তাহা বর্জন করিয়াছে। যাহা বর্জন করা সম্ভব হয় নাই ভারত তাহাকে স্বাঙ্গীকৃত করিয়াছে। এমন কি, পতন-যুগ আরম্ভ হইবার পরেও সে একই

শক্তির দ্বারা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে। ভারত মৃতপ্রায় হইলেও কখনো প্রাণহীন হয় নাই। সঙ্কট সময়ে সে দাক্ষিণাত্যে পশ্চাদপসরণ ও আত্মরক্ষা দ্বারা প্রাচীন সমাজকে সুগুপ্ত করিয়াছে। হিন্দু-দ্বেষী ইসলামের গুরুভারে সে মরণাপন্ন হইয়া রাজপুত, শিখ ও মারাঠাগণকে তাহার পুরাণ আত্মা ও প্রাচীন আদর্শ রক্ষার্থ জাগ্রত করিয়াছে। যখন সে সক্রিয় প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়াছে তখন সে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আশ্রয় করিয়াছে। যে সাম্রাজ্য ভারত-সমস্যা সমাধানে, অথবা ভারতাত্মার সহিত মৈত্রী স্থাপনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক তাহা এই পুণ্যভূমিতে দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। প্রতিকূল পরিপার্শ্বের সম্মুখীন হইয়া নিস্তেজ অবস্থায় সে রুদ্ধ শ্বাসে পুনর্জাগৃতি অপেক্ষা করিয়াছে। এমন কি, এখনো অনুরূপ ঘটনা আমাদের চক্ষুর সমক্ষে দৃশ্যভাবে ঘটিতেছে। ভারত সভ্যতার যে অনতিক্রম্য জীবনী শক্তি এই অলৌকিক কার্য সম্পাদনে সমর্থ তাহা কি কখনো বিনষ্ট হইতে পারে? ঋষিগণ যে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উপর ভারতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গুর বা অস্থায়ী নহে। ভারতবর্ষ সনাতন এবং ভারত-সৌধ অবিনাশী উপাদানে গঠিত।"

ঋষি অরবিন্দ আরও বলেন, "মানবাত্মার ঈশ্বরমুখী অভিযানের পথ ভারত যুগে যুগে প্রশস্ত করিয়াছে। ভারতের সাধনা এখনো সমাপ্ত হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতার মিশন এখনো পরিপূর্ণ হয় নাই। অধুনা সনাতন ভারতবর্ষ বিমৃত হয় নাই; অথবা তাহার শেষ সৃজনী বাক্য উচ্চারণ করে নাই। ভারত এখনো বাঁচিয়া আছে এবং ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ মানব প্রকৃতির জন্য তাহার জীবন ধারণ অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্যের নিরীহ শিষ্য ইঙ্গভাবাপন্ন প্রাচ্য জাতিকে ভারত জাগ্রত করিতে চায় না। সে তাহার প্রাচীন অমর শক্তিকে জাগ্রত করিয়া স্বধর্মের বৃহত্তর সৌধ নির্মাণের মহাব্রত লইয়াছে।"

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের বিলাতযাত্রায় ভারতের নব জাগরণ সূচিত হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিষ্টলে দেহরক্ষা করেন এবং ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভজন্ম হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের আবির্ভাব এবং

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ঋষি অরবিন্দ এই সুন্দর কথাটী বলিয়াছেন, "শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ যেদিন নিরক্ষর রামকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন সেইদিন প্রথম দৃশ্য চিহ্ন দেখা গেল যে, ভারত জাগিয়াছে, শুধু বাঁচিতে নহে, জগজ্জয় করিতে।" ১৮৯৩ খ্রীঃ চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দের বিজয়ে নব্য ভারতের জয়যাত্রা ঘোষিত হয়। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে এই জাগরণ দৃঢ় ও ধীর গতিতে প্রবলতর হইয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতশক্তির উদ্বোধন হয় 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রসাধনায় এই বঙ্গভূমিতে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দ মঠে' যে চিত্র আঁকিলেন তাহা মৃণ্ময় ভারতের নহে, তাহা সনাতন অমর ভারতের। ধীরে ধীরে স্বাধীনতার সংগ্রাম বিপুল আকার ধারণ করিল এবং ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হইল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভ করিলেও ভারত এখনো পাশ্চাত্য মোহ-মুক্তি ও সাংস্কৃতিক স্বারাজ্য প্রাপ্ত হয় নাই।

ভারতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তির পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' রচিত হয়। ম্যাক্সিম গর্কির 'মাদার' ( মাতা ) পুস্তকের ন্যায় ইহা যুগান্তরকারী গ্রন্থ। কিন্তু 'আনন্দ মঠে' ও ভবিষ্য ভারতের কোন আলেখ্য নাই। যুগাচার্য্য বিবেকানন্দের ধ্যানশুদ্ধ মানসপটে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। ঋষি অরবিন্দও ভবিষ্যৎ ভারতের এই উজ্জ্বল আলেখ্য যোগদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "ভারতের অতীত সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ অবগতি অত্যাবশ্যক। অতীত অভিজ্ঞতাকে ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে লাগাইতে হইবে। ভারতীয়গণ, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হও। আর্যচিন্তা, আর্যনীতি, আর্যচরিত্র, আর্যজীবন বর্তমান ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর। ভারতের ধর্ম, ভারতের সাধনা, তপস্যা, জ্ঞান ও শক্তি দ্বারাই ভারতের ভবিষ্যৎ আলোকিত হইবে। ভারতের কাজই জগতের কাজ, ঈশ্বরের কাজ। আমাদের নায়ক স্বয়ং ঈশ্বর; তিনি আমাদিগকে গন্তব্য স্থলে লইয়া যাইবেন। স্বস্থ হইয়াই, স্বীয় প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করিয়াই ভারত শ্রেষ্ঠভাবে আত্মবিকাশ ও বিশ্বকল্যাণ সাধন করিতে

পারে।" ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে নিম্নোক্ত তিন পথ ঋষি অরবিন্দ কর্তৃক নির্দিষ্ট, "সম্যক্ গৌরব, গভীরতা ও পূর্ণতায় পুরাতন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার পুনরাবিষ্কারই প্রথম কর্তব্য। দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান এবং বিচারমূলক জ্ঞান প্রভৃতি নূতন খাতে উক্ত আধ্যাত্মিকতা প্রবাহিত করা দ্বিতীয় কর্তব্য। ভারতীয় ভাবধারার আলোকে আধুনিক সমস্যাসমূহের মৌলিক সমাধান এবং ধর্মভাবাপন্ন সমাজ গঠনের প্রচেষ্টাই তৃতীয় কর্তব্য।" "এই তিন কর্তব্য যদি আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে পালন করি তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ ধীরে ধীরে গঠিত হইবে। পাশ্চাত্যের তথা-কথিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমাজ সংস্কার বা জাতি গঠন ভারতে ফলপ্রসূ হইবে না। চিন্ময় ভারতের পরিচয় যাহারা পায় নাই তাহারাই ভবিষ্য ভারত নির্মাণে পাশ্চাত্য প্রণালীতে বিশ্বাস স্থাপন করে। স্থূল বুদ্ধির আলোকে চিন্ময় ভারতের পরিচয় পাওয়া যায় না, ধ্যান-নেত্রেই চিন্ময় ভারত উপলব্ধ হয়।"

শুধু অতীতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে এবং বর্তমান যুগ-গতি উপেক্ষা করিলে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে না। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "আমাদের বর্তমান প্রয়োজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।" তিনি কোন স্থানে বলিয়াছেন, "ভবিষ্য ভারতের গঠন বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহের সমবায়ে সম্ভব।" মুসলমানদের মধ্যে যে সামাজিক সাম্য বিদ্যমান তদ্রূপ ভারতীয় সমাজে প্রয়োজন। সমাজে বর্ণভেদ, শ্রেণীভেদ ও অন্যান্য বৈষম্য ধর্মালোকে মুছিয়া ফেলিলে ভারত রাষ্ট্রে আদর্শ গণতন্ত্র উদ্ভূত হইবে। কিন্তু উক্ত গণতন্ত্র বৈদান্তিক প্রজ্ঞালোকে চালিত হওয়া উচিত। যাঁহারা মনে করেন, প্রাচীন ভারতে সমাজ-শরীর বা রাষ্ট্রদেহ গড়িয়া উঠে নাই তাঁহারা ভারতেতিহাসের সহিত সম্যক্ পরিচিত নহেন। ঋষি অরবিন্দ বলেন, "প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি পুরান গ্রীসীয় বা আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মত মন, জীবন এবং দেহের শক্তি, উন্নতি ও স্বাস্থ্যের প্রতি সমান মূল্য দিয়াছিল; অবশ্য ইহা ভিন্ন লক্ষ্য ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ। নূতন

ভারত একই লক্ষ্য নবপথে সাধন করিবে এবং ইহা আধুনিক জটিল অবস্থার উপযোগী হইবে। কিন্তু তাহার চেষ্টা এবং কর্মের পরিধি ও বৈচিত্র্য অতীত অপেক্ষা অল্পতর না হইয়া অধিকতরই হইবে।" ভারতে ধর্ম ব্যাপক ভাবেই পালিত হইয়াছে। ভারতের বর্তমান যেমন অতীতের আলোকে আবির্ভূত তেমনি উহার ভবিষ্যৎও অতীতের আদর্শে গঠিত হইবে। যেমন অতীত ভারতে তেমনি ভবিষ্য ভারতে ধর্মই হইবে উহার প্রাণ ও প্রেরণার উৎস। যে ভারত ধর্মের জননী তাহার ভবিষ্যৎ ধর্মহীন কল্পনা করা যায় না। পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় অতীত আদর্শ উপেক্ষিত। যখনই ভারত বিদেশী সংস্কৃতির চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হইল তখনই সার্বভৌমিক ধর্মাদর্শের বিস্মৃতি ঘটিল। ভারতে ধর্ম সর্বাপেক্ষা উদার ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। সেমিটিক ধর্মত্রয়ের সুদীর্ঘ সংঘাতে ভারতে ধর্মান্ধতা সংক্রামিত হইয়াছে।

রাজনীতি ও অর্থনীতি সহায়ে শান্তিলাভ ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বর্তমান জগৎ সচেষ্ট। কিন্তু কোথায়ই বা শান্তি? আর কোথায়ই বা স্বাধীনতা? যে বাহ্য শান্তি কোথাও কোথাও অনুমাত্রায় দেখা যায়, তাহা অতিশয় সশস্ত্র ও সন্ত্রস্ত। এই শান্তিতে নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা অত্যল্প। অধুনা জাপানে বা জার্মানিতে যে স্বাধীনতা বিদ্যমান তাহা কি পরাধীনতার নামান্তর নহে? এইরূপ শান্তিতে বা স্বাধীনতায় মানুষ সুখী হইতে পারে না; অথবা জীবনের ও সমাজের কোন সমস্যা মীমাংসিত হয় না। ধর্মালোক ব্যতীত জীবন-সমস্যার আত্যন্তিক সমাধান অসম্ভব। ভারতে রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান ধর্মপথেই হয়। এইজন্য মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ধর্মকে মূলনীতি করিলেন। বর্তমান ভারতে সওয়া শতক ধরিয়া ধর্মজাগরণের সুস্পষ্ট লক্ষণ দৃশ্যমান। আধুনিক বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্তির পথ ধর্মালোকেই দৃষ্টিগোচর হইবে। ভবিষ্য ভারতের ধর্মভাবাপন্ন সমাজ-তন্ত্রই ভ্রান্ত জগৎকে শান্তির পথ দেখাইবে। যে মহাসভ্যতার পুণ্য স্মৃতি ভারতের মজ্জাগত হইয়াছে তাহা ঋষি-লব্ধ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন

সভ্যতার আলোকে বর্তমান ভারত চলিলে ভবিষ্য ভারতে মহত্তর সভ্যতা ও বৃহত্তর সংস্কৃতি সংসৃষ্ট হইবে। Remaking of Nations (জাতিপুঞ্জের পুনর্গঠন) নামক পুস্তকের লেখক জনৈক ইংরাজ মনীষী ভারত ভ্রমণান্তে মন্তব্য করিয়াছেন, "আমি এই গভীর বিশ্বাস লইয়া ভারত ত্যাগ করিলাম যে, স্বয়ং ভারতের পক্ষে পাশ্চাত্য আদর্শবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ মারাত্মক হইবে। ব্যক্তিসমূহের ন্যায় যে সকল জাতি স্বীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয় তাহারা কৃতকর্মের কুফল ভোগ করিতে বাধ্য।"

ভবিষ্য ভারতে যে অপূর্ব সভ্যতা ও নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে তাহাতে শ্রমিকদের অবদান ও আত্মত্যাগ সমধিক থাকিবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "এই যুগ শূদ্রযুগ। এই যুগে শূদ্রগণ বা শ্রমিকগণের জাগরণ বা নায়কত্ব আসিবে। তাহারাই ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িবে।" তিনি আরো বলেন; "নূতন ভারত বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচী মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। ভবিষ্য ভারত বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে নীরবে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখকষ্ট ভোগ করে এরা অসীম জীবনী শক্তি পেয়েছে। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে। আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এঁরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। এরা পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার ও সামর্থ্য, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখ চেপে সারাদিন খাটা ও কার্য্যকালে সিংহ-বিক্রম অন্যত্র দেখা যায় না।" পূর্ব পূর্ব যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উন্নতির সুযোগ পাইয়াছে। এই যুগে শূদ্রগণই প্রধান সুযোগ পাইবে ও অগ্রগণ্য হইবে। রুশীয় সাম্যবাদের মত ভারতীয় সাম্যবাদ উচ্চ শ্রেণীকে নিম্ন শ্রেণীতে টানিয়া ফেলিবে না। ভারতীয় সাম্যবাদ নিম্ন শ্রেণীকে উচ্চ শ্রেণীতে টানিয়া তুলিবে। মনুসংহিতায় আছে, 'শূদ্রো ব্রাহ্মণতাম্ এতি।' ইহার অর্থ, শূদ্র ভবিষ্যৎ ভারতে ব্রাহ্মণত্ব

লাভ করিবে অর্থাৎ উন্নত হইবে। শাস্ত্রমতে শূদ্রতায় ত্রিগুণের সমতা বিদ্যমান। শিক্ষালাভ ও ধর্মসাধন দ্বারা শূদ্রত্ব বর্জিত ও ব্রাহ্মণত্ব অর্জিত হয়। শাস্ত্রে আছে—

গণিকা-গর্ভসম্ভূতো বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ।
তপসা ব্রাহ্মণো জাতঃ সংস্কারাঃ তত্র কারণাঃ।
জাতৌ ব্যাসস্তু কৈবর্ত্যাঃ শ্বপাক্যাঃ তু পরাশরাঃ।
বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তাঃ যে পূর্বমদ্বিজাঃ॥

অনুবাদ—বেশ্যাপুত্র মহামুনি বশিষ্ঠ তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইলেন। সৎ সংস্কারই উহার কারণ। ব্যাস কৈবর্ত্য বংশে এবং পরাশর চণ্ডালীর গর্ভে জাত হইয়াও ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী হন। যাঁহারা পূর্বে অদ্বিজ, অব্রাহ্মণ ছিলেন এরূপ অন্য বহু ব্যক্তি বিপ্রত্ব, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

সুতরাং অব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ হওয়া ভারতের পক্ষে অপূর্ব নহে। পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহা পরেও ঘটিবে। ভবিষ্য ভারতে প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ হইবে অর্থাৎ পরাবিদ্যায় পারদর্শী হইবে। ইহাই ভারতীয় সাম্যবাদের আদর্শ। ভারতীয় সাম্যবাদ আধ্যাত্মিক ; আর রুশীয় সাম্যবাদ অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক সাম্য অস্থায়ী ; কিন্তু অধ্যাত্ম সাম্য স্থায়ী। ভবিষ্য ভারত আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের ভিত্তিতে স্থাপিত হইবে। যে সত্যযুগ বা রামরাজ্য ভবিষ্যৎ ভারতে আবির্ভূত হইবে তাহার স্বপ্ন ভারত পূর্বে দেখিয়াছে। ভারতাত্মা বা ভারতশক্তি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রায় দেড় শতক ধরিয়া তপস্যা করিতেছে। সারা বিশ্বে যে নবযুগ আসন্ন তাহা প্রথমে ভারতেই প্রকটিত হইবে। প্রাচীন ভারতে ধর্ম সাধনা যে ব্যাপকতা লাভ করে নাই তাহা ভবিষ্যৎ ভারতেই দেখা যাইবে। অধ্যাত্ম জীবনে আত্মবিকাশের সম্ভাবনা অধিক, অসীম। ইহা মনে রাখিলে ধর্মদ্বেষ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইবে। অসুরশক্তি বা জড়শক্তি সহায়ে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে না। অধ্যাত্ম সাধনা দ্বারাই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। চারা গাছের ভাবী বৃহৎ রূপ যেমন

কল্পনা করা যায় তেমনি বর্তমান ভারতের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি মানস নয়নে দেখা যায়। কবি অতুলপ্রসাদ সেনের ভাষায় আমরা গান করি—

বল বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে॥
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে।
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে॥

———

# পরিশিষ্ট

## এক

## পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার *

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে হরিদ্বারে আবার পূর্ণকুম্ভ মেলা হইতেছে। এই উপলক্ষে ভারতের সকল প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী ও সাধু-সন্ন্যাসী উক্ত পুণ্যতীর্থে সমবেত। ফাল্গুন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত তিন মাস এই মেলা থাকিবে। পাঞ্জাবী বাস্তুহারাদের আগমনে হরিদ্বারের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইয়াছে। কুম্ভরাশিতে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে প্রায় বার-চৌদ্দ লক্ষ ধর্মপ্রাণ হিন্দু তথায় সমাগত। এই তিন চারি মাসের জন্য হরিদ্বার বিপুল জনাকীর্ণ স্থানে পরিণত। জনৈক পাশ্চাত্য পর্য্যটক গত বারে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্মমেলা।'

শাস্ত্রে আছে, 'অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা॥' অর্থাৎ অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুরী, কাশী, কাঞ্চী, উজ্জয়িনী ও দ্বারকা—এই সাতটি মোক্ষতীর্থ। মোক্ষতীর্থ মায়াপুরীর অন্য নাম হরিদ্বার। হরিদ্বারকে হরদ্বার বা গঙ্গাদ্বারও বলা হয়। হিমালয়স্থ কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ তীর্থের পথে ইহা দ্বারস্বরূপ। কেদারনাথ শিবতীর্থ এবং বদ্রীনারায়ণ বিষ্ণুতীর্থ। সেইজন্য শাস্ত্রোক্ত মুক্তিতীর্থ মায়াপুরীকে শৈবগণ হরদ্বার ও বৈষ্ণবগণ হরিদ্বার বলিয়া থাকেন। হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে মায়াদেবীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে ত্রিমস্তকবিশিষ্টা চতুর্ভুজা মায়াদেবী এবং তাঁহার সম্মুখে অষ্টবাহু সর্বনাথ শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মায়াপুরীর নামকরণ সম্বন্ধে পুরাণে এই বিবরণ পাওয়া যায়:—একদা

---

* প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫৬

প্রজাপতি দক্ষ একটি বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। স্বীয় জামাতা মহাদেবের সহিত মনোমালিন্য হেতু দক্ষরাজ তাঁহাকে যজ্ঞোৎসবে নিমন্ত্রণ করেন নাই। অন্যান্য দেবগণ মুনিঋষিদের দক্ষযজ্ঞে যাইতে দেখিয়া সতীদেবী শিবানুচরগণ সহ তথায় বিনা নিমন্ত্রণেই উপস্থিত হইলেন। দক্ষকন্যা যজ্ঞস্থলে অন্যান্য দেবগণের এবং পিতার অন্যান্য জামাতৃগণের যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট দেখিলেন। কিন্তু স্বীয় পতির জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা না দেখিয়া মর্মাহত হইয়া পিতা দক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাভাগ পিতৃদেব! এই যজ্ঞোৎসবে সকল দেবতা আপনার আমন্ত্রণে উপস্থিত এবং তাঁহাদের প্রাপ্য যজ্ঞাংশ নির্ধারিত। কিন্তু আমার পতির জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই কেন?" কন্যার প্রশ্নে দক্ষরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া দিগম্বর জামাতার নিন্দা করিলেন। পিতার মুখে পতিনিন্দা শ্রবণে পতিপ্রাণা সতী যজ্ঞস্থলে অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সতীর দেহত্যাগে ক্রুদ্ধ হইয়া বীরভদ্রাদি শিবানুচরগণ যজ্ঞ ধ্বংসের আয়োজনে মাতিয়া উঠিলেন এবং দক্ষের মুণ্ড ছিন্ন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। এই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে সমবেত দেবগণ একাগ্র চিত্তে আশুতোষ মহাদেবকে স্মরণ করিলেন। কৈলাসপতি দেবগণের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞস্থলে আগমনপূর্বক দক্ষের কবন্ধের উপর ছাগমুণ্ড স্থাপন করিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। জামাতার কৃপায় পুনরায় বাঁচিয়া উঠিয়া দক্ষ স্তবাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন, "এই যজ্ঞভূমি পুণ্যক্ষেত্র। এই মহাক্ষেত্রের নাম আজ হইতে মায়াপুর হইবে। ইহা তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এই তীর্থের স্মরণমাত্র সর্বপাপ মোচন হইবে। যাঁহারা এই তীর্থে বাস করিবেন তাঁহারা ধন্য। দক্ষেশ্বর শিবরূপে আমি এই তীর্থে বিরাজ করিব। দক্ষেশ্বরকে দর্শনমাত্র অষ্ট সিদ্ধি লাভ হইবে।" দক্ষের যজ্ঞস্থল হইতে বার যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমি মায়াপুরীর অন্তর্গত। কনখল, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থান মায়াপুরীর অন্তর্ভুক্ত।

কনখলে দক্ষেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। কনখল আদি গঙ্গার তীরবর্তী। এখানে গঙ্গা ত্রিধারায় বিভক্ত। দক্ষেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে সতীকুণ্ড,

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বাজার এবং দক্ষিণ দিকে মায়াপুর নামক স্থানে আর্য্য সমাজের গুরুকুল প্রভৃতি আশ্রম অবস্থিত। এই স্থানের নাম কনখল কেন হইল সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী আছে। একদা দক্ষালয়ে কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যখন ধর্মালোচনায় নিরত ছিলেন তখন ধর্মকেতু নামক এক নাস্তিক খল ব্রাহ্মণ এই সকল ব্রাহ্মণের যথাসর্বস্ব অপহরণ মানসে আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণে তাহার মনোভাবের পরিবর্তন হইল। অনুতপ্ত হৃদয়ে সে ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় মুক্তির উপায় জানিতে চাহিল। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে ভক্তিভরে দক্ষেশ্বর শিবমন্ত্র জপ এবং গঙ্গাস্নান করিতে উপদেশ দিলেন। এই নির্দ্দেশ পালন করিয়া খল ব্রাহ্মণ পরিত্রাণ লাভ করিল। 'কো ন খলঃ তরতি?' অর্থাৎ এমন খল কে আছে যে এই তীর্থে পরিত্রাণ লাভ না করিবে? স্থানমাহাত্ম্যে এখানে কেহ খল নাই। উক্ত অর্থে মুনিগণ এই তীর্থের নাম রাখিলেন কনখল।

হরিদ্বার হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহা উত্তর প্রদেশের সাহারাণপুর জেলার একটি অতি প্রাচীন স্থান। কলিকাতা হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ৯২২ মাইল। দিল্লী হইতে এখানে আসিবার উত্তম রেলপথ আছে। হরিদ্বার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটি ষ্টেশন—শৈবালিক নামক উন্নত শৈল শ্রেণীর পাদমূলে এবং গঙ্গার দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত। এখানে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিস, থানা, হাসপাতাল, প্রায় ত্রিশটি ধর্মশালা, বাজার, হাই স্কুল ও সংস্কৃত পাঠশালা আছে এবং একটি কলেজও সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, কপিল মুনি এখানে আশ্রম স্থাপনপূর্বক সাংখ্যদর্শন রচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য হরিদ্বারের আর একটি নাম কপিলস্থান। হরিদ্বার উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত। রায় বাহাদুর পতিরাম তাঁহার History of Garhwal নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, ছয়টি প্রধান হিন্দু দর্শনের প্রায় পাঁচটি উত্তরাখণ্ডে প্রণীত। সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ সগরের ষাট হাজার পুত্রের উদ্ধারার্থ পতিতপাবনী গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে এই তীর্থে আনয়ন করেন। এই জন্য হরিদ্বারের একটি নাম গঙ্গাদ্বার। গঙ্গোত্রী হইতে উদ্ভূত

গঙ্গা হিমালয়ের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া এখানে সমতল ভূমিতে অবতীর্ণা। হরিদ্বারের প্রধান তীর্থ ব্রহ্মকুণ্ড। কুম্ভযোগের সময় এখানে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী স্নান করিয়া পবিত্র হন। ব্রহ্মকুণ্ডে যে সুবিস্তৃত স্নানঘাট ও সুন্দর প্লাটফর্ম আছে তাহা ১৮৯৩ সালে পঁচাশি হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত। প্লাটফর্মে দানবীর বিরলা একটি সমুচ্চ ক্লক-টাওয়ার তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। ভগীরথের গঙ্গাকে মর্ত্তো আনয়ন কালে ইলাবৃত্তখণ্ডের রাজা শ্বেত এই স্থানে বহু বৎসর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা যখন বর দিতে চাহিলেন তখন রাজা শ্বেত করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, 'এখানে আমার আশ্রমে যতটুকু স্থান আছে ততটুকু আপনার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করুক এবং এখানে আপনি স্বয়ং গঙ্গা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে সর্বদা বিরাজমান থাকুন—ইহাই আমার প্রার্থনীয়।' ব্রহ্মা রাজার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'তথাস্তু'। এখন হইতে পৃথিবীতে এই স্থান ব্রহ্মকুণ্ড নামে পরিচিত হইল। যে কেহ এখানে স্নান-দানাদি করিবে তাহার অক্ষয় পুণ্য লাভ হইবে। কাহারও কাহারও মতে এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মার যজ্ঞে বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে প্রবিষ্টা হন। ব্রহ্মা স্বীয় কমণ্ডলু হইতে যে স্থানে গঙ্গাধারাকে মুক্তি দেন তাহাই ব্রহ্মকুণ্ড নামে অভিহিত।

ব্রহ্মকুণ্ডের পার্শ্বে প্রস্তরচিহ্নিত স্থানকে 'হর কী পৈড়ী' বলে। শৈবগণ ইহাকে হরপাদপদ্ম এবং বৈষ্ণবগণ হরিপাদপদ্ম জ্ঞান করেন। তীর্থ-যাত্রীগণ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানান্তে এই পাদপদ্ম দর্শন করেন। গঙ্গার পুণ্যধারাকে এমনই ভাবে এই ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করান হইয়াছে। ঘাটটি গঙ্গাবক্ষে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মত। দুইটি পুল দিয়া তীর হইতে ঘাটে যাইতে হয়। সন্ধ্যায় শত শত যাত্রী তথায় বসিয়া গঙ্গাপূজা করেন। ব্রহ্মকুণ্ডের সান্ধ্য দৃশ্য অতি মনোরম। যাত্রীগণ প্রজ্বলিত দীপমালাকে শালপাতার ঠোঙায় বসাইয়া ফুলের মালায় সাজাইয়া গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দেন। ভাসমান শত শত প্রদীপ তরঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে স্রোতের টানে যখন চলিতে থাকে তখনকার দৃশ্যটি অপূর্ব। ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে গঙ্গাতীরে মন্দিরে মন্দিরে

যখন সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে তখন ঘাটে দাঁড়াইয়া শত শত যাত্রী গঙ্গাদেবীর আরাত্রিক করেন।

এই বৎসর অমৃত কুম্ভযোগের সময় হরিদ্বারে তিনটি প্রধান তীর্থস্নান হইবে—৩রা ফাল্গুন শিবরাত্রি, ৪ঠা চৈত্র অমাবস্যা এবং ৩০শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে। কুম্ভযোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষ্ণুযোগ, ধর্মশাসন প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। মন্দার পর্বতকে মন্থন-দণ্ড, আর বাসুকি নাগকে মন্থনরজ্জুতে পরিণত করা হয় এবং বিষ্ণু কূর্মরূপ ধারণ করেন। অতঃপর হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত ক্ষীরোদ সাগর মন্থনার্থ দেবাসুরগণ মিলিত হন। সমুদ্র-মন্থনের ফলে গরল উত্থিত হইবামাত্র দেবতা এবং অসুর সকলেই মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন বিশ্বের কল্যাণার্থ মহাদেব উক্ত কালকূট পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। পুনরায় সমুদ্রমন্থনের ফলে অমৃতপূর্ণ কুম্ভ সহ ধন্বন্তরী সমুত্থিত হইয়া কুম্ভটী ইন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত দেবতাদিগের নির্দ্দেশে অমৃতপূর্ণ কুম্ভ লইয়া স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশে অসুরগণ বলপূর্বক অমৃতকুম্ভ অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দেবাসুরের এই তুমুল সংগ্রাম একাদিক্রমে দ্বাদশ দিবস চলিল। এই যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইলেন। যুদ্ধকালে তাঁহারা পৃথিবীর যে চারিটি তীর্থে অমৃতকুম্ভ লুকাইয়া রাখেন সেই সেই স্থানে কিছু কিছু অমৃত পড়িয়া যায়। তদবধি কুম্ভযোগ উক্ত চারিটি তীর্থে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ভগবান মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়া কুম্ভস্থ সুধা দেবগণের মধ্যে বিতরণ করেন। অসুরগণ যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও সুধালাভে বঞ্চিত হয়। দেবলোকের দ্বাদশ দিবস মর্ত্যলোকের দ্বাদশ বৎসরের সমান। তাই দ্বাদশ বর্ষ অন্তে এক এক বার গঙ্গাতীরে হরিদ্বার, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ, শিপ্রাতটে উজ্জয়িনী এবং গোদাবরীতটস্থ নাসিকে কুম্ভস্নান ও তদুপলক্ষে কুম্ভ মেলা হয়।

দেবাসুর সংগ্রামের সময় দেবগণের মধ্যে বৃহস্পতি, চন্দ্র, সূর্য্য ও শনি কুম্ভরক্ষা করিয়াছিলেন। এইজন্য উক্ত দেবচতুষ্টয় বিভিন্ন রাশিতে অবস্থান

করিলে বিভিন্ন স্থানে কুম্ভযোগ হয়। স্কন্দপুরাণে আছে, 'কর্কেগু রুস্তথাভানুচন্দ্র-ক্ষয়স্তথা যদা। গোদাবর্য্যাং তদা কুম্ভং জায়তে অবনীমণ্ডলে॥' অর্থাৎ কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি, চন্দ্র ও সূর্য্যের একত্র অবস্থান কালে অমাবস্যা যোগ ঘটিলে গোদাবরীতটে নাসিকে কুম্ভমেলা হয়। উক্ত পুরাণে আছে, 'ঘটে সুরি শশি সূর্য্যাঃ দামোদরে স্থিতা যদা। ধারায়াং চ তদা কুম্ভ জায়তে খলু মুক্তিদঃ॥' অর্থাৎ তুলা রাশিতে বৃহস্পতি, সূর্য্য ও চন্দ্র যখন অবস্থান করেন তখন অমাবস্যা তিথি হইলে ধারাতে (উজ্জয়িনীতে) কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। এই পুরাণেই আছে, 'মেষরাশি গতে জীবে মকরে চন্দ্র-ভাস্করৌ। অমাবস্যা তদা যোগঃ কুম্ভাখ্যস্তীর্থনায়কে॥' অর্থাৎ বৃহস্পতি মেষরাশিতে এবং সূর্য্য ও চন্দ্র মকররাশিতে থাকিলে তীর্থরাজ প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয়। উক্ত পুরাণে আরও আছে, 'পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশি গতে গুরৌ। গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগ কুম্ভনামা তদোত্তমম্॥' অর্থাৎ বৃহস্পতির কুম্ভরাশিতে এবং সূর্য্যের মেষরাশিতে অবস্থানকালে হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। অন্যান্য শাস্ত্রেও কুম্ভস্নানের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। একস্থানে আছে, 'গঙ্গায়া স্নানমাহাত্ম্যং নালং বক্তুং চতুর্মুখঃ। হরিদ্বারে কৃতং স্নানং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জনম্॥' অর্থাৎ হরিদ্বারে কুম্ভযোগে গঙ্গাস্নানের পুণ্যফল বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এই স্নানের ফলে মুক্তিলাভ হয় এবং পুনর্জন্ম হয় না।

কুম্ভমেলা কত প্রাচীন সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের অনুকরণে হিন্দু ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য আচার্য্য শংকর কর্তৃক কুম্ভমেলা প্রবর্ত্তিত হয়। শংকরের পূর্বে কুম্ভমেলা হইত কিনা, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইলেও ইহাতে শংকরের অনুগামী দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনে হয়, আচার্য্য শংকর এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের প্রচেষ্টায় ইহা হিন্দু ভারতের বৃহত্তম ধর্মমেলায় পরিণত হইয়াছে। দশনামী

সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ব্যতীত বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, কুলাচারী, অবধূত, আলেখিয়া, পঞ্চধুনী, লিঙ্গায়েৎ, অঘোরপন্থী, উদাসী প্রভৃতি বহু ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুগণ এখানে উপস্থিত হন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একটি আড্ডা দেখা যায় এবং তথায় ব্রাহ্ম মুহূর্ত হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর সম্মুখে শাস্ত্রপাঠ, ভজন, আলোচনাদি চলিতে থাকে। তিন মাস ব্যাপী কুম্ভ মেলার সময় হরিদ্বার স্বর্গধামে পরিণত হয়। তখন এই পুণ্যতীর্থে যে দিব্যভাবের সুরধনী প্রবাহিত হয়, তাহা যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর জীবনে ভুলিতে পারিবেন না। হিন্দু জাতির প্রাণশক্তির অনন্ত উৎস কোথায় তাহা কুম্ভমেলা দেখিলে বুঝা যায়।

কুম্ভ স্নানে সময় সময় বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেজন্য সরকারকে শান্তিরক্ষার্থ সশস্ত্র পুলিসের ব্যবস্থা করিতে হয়। গতবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময় আসন ও স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া উৎকলের বিখ্যাত জগন্নাথ বাবাজীর দলের সহিত অন্যান্য কয়েকটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিরোধ উপস্থিত হয়। ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিরোধ আগেকার দিনের কুম্ভমেলায় ঘটিত। এশিয়াটিক রিসার্চ গ্রন্থে (৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা) উল্লিখিত আছে যে, দারিস্তান নামক পারসীক পুস্তকে দেখা যায়, ১৭১৭ শকে হরিদ্বার কুম্ভে শিখসম্প্রদায় দুই দল সাধুকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করেন। এশিয়াটিক রিসার্চেস্ গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা) আরও উল্লিখিত আছে ১৭২৯।৩০ শকে হরিদ্বারে ধর্মোন্মত্ত শৈব সন্ন্যাসীগণ আঠার হাজার বৈরাগীদের হত্যা করেন। ১৭৬০ সনে গোস্বামী ও বৈরাগীদের দাঙ্গায় প্রায় দুই হাজার যাত্রী নিহত হইয়াছিল। ১৭৯৫ সনে শিব-তীর্থের যাত্রীগণ পাঁচ শত গোস্বামীকে হত্যা করেন। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের অধিনায়কদের সম্মিলিত চেষ্টায় এই প্রকার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এখন বন্ধ হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের কয়েকজন হিন্দু রাজা এবং সন্ন্যাসীদের মণ্ডলেশ্বর মিলিত হইয়া এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, শংকর প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের এক একটি এক এক স্থানের কুম্ভমেলায় অগ্রে স্নান করিবেন এবং তৎপরে পর্য্যায় ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্নান হইবে।

ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্বদিকে চণ্ডী পাহাড়। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় দুই হাজার ফুট উচ্চ। উহার একটি চূড়ায় চণ্ডীদেবীর একটি প্রাচীন মন্দির ও অন্য চূড়ায় হনুমানের মাতা অঞ্জনাদেবীর মন্দির বিদ্যমান। নীলধারা অতিক্রম করিয়া চণ্ডীপাহাড় যাইতে হয়। চণ্ডী পাহাড় হইতে হরিদ্বারের দৃশ্য অতি সুন্দর। ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমে মনসা পাহাড়। উহার শিখরে মনসা দেবীর মন্দির অবস্থিত। মনসা পাহাড় হইতে ব্রহ্মকুণ্ডের দৃশ্য অতীব মনোহর। মনসা পাহাড় কাটিয়া দুইটী রেলওয়ে সুড়ঙ্গ নির্মিত। এখান হইতে চারি শত মাইল খাল খনন করিয়া সরকার উত্তরপ্রদেশে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মকুণ্ড ও নীলধারার নিকটে উচ্চ বাঁধ নির্মাণ করিয়া গঙ্গাস্রোতকে খালের মধ্যে আনা হইয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণে অল্প দূরে কুশাবর্ত তীর্থ অবস্থিত। লোকের বিশ্বাস—এখানে গঙ্গাস্নান ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি করিলে মুক্তিলাভ হয়। প্রবাদ আছে যে, ঋষি দত্তাত্রেয় এই তীর্থে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেন। তিনি যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন গঙ্গা আসিয়া তাঁহার কোশাকুশি ও কুশাদি ভাসাইয়া লইয়া যান। কিন্তু কুশগুলি আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছিল। ঋষি দত্তাত্রেয় ধ্যানভঙ্গের পর স্বীয় কুশাদি গঙ্গাস্রোতে আবর্ত্তিত হইতেছে দেখিয়া ক্রোধে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার নিকট আসিয়া স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবতাগণের ভক্তিপূর্ণ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ঋষি বলিলেন, এই তীর্থ কুশাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হউক। আপনারা সকলে এখানে অবস্থান করুন। যাঁহারা এখানে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিবেন তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হইবে না।

হরিদ্বারের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। ইহা কনখল ক্যানেলের তীরে অবস্থিত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ উক্ত সেবাশ্রম এই পুণ্যতীর্থের শত শত সাধু-সন্ন্যাসী ও তীর্থ-যাত্রীর সুখসাচ্ছন্দ্য বিধান এবং সেবাশুশ্রূষা করিয়া আসিতেছে। সেবাশ্রমে পঞ্চাশটী বেডযুক্ত হাসপাতাল, বৃহৎ ডিস্‌পেন্সারী, অতিথিশালা, যক্ষ্মারোগীর ওয়ার্ড, মন্দির ও লাইব্রেরী

প্রভৃতি আছে। এই বৎসর কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে আরও পঞ্চাশটি অস্থায়ী বেড বাড়ানো হইয়াছে। সেবাশ্রমে তাঁবু ফেলিয়া এবং খড়ের 'কুঠিয়া' করিয়া প্রায় এক সহস্র সাধু ও গৃহী তীর্থযাত্রী অস্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিলেন। হরিদ্বারের তিনটি স্থানে তিনটি চিকিৎসাকেন্দ্র খুলিয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সেবকগণ শত শত পীড়িত তীর্থযাত্রীকে ঔষধ-পথ্যাদি দিয়াছেন। তাঁহাদের ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়টি তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরিয়া রুগ্ন-নারায়ণের সেবাশুশ্রূষা করিয়াছে। উক্ত সেবাশ্রম স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত তৎশিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ কর্তৃক ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বামী কল্যাণানন্দ যখন হরিদ্বারে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া সেবাকার্য্য আরম্ভ করেন তখন স্থানীয় সাধুসম্প্রদায় তাঁহাকে আমল দেন নাই। ভাঙ্গী-মেথরদের সেবাকার্য্য করিতেন বলিয়া তাঁহাকে অন্নসত্রেও ভিক্ষা দিত না। তিনি এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া গুরুর আশীর্বাদে অবিচলিত চিত্তে গুরুভ্রাতা স্বামী নিশ্চয়ানন্দের সহযোগিতায় প্রায় ছত্রিশ বৎসর কাল একনিষ্ঠ ভাবে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই সেবাশ্রম আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার কোন বদান্য ব্যক্তির অর্থসাহায্যে স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯০৩ সনের এপ্রিল মাসে প্রায় পনর বিঘা জমি ক্রয় করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার সেবাকার্য্য সরকারের সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

পূর্বাশ্রমে স্বামী কল্যাণানন্দের নাম ছিল দক্ষিণারঞ্জন গুহ। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার অন্তর্বর্তী বানরীপাড়া গ্রামে দক্ষিণারঞ্জন ১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণারঞ্জন যখন হাই স্কুলের ছাত্র তখন হইতে আর্তের সেবায় বিমল আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৯৮ খ্রীঃ বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৮৯৯ সালের প্রথমার্ধে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক স্বামী কল্যাণানন্দ নাম গ্রহণ করেন। স্বামী কল্যাণানন্দজীর গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। ১৯০১ সনে তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ যখন বেলুড় মঠে বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতে ছিলেন

তখন তিনি কলিকাতা হইতে কিছু বরফ আনিবার জন্য আদিষ্ট হন। তখন কলিকাতা ও বেলুড়ের মধ্যে 'বাস' বা ষ্টীমার চলিত না। গুরুভক্ত কল্যাণানন্দ অবিলম্বে কলিকাতা গিয়া প্রায় আধ মণ বরফ লইয়া বেলুড় মঠে আসেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 'ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন কল্যাণানন্দ সেবার দ্বারাই পরমহংসত্ব লাভ করিবে।'

স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯১২ সনে কলিকাতা হইতে দুর্গাপ্রতিমা আনাইয়া কনখল সেবাশ্রমে দুর্গাপূজা করেন। তখন হইতে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা ও কালীপূজাদি নিয়মিত ভাবে উক্ত সেবাশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সেবাশ্রমের গ্রন্থাগারে ৩৭৭১ খানি গ্রন্থ আছে। উক্ত সেবাশ্রম এই পুণ্যতীর্থে বাঙালীর এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। হরিদ্বারে লালতারা বাগে ভোলাগিরির আশ্রমটিও বাঙালী সন্ন্যাসীদের বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না। উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিও বাঙালী সন্ন্যাসী ও উত্তর-ভারতের সাধু-সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। কনখলের অনতিদূরে গুরুকুলের কলেজ, বৃহৎ লাইব্রেরী, গোশালা, এবং বিরলা-প্রতিষ্টিত উপাসনালয় দর্শনীয়। কনখলে ক্যানেলের অপর পার্শ্বে ঋষিকুল বিদ্যালয়। ইহা সনাতনী হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। ছাত্রগণকে এখানে গুরুর সান্নিধ্যে রাখিয়া প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রাদি ও আধুনিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। গুরুকুলের নিকটবর্তী গুরুমণ্ডলে 'হরিবংশ' গ্রন্থের একখানি পুরাতন পাণ্ডুলিপি আছে।

হরিদ্বারে বিল্বকেশ্বর, নীলতীর্থ প্রভৃতি আরও বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। চণ্ডী পাহাড়ের প্রাচীন নাম নীলগিরি বা নীল পর্বত। নীল পর্বতে ভগবতী চণ্ডী তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উহার একাংশকে চণ্ডী পাহাড় বলে। নীল পর্বতের পাদদেশে প্রবাহিতা গঙ্গাকে নীলধারা বলা হয়। কথিত আছে, কোন ব্রাহ্মণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে নীল নামক গণরাজ হইবার বর দেন এবং স্বয়ং নীলেশ্বর নামে তথায় বিরাজ করেন। চণ্ডী মন্দির হইতে এক ফার্লং উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে নীলেশ্বর মন্দির এবং নীলগিরির সানুদেশে গঙ্গাতীরে নীলকুণ্ড অবস্থিত। শাস্ত্রে বলে, নীলকুণ্ডে

স্নান করিলে স্নানার্থী পাপমুক্ত ও শিবময় হইয়া যান। হরিদ্বার হইতে কনখল যাইবার পথে লালতারা নামক যে পুল আছে সেই পুল পার হইয়া রেলপথ অতিক্রম করিলে পাহাড়ের নীচে একটি মনোরম স্থানে বিল্বকেশ্বর মন্দির দেখা যায়। উহার অনতিদূরে পাহাড়ে একটি গুম্ফায় একটি দেবীমূর্ত্তি। উভয় মন্দিরের মধ্যস্থান দিয়া প্রবাহিতা পাহাড়ী নদীর নাম শিবধারা। একমাত্র বর্ষাকালেই শিবধারা জলপূর্ণ থাকে। যাত্রীগণ হরিদ্বারে রামতীর্থ, লক্ষ্মণতীর্থ প্রভৃতি আরও অনেক তীর্থ দর্শন করেন।

হরিদ্বার সাধু-সন্ন্যাসীদের স্থান। শত শত ব্রহ্মচারী ও সাধু-সন্ন্যাসী এখানে বাস করেন। তাঁহাদের জন্য প্রায় শতাধিক মঠ, আশ্রম ও আখড়াদি আছে। হরিদ্বারে নিরঞ্জনী আখড়া, জুনা আখড়া, ও আনন্দ আখড়া, ভীমগড়ায় দশনামী আখড়া, কমলদাসের কুঠিয়া ও কৈলাস আশ্রম এবং কনখলে নির্বাণী আখড়া, ঘণ্টা কুঠিয়া, সুরথগিরির বাংলো, অটল আখড়া, হরি ভারতীর মঠ, রামনিবাস, হরিহর আশ্রম, চেতনদেবের কুঠিয়া, মুনিমণ্ডল, ও বিরক্ত কুঠিয়া প্রভৃতি বহু আশ্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণ থাকেন। কুম্ভমেলার সময় নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীগণ বিশেষ ভাবে ধর্ম প্রচার এবং সেবাকার্য্য করেন। তখন বিরাট প্রদর্শনীও খোলা হয়। কাশী, নাসিক প্রভৃতির ন্যায় হরিদ্বারেও শতাধিক সংস্কৃত পাঠশালা আছে। সেগুলিতে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীকে পণ্ডিতগণ ন্যায়, বেদান্ত, ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন। হিন্দুস্থানের তীর্থগুলি হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এই তীর্থস্থানসমূহের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য আমরা যতই মনোযোগী হইব ততই হিন্দু সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক আদর্শ ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইয়া আমাদের সমাজ জীবনকে পুষ্ট করিবে।

---

# দুই

# পাণিহাটী তীর্থে *

১লা জুন রবিবার, ১৯৪৭ সাল সকালে বেলুড়মঠ হইতে মোটর বাসে কোন্নগর যাইয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া পাণিহাটীতে উপস্থিত হইলাম। সেই দিন পাণিহাটীতে রঘুনাথ দাসের দণ্ড-মহোৎসব ছিল। স্থানীয় হিন্দুসংগঠন সমিতিতে বিশ্রামানন্তর তীর্থদর্শনে বহির্গত হইলাম। পাণিহাটী কলিকাতা হইতে চারি ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত একটি বৃহৎ গ্রাম। এখানে একটি হাই স্কুল, মিউনিসিপ্যালিটি ও লাইব্রেরী প্রভৃতি আছে। চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত এই গ্রামে এখন বহু শিক্ষিত লোকের বাস। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে উহার লোকসংখ্যা ছিল চারি হাজার মাত্র। রাস্তা বাদে গ্রামটির পরিমাণ ৫১৮ একর জমি। ইহার উপর দিয়া তিনটি রাস্তা গিয়াছে—বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, মুর্শিদাবাদ রোড এবং রাজা চন্দ্রকেতু রোড। প্রথম রাস্তাটি সুপ্রশস্ত এবং দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত। এই পথে কলিকাতা পর্য্যন্ত মোটর বাস যাতায়াত করে। দ্বিতীয় রাস্তাটি পাণিহাটীর পূর্ব্ব দিক দিয়া কলিকাতায় গিয়াছে। এই পথে নবাবের সৈন্যাদি মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিত। তৃতীয় রাস্তাটি রাজা রামচন্দ্রের ঘাট হইতে যশোহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যশোহর জেলায় যে 'পেনেটি ধানের' আবাদ হয় তাহা পাণিহাটী হইতে আমদানী। মুসলমান রাজত্বকালে 'পাণিহাটী একটি মহকুমায় পরিণত হয়। শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ৶০ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন হোসেন খাঁ 'সাহ' উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা হইলে পাণিহাটীতে একজন কাজী রাখিলেন।

---

* মাসিক বসুমতী, কার্ত্তিক, ১৩৫৪ সাল

ঐ কাজী সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। রাজা চন্দ্রকেতু কর্তৃক নির্মিত হংসডিম্বাকৃতি পয়ঃপ্রণালীর সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও এই গ্রামে দেখা যায়। পাণিহাটী একদা রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল।

পাণিহাটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম তীর্থ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উক্ত আছে, শচীর মন্দির, নিত্যানন্দের নর্তন, রাঘব-ভবন এবং শ্রীবাস কীর্তনে মহাপ্রভুর সদা আবির্ভাব। শ্রীবাসের অঙ্গন গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত। শচী দেবী এবং নিত্যানন্দ প্রভু অপ্রকট। একমাত্র রাঘব-ভবন পাণিহাটীর উত্তরাংশে অদ্যাপি বর্তমান। পাণিহাটী রাঘব পণ্ডিতের জন্মভূমি। চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দের লীলার দ্বারা পাণিহাটি বাংলার অমৃত তীর্থে পরিণত। নিত্যানন্দ ১৪৩৮ শকে (১৫১৬ খৃঃ) পাণিহাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন গ্রামটি সমৃদ্ধ, শ্রীসম্পন্ন এবং পণ্ডিতগণের নিবাসস্থান ছিল। রাজা বল্লাল সেনের সময়ে ১১০২ খৃঃ উহা যে জনবহুল ও প্রসিদ্ধ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মেলগ্রন্থে পাণিহাটীর 'করবংশ' বিখ্যাত। 'কর' উপাধিধারী বহু কায়স্থ তখন পাণিহাটীতে বাস করিতেন। কর কায়স্থগণ 'পাণিহাটীর কর' বলিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন। কায়স্থ সমাজের মেলবন্ধন বল্লাল সেনের সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরেই হইয়াছে। বর্তমানে পাণিহাটীতে উক্ত করবংশজ মাত্র এক ঘর কায়স্থের বাস আছে। পাণিহাটীবাসী জনৈক মকরধ্বজ কর রাঘব পণ্ডিতের অনুরক্ত শিষ্য ও একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ইনি অতিশয় সুগায়ক ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁহার মধুর কণ্ঠের গান শুনিতে খুব ভালবাসিতেন। ইঁহাদের বংশধরগণ 'পাণিহাটীর কর' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মকরধ্বজ কর রাঘব পণ্ডিতের 'আদ্য অনুচর'রূপে বর্ণিত এবং 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে তাঁহাকে 'সুকেশী' বলা হইয়াছে। ইনিই রাঘব পণ্ডিতের 'ঝালি' প্রত্যেক বৎসর বহু বাহকের মস্তকে করিয়া পুরীধামে মহাপ্রভুর সন্নিধানে পৌঁছাইয়া দিতেন। পাণিহাটীর মধ্যস্থলে (মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের ফুল পুকুরের বাগান মধ্যে) 'বনদেবীর আস্তানা' আছে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিবসে আসিয়া হিংস্র পশ্বাদির উপদ্রব

নিবারণার্থ ঐ স্থানে বনদেবীর পূজা দেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, অতি প্রাচীন কালে গ্রামটি শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। পাণিহাটীর ইতিবৃত্ত সংগ্রাহক ৺অমূল্যধন রায় বলেন, পাণিহাটী সহস্র বৎসরাধিক প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ গ্রাম। বাংলায় এত প্রাচীন ও পুণ্য গ্রাম বিরল।[১] ইহার পূর্ব-নাম ছিল পণ্যহট্ট বা পুণ্যহট্ট। বিগত শতাব্দীতেও উহা প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

মহাপ্রভু পাণিহাটীতে দুইবার পদার্পণ করেন—একবার ১৫১৫ খ্রীঃ অব্দে পুরীধাম হইতে আসিবার পথে এবং আর একবার পুরীধাম যাইবার পথে। প্রথমবার আগমনের কথা 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটকে বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় বারের কথা শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে' সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রথম বারে পিছলদা হইতে মহাপ্রভু নৌকাযোগে পাণিহাটীতে আসিয়া গঙ্গাতীরস্থ বটবৃক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে ইষ্টকনির্মিত ঘাটে অবতরণ করেন। তাঁহার পদরজপূত ঘাটটি এখনও ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান। বটগাছটি নিত্যানন্দের লীলাস্থল এবং পাঁচ শত বৎসরাধিক প্রাচীন। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে অবস্থিত ১২৫।১৫০ বৎসরের পুরাতন বটগাছ দেখিবার জন্য আমরা ছুটিয়া যাই; আর পাঁচ-ছয় শত বৎসর প্রাচীন পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত এই বটগাছ দেখিতে কয় জন আসেন? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্র কোথা হইতে অসংখ্য লোক শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ বটতলায় লোকারণ্য হইল। সমবেত দর্শনার্থিগণের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কম্পিত হইল মহাপ্রভু ভিড়ের জন্য উপরে উঠিতে পারিতেছিলেন না। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত নাটকে ভিড়ের এইরূপ বর্ণনা আছে, "ধরণীর ধূলিরাশি বুঝি এই সব লোকে পরিণত হইল অথবা আকাশে যত তারকা ছিল তাহারা সব মানুষ হইয়া পৃথিবীতে নামিল।" রাঘব পণ্ডিত শশব্যস্ত হইয়া গললগ্নীকৃত-বাসে মহাপ্রভুর চরণে ভূমিষ্ঠ হইলেন। মহাপ্রভু নাবিককে স্বীয় পরিধানের

১ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩২২ সালে প্রকাশিত ৺অমূল্যধন রায়ের 'পাণিহাটী 'মাহাত্ম্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বস্ত্র প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। তিনি রাঘবের সঙ্গে লোকারণ্যের মধ্য দিয়া রাঘবালয়ে গমন করিলেন। তখন তিনি জন-সমুদ্রের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। এতদঞ্চলের লোকে প্রেমাবতারকে প্রথম দর্শন করিয়া ধন্য হইল। মহাপ্রভু এক রাত্রি রাঘব-গৃহে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস কুমারহট্টে শ্রীনিবাস সমীপে গমন করিলেন। পুরীধামে প্রত্যাগমন কালে মহাপ্রভুর পাণিহাটীতে অবস্থানের কথা যাহা চৈতন্যভাগবতে বিবৃত আছে তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীবাস-গৃহে কিছু দিন থাকিয়া মহাপ্রভু পাণিহাটীতে রাঘব-মন্দিরে আগমন করেন। রাঘব পণ্ডিত প্রেমের ঠাকুরকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু পণ্ডিতকে আলিঙ্গন ও কৃপা করিয়া কহিলেন, 'রাঘবকে দেখিয়া আমার সব দুঃখ দূর হইল। গঙ্গাস্নান করিলে যে সন্তোষ লাভ হয় তাহা রাঘব-আলয়ে পাইলাম।' মহাপ্রভু পণ্ডিতকে রন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। রাঘব পরমানন্দে নানা ব্যঞ্জন রাঁধিলেন। নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভু আহার করিয়া প্রশংসাপূর্বক বলিলেন, 'রাঘবের কি সুন্দর পাক। এমন সুস্বাদু শাক আমি কোথাও খাই নাই।' এই সময় গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ মহাপ্রভু-দর্শনে পাণিহাটীতে আসেন। মহাপ্রভু রাঘব পণ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "রাঘব, তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। নিত্যানন্দ ব্যতীত আমার দ্বিতীয় কেহ নাই। নিত্যানন্দ আমাকে যেরূপ করান আমি সেইরূপ করি। যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ—ভেদ নাই। তোমার গৃহে সকলেই বিরাজমান। তুমি সাবধানে নিত্যানন্দের সেবা করিও।" ইহার পর রাঘবের প্রিয় শিষ্য মকরধ্বজ করকে ডাকিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "মকরধ্বজ, তুমি ভাগ্যবান্। কায়মনোবাক্যে রাঘব পণ্ডিতের সেবা করিও। তুমি রাঘবের প্রতি যাহা করিবে, তৎসমুদয় আমারই প্রতি করা হইবে, তাহা নিশ্চিত জানিও।"

শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গদেবের আদেশে নিত্যানন্দ নাম প্রচারের জন্য বাংলা দেশে শুভাগমন করেন। তিনি পাণিহাটীতে রাঘব-ভবনে সর্বপ্রথম

প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন অভিরাম, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস, মুরারি, কমলাকর পিপলাই, সদাশিব, পুরন্দর, কৃষ্ণদাস হোড়, পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরিদাস পণ্ডিত, উদ্ধারণ দাস প্রভৃতি বহু ভক্ত। রাঘব পণ্ডিত মহা সমারোহে সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুকে স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। রাঘব-গৃহে নিত্যানন্দ কীর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করিলেন। মুকুন্দ ঘোষ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই কীর্ত্তনের সুন্দর চিত্র চৈতন্যভাগবতে আছে। মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব—এই তিন ভ্রাতা ভজন গাহিলেন। নিতাই যাঁহাকে প্রেমদৃষ্টি করিলেন তিনিই প্রেমে অভিভূত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ত্রিবেণী হইতে পাণিহাটী পর্য্যন্ত নানা স্থান হইতে অসংখ্য লোক রাঘব-ভবনে কীর্ত্তন দেখিতে আসিলেন। পাণিহাটীতে নিতাই এত প্রেমবিহ্বল থাকিতেন যে, আদৌ তাঁহার বাহ্য জ্ঞান থাকিত না।

নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে চৈতন্যদেব যেমন মহাভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন নিত্যানন্দও তদ্রূপ পাণিহাটীতে রাঘব-ভবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। একদিন মধুর নৃত্য-কীর্ত্তন হইতেছিল, এমন সময় নিতাই মন্দিরস্থিত বিষ্ণুখট্টায় উপবেশনপূর্বক ভক্তগণের প্রতি আদেশ করিলেন, 'আজ আমার অভিষেক কর'। মহানন্দজনক আজ্ঞা পাইয়া রাঘব-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রেমোন্মত্ত হইলেন। তাঁহারা অভিষেকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ সংগৃহীত হইল। বহু মৃৎকলসীতে বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সহ পবিত্র গঙ্গাবারি পূর্ণ করা হইল। দামোদর পণ্ডিত অভিষেক মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক নিত্যানন্দের মস্তকে সুবাসিত গঙ্গাজল ঢালিতে লাগিলেন। হরিধ্বনিতে জলস্থল কম্পিত হইল। অভিষেকান্তে রাঘব পণ্ডিত নূতন গামছা দ্বারা নিতাইর শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া নূতন বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। নরহরি কর্তৃক শ্রীঅঙ্গ অগুরু-চন্দন-চুয়াদিতে চর্চিত হইল। তুলসী সহিত সুন্দর সুগন্ধি ফুলের মালা তাঁহার গলদেশে লম্বিত হইল। অতঃপর সুসজ্জিত খট্টায় দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে নিতাই প্রভু উপবেশন করিলেন। রাঘব পণ্ডিত

শ্রীমস্তকে ছত্র ধরিলেন। কেহ চামর, কেহ গন্ধ, কেহ তাম্বুল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া প্রভুর সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভক্তগণ মহানন্দে বাহ্যজ্ঞানহীন। 'নিত্যানন্দ বংশবিস্তার' গ্রন্থে আছে, "প্রভু নিত্যানন্দ স্বানুভবানন্দে প্রেমদৃষ্টি করিয়া চারি দিকে চাহিলেন।" পাণিহাটীতে নিত্যানন্দের অভিষেক সম্বন্ধে বহু পদ রচিত হইয়াছে। ভক্তি-রত্নাকর, চৈতন্য-ভাগবতাদি গ্রন্থে উক্ত অভিষেকের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দ সিংহাসনোপরি উপবেশনপূর্বক পণ্ডিত রাঘবকে আজ্ঞা করিলেন, 'রাঘব কদম্ব ফুল আমার অতি প্রিয়। তুমি কদম্বের মালা আমাকে উপহার দাও।' রাঘব করযোড়ে কহিলেন, 'শ্রীপাদ, এই সময়ে তো কদম্ব ফুল ফোটে না; কিরূপে আপনার আজ্ঞা পালন করিব?' প্রভু বলিলেন, 'বাটীর মধ্যে যাইয়া একবার তোমার উদ্যান দেখ দেখি, পাইলেও পাইতে পার।' রাঘব পণ্ডিত বাটীর মধ্যে গমনপূর্বক দেখিলেন, জাম্বিরের গাছে বিস্তর কদম্ব ফুল ফুটিয়া আছে। তদ্দর্শনে রাঘব অতীত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভক্তগণ অপূর্ব কদম্ব পুষ্পের সৌরভে বিহ্বলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কদম্বের মালা গাঁথিয়া রাঘব নিত্যানন্দের গলদেশে প্রদান করিলেন। তখন সকলে পরমানন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন। এইরূপ প্রেমানন্দে সকলে মগ্ন আছেন, এমন সময় ভক্তগণ অদ্ভুত দমনক পুষ্পের মনোহর সুগন্ধ অনুভব করিলেন। তখন নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনও সুগন্ধ তোমরা নাসিকায় অনুভব করিতেছ?' ভক্তগণ বলিলেন, "হাঁ প্রভু, দমনক পুষ্পের গন্ধের মত অতি মনোহর সুগন্ধ আমরা পাইতেছি।" প্রভু—'ইহার গুপ্ত রহস্য কেহ কি বুঝিতে পারিয়াছ?' ভক্তগণ—'আজ্ঞে না।' প্রভু—শ্রীগৌরাঙ্গদেব তোমাদের কীর্তন শুনিতে নীলাচল হইতে রাঘব-ভবনে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার গলদেশের দমনক পুষ্পের মালার সুগন্ধ তোমরা পাইতেছ। অতএব সর্বকার্য্য পরিহারপূর্বক মধুর কৃষ্ণনাম কর।' এই বলিয়া হুঙ্কারান্তে সর্বলোকের উপর প্রেমদৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার কৃপাকটাক্ষে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর দেহজ্ঞান লুপ্ত হইল। চৈতন্যভাগবতমতে প্রেমোন্মত্ত

ভক্তগণের কেহ বৃক্ষশাখায় উঠিলেন, কেহ পাতায় বেড়াইলেন ; কিন্তু পড়িলেন না, কেহ প্রেমানন্দে হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, কেহ গুবাকবনে যাইয়া প্রেমবলে ৫।৭ গাছ গুয়া একত্রে তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলিলেন। অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম, পুলক, হুঙ্কার, স্তবভঙ্গ, বৈবর্ণ্যাদি প্রেমভাব তাঁহাদের শরীরে উপস্থিত হইল। তখন নিত্যানন্দ তাঁহার পারিষদগণের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে প্রচারকার্য্যের উপযুক্ত করিলেন। পারিষদগণের প্রত্যেকে তাঁহার করুণায় সর্বজ্ঞ, বাক্‌সিদ্ধ ও কন্দর্প-দেহ হইলেন। তাঁহারা যাহাকে স্পর্শ করিলেন সে-ও প্রেমবিহ্বল হইল। এইরূপে নানা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ করিয়া নিত্যানন্দ তিন মাস পাণিহাটীতে অবস্থান করেন।

একদিন নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের মূলে বেদীর উপরে ভক্তবেষ্টিত হইয়া কোটি সূর্য্যের জ্যোতিঃ বিকাশপূর্বক উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় সপ্তগ্রামের রাজপুত্র রঘুনাথ দাস দণ্ডবৎ হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। জনৈক ভক্ত প্রভুকে উক্ত সুদর্শন যুবকের পরিচয় দিলেন। প্রভুর দৃষ্টি রঘুনাথের উপর পতিত হইল। তিনি রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এস, তোমাকে দণ্ড দিই।' প্রভু ডাকিতেছেন ; কিন্তু রঘুনাথ আসিতেছেন না। সলজ্জ ও সঙ্কুচিত ভাবে তিনি পূর্বস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন প্রভু উঠিয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং তাঁহার মস্তকে পদস্থাপন করিলেন। রঘুনাথ দাস ছিলেন একুশ লক্ষ টাকার মালিক রাজপুত্র। তাঁহার বিশাল জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল নয় লক্ষ টাকা। তাঁহার অপরূপ কান্তি, অতুল বৈভব এবং সুন্দরী স্ত্রী ছিল। তাঁহাকে নিত্যানন্দ এই দণ্ড দিলেন—'চিড়া দধি আনিয়া ভক্তগণকে ভোজন করাও।' রঘুনাথের আদেশে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, চিনি, চিড়া, কলা, ঘৃত, কর্পূরাদি দ্রব্য তথায় রাশীকৃত করা হইল। বড় বড় মাটির গামলায় গরম দুধ ও চিড়া ভিজাইয়া তাহাতে দধি, চিনি, কলাদি দিয়া ভোগ প্রস্তুত করা হইল।

আয়োজন সমাপ্ত হইলে নিত্যানন্দ মাল্যাদিতে সজ্জিত হইয়া বেদীর উপরে বসিলেন। তাঁহার পার্শ্বে ভক্তগণ ও সম্ভ্রান্ত পণ্ডিতগণ উপবিষ্ট।

বৃক্ষতলে শত শত দর্শকের জনতা। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, 'তীরে স্থান না পাইয়া বহু ভক্ত জলে নামিয়া দধি চিপিটক আহার করিলেন।' প্রত্যেককে দুইটি মালসা দিবার জন্য নিত্যানন্দ আদেশ দিলেন, একটিতে দধি-চিড়া, অপরটিতে দুগ্ধ-চিড়া। বিশ জন পরিবেশক প্রসাদ বিতরণে ব্যস্ত হইলেন। পরিবেশন সমাপ্ত হইলে নিত্যানন্দ ভাবাবেশে একটি দিব্য লীলা করিলেন। তিনি ধ্যানে আহ্বান করিয়া মহাপ্রভুকে তথায় আনিলেন। মহাপ্রভু আসিতেই নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া সকলের চিড়া দেখিতে লাগিলেন। নিতাই পরিহাসপূর্বক প্রত্যেক গামলা হইতে এক এক গ্রাস চিড়া মহাপ্রভুর মুখে দিলেন। দিব্যদেহী মহাপ্রভুও হাসিতে হাসিতে নিতাইর মুখে এক এক গ্রাস দিতে লাগিলেন। অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ মাত্র এই প্রেমলীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। নিতাই মহাপ্রভুকে ডান পাশে আসনে বসাইয়া দুইজনে চিড়া খাইলেন। তখন নিতাই সকলকে ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ভক্তবৃন্দ হরিধ্বনি করিয়া ভোজন করিতে লাগিল। মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দের কৃপায় ভক্তগণের গঙ্গাতে যমুনা ভ্রম হইল। তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা যেন যমুনা-পুলিনে ভগবানের সঙ্গে আনন্দোৎসবে মগ্ন। পাণিহাটী বৃন্দাবনে পরিণত হইল। নিত্যানন্দের ভোজন সমাপ্ত হইলে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাম্বুলাদি যোগাইলেন। রঘুনাথ দাসকে নিতাই প্রভু প্রসাদ দিলেন। ইহাই রঘুনাথ দাসের 'দণ্ড-মহোৎসব।' এই উৎসব ১৪৩১ শকের ( ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দের ) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। তদবধি ৪৩০ বৎসর যাবৎ উক্ত তিথিতে প্রত্যেক বৎসর বটতলায় মহোৎসব হয়। আমরা উক্ত উৎসব দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

দিবাবসানে নিত্যানন্দ রঘুনাথাদি ভক্তগণ সঙ্গে রাঘব-ভবনে গমন করিলেন। তথায় কীর্তনান্তে নিতাই প্রভু আহারে বসিলেন। তাঁহার ডান দিকে মহাপ্রভুর উদ্দেশে একখানি আসন রক্ষিত হইল। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, 'রাঘব পণ্ডিত দেখিলেন, মহাপ্রভু আসিয়া সেই আসনে বসিলেন। রাঘব অতিশয় ভাগ্যবান। তাঁহার গৃহে প্রস্তুত আহার্য্য ভোজনে মহাপ্রভু বাক্যে

বারে আসিতেন।' ভক্তগণ রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া ভোজন করিবার জন্ত আহ্বান করিলে রাঘব রঘুনাথকে প্রসাদ পাইতে নিষেধ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, 'গৌরাঙ্গদেব প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তুমি আহার কর।' রঘুনাথ সেই রাত্রি রাঘব-ভবনে থাকিয়া পরদিন বটতলায় সপারিষদ নিত্যানন্দের সমীপে প্রণত হইয়া কহিলেন, 'আমি চৈতন্ত-চরণপ্রার্থী। যত বার গৃহ ছাড়িয়া পালাই তত বার মাতা-পিতা আমাকে বাঁধিয়া রাখেন। তোমার কৃপা ব্যতীত চৈতন্ত-চরণ অপ্রাপ্য। তুমি মম শিরে তব পাদপদ্ম ধরিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়।' তাঁহার কাকুতি শ্রবণে নিতাই ভক্তগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ইন্দ্রের মত ইহার বিষয়সুখ আছে। চৈতন্ত-কৃপায় সেই বিষয়সুখ তুচ্ছ হইয়াছে। তোমরা আশীষ কর, যেন সে মহাপ্রভুর কৃপা পায়। যে কৃষ্ণ-পাদপদ্মের গন্ধ পায় তাহার নিকট ব্রহ্মলোকাদির সুখ তুচ্ছ হয়।' ইহা বলিয়া নিতাই রঘুনাথের মস্তকে চরণ স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, 'তুমি যে পুলিন-ভোজন করাইলে তাহাতে তোমার ভববন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্তই মহাপ্রভু উৎসবে যোগদান ও দুধ-চিড়া ভক্ষণ করিলেন। তুমি অচিরে মহাপ্রভুর কৃপা পাইবে এবং তাঁহার অন্তরঙ্গরূপে গৃহীত হইবে।' রঘুনাথ মহানন্দে গৃহে ফিরিলেন এবং কিছু কাল পরে বুদ্ধদেবের ন্তায় সংসার ত্যাগ করিয়া পুরীধামে মহাপ্রভু সন্নিধানে গমন করেন।

পাণিহাটী রাঘব পণ্ডিতের জন্মস্থান। ইহা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। চৈতন্ত-চন্দ্রোদয়, চৈতন্তমঙ্গল, চৈতন্ত-চরিতামৃত এবং চৈতন্ত-ভাগবতাদি প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে রাঘব পণ্ডিত এবং তাঁহার ভক্তিমতী ভগিনী দময়ন্তী দেবীর কথা আছে। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় রাঘব পণ্ডিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সহ পুরীধামে শ্রীচৈতন্ত দর্শনে যাইতেন। সেই সময় তিনি তিনটি বাহকের দ্বারা বিবিধ আহার্য্য মহাপ্রভুর জন্ত লইয়া যাইতেন। এই জন্ত দময়ন্তী দেবী প্রায় এক শত প্রকার আচার ও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিতেন। মহাপ্রভুর এক বৎসরের সেবার উপযোগী এই সকল দ্রব্য মকরধ্বজ করের

তত্ত্বাবধানে পুরীধামে যাইত। মহাপ্রভু 'রাঘবের ঝালি' হইতে মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করিতেন। রাঘবের ঝালির কথা নানা বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণিত। রাঘব পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার ভগবৎসেবার ঐকান্তিক নিষ্ঠা অতুলনীয়। রাঘব-গৃহে মদনমোহন দেবের মূর্তি বিরাজিত ও নিত্য পূজিত। তিনি গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ ৫।৭টি ডাব কয়েক ঘণ্টা শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিবার পর কাটিয়া মদনমোহনকে ভোগ দিতেন। রাঘবের ভক্তিতে সুপ্রসন্ন হইয়া ভগবান সাক্ষাৎ সেই নারিকেল-জল পান করিতেন। কখনো তিনি ডাবগুলির জল খাইয়া শূন্য রাখিতেন, কখনো অন্য জল ভরিয়া দিতেন। ভগবান জল পান করিলে পরে রাঘব মহানন্দে শাঁসগুলি কাটিয়া পুনরায় ভোগ দিতেন, এবং ভক্তের ভগবান সেই শাঁসগুলি ভোজন করিতেন। জীবন্ত জাগ্রত ভগবানের সেবা করিয়া রাঘব কৃতার্থ হইয়াছিলেন। আমরা রাঘব-পূজিত মদনমোহনের মনোহর মূর্তি দেখিয়া ধন্য হইলাম। আজও সেই মূর্তি রাঘবের জীর্ণ মন্দিরে শোভা পাইতেছেন। মহাভক্তের আন্তরিক সেবায় ভগবান বাঁধা পড়িয়াছিলেন। রাঘব যখন সজল নয়নে মহাপ্রভুকে ভোগে বসিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন, তখন তিনি পুরীধামে যায়ান্ন ভোগ ছাড়িয়া রাঘব-মন্দিরে আসিতেন। মহাপ্রভু ইহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাঘব-মন্দিরে ভগবানের এইরূপ আবির্ভাবের কথা কয় জনেই বা জানেন?

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে পাণিহাটীর মহোৎসবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ শেষ বার যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি তৎপূর্বে অনেক বার উক্ত উৎসব দর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজী-শিক্ষিত ভক্তগণকে তিনি বলিতেন, "সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট-বাজার বসে। তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল' কখনো ঐরূপ দেখিস্ নাই; চল, দেখিয়া আসিবি।" ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নরেন্দ্রনাথ, বলরাম, গিরীশচন্দ্র, রামচন্দ্র ও মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি পঁচিশ জন ভক্ত সঙ্গে দুইখানি ভাড়া নৌকায় দক্ষিণেশ্বর হইতে পাণিহাটী যাত্রা করিলেন। বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় তাঁহারা পাণিহাটি পৌছিলেন। নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে বরাবর শ্রীমণি সেনের

বাড়ীতে গেলেন। তাঁহার শুভাগমনে আনন্দিত হইয়া মণি বাবুর বাড়ীর সকলে তাঁহাকে প্রণামপূর্বক তাঁহাদের বৈঠকখানায় বসাইলেন। তথায় ১০।১৫ মিনিট বিশ্রামান্তর তিনি তাঁহাদের ঠাকুরবাড়ীতে রাধাকান্তজীকে দর্শন করিতে যান। বৈঠকখানার পাশেই ঠাকুরবাড়ী। পাশের দরজা দিয়া তিনি মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ দেবতা দর্শনান্তে তিনি ভাবাবেশে প্রণাম করিলেন। তিনি যখন প্রণাম করিতেছিলেন, তখন একটি কীর্তন দল উঠানে আসিয়া গান ধরিলেন। প্রণামান্তে ঠাকুর এক পাশে দাঁড়াইয়া কীর্তন শুনিতেছিলেন। একটু পরেই তিনি ভাবাবেশে চক্ষের নিমীষে কীর্তনে যোগদান করিলেন। ভাবাবেশে তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞার লোপ পাইল। তিনি কখনো অর্দ্ধ-বাহ্য দশা লাভপূর্বক সিংহবিক্রমে নৃত্য এবং কখনো বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া স্থির ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদানন্দ[১] বলেন, "ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখনো অগ্রসর হইতেন এবং কখনো পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতেছিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন 'সুখময় সাগরে' মীনের ন্যায় সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্য্য-মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।...প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত, তখন ভ্রম হইত, উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নিহিত নহে; বুঝি আনন্দ-সাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ড বেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে, এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার উক্ত আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে।

প্রায় আধ ঘণ্টা এইরূপে অতীত হইলে ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। রাঘব পণ্ডিতের গৃহে মদনমোহন দর্শনে যাওয়া স্থির হইল। এই উদ্দেশ্যে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ, দিব্যভাব, ২৭৮-২৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

তিনি ভক্তবৃন্দ সহ মণি সেনের ঠাকুরবাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। কীর্তন দল তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না; কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। দুই-চারি পদ চলিয়াই তিনি ভাবাবেশে স্থির হইলেন। অর্দ্ধ-বাহ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া আবার দুই-চারি পদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় তিনি ভাবাবিষ্ট হইলেন। এই ভাবে মণি সেনের ঠাকুরবাড়ী হইতে রাঘব-গৃহে যাইতে তিন ঘণ্টা সময় লাগিল। ভাবাবেশে নৃত্যকালে ঠাকুরের দেবদেহের অপূর্ব শ্রী প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদানন্দ[১] এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, "তাঁহার উন্নত বপু প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি, তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। তাঁহার শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল। ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া চতুষ্পার্শ আলোকিত করিয়াছিল এবং মহিমা, করুণা, শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়াছিল। উজ্জ্বল গৈরিক বর্ণের পরিধেয় বস্ত্রখানি ঐ অপূর্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে মিলিত হওয়ায় তাঁহাকে অগ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।"

রাঘব পণ্ডিতের ভবনে পৌঁছিবার কিছু পূর্বে এক ভণ্ড বাবাজী আসিয়া জনৈকা স্ত্রী-ভক্তের হাত হইতে এক মালসা ভোগ কাড়িয়া লইয়া উহার কিয়দংশ ঠাকুরের মুখে স্বহস্তে দিলেন। ঠাকুর তখন ভাবাবেশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বাবাজীর স্পর্শে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল এবং ভাবভঙ্গ হইল। তিনি বাবাজী-প্রদত্ত প্রসাদ মুখ হইতে থু থু করিয়া ফেলিয়া দিয়া মুখ ধুইলেন এবং অন্য এক ভক্তের নিকট হইতে প্রসাদ-কণিকা গ্রহণ করিলেন। রাঘব-মন্দিরে দেবতা দর্শন ও স্পর্শন এবং বিশ্রামাদিতে আধ ঘণ্টা কাটাইয়া ঠাকুর নৌকায় উঠিলেন। এখানে একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। কোন্নগরবাসী নবচৈতন্য মিত্র উৎসবের ভিড়ে ঠাকুরকে দর্শন

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ, দিব্যভাব, ২৭৮-২৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

করিতে পারেন নাই। তিনি নৌকায় ঠাকুরকে একাকী দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে পড়িলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁহাকে স্পর্শ করাতেই তিনি অসীম উল্লাসে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নৌকার উপরে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া ঠাকুরকে স্তবস্তুতি এবং বারবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইলে ঠাকুর তাঁহার পিঠে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। ঠাকুরের কৃপালাভে নবচৈতন্যের এমন পরিবর্তন হইল যে, তিনি সংসার হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক স্বগ্রামে গঙ্গাতীরে পর্ণ কুটীরে অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বর-চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। নিত্যানন্দ কর্তৃক রঘুনাথকে কৃপা করার সঙ্গে ঠাকুরের নবচৈতন্যকে কৃপা করার তুলনা হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুই অবতারের লীলায় পাণিহাটী তীর্থীকৃত।

সেই দিনের মহোৎসবে বহু সহস্র নর-নারী এবং কয়েকটি কীর্তন দলের সমাগম হইয়াছিল। আমরা গৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির, ত্রাণ বাবুর কালী-মন্দির, দাঁ'দের জগদ্ধাত্রী-মন্দিরাদিও দর্শন করিলাম। বরাহনগরে পাটবাড়ীতে গৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের ন্যায় পাণিহাটীর গ্রন্থ-মন্দিরে অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং পবিত্র স্মৃতি রক্ষিত আছে।

উৎসবানন্দে সমগ্র দিবস কাটাইয়া সন্ধ্যায় আমরা নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া মোটর বাসে বেলুড় মঠে ফিরিলাম। পাণিহাটীর তীর্থের পুণ্য স্মৃতি বহু দিন হৃদয়-মন পূত ও প্রফুল্ল রাখিয়াছিল।

---

# তিন

# ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবী দর্শনে *

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলুড় গ্রামের লালবাবা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া মোটর বাসে চড়িয়া হাওড়া স্টেসনে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে বালকবন্ধু ব্রাহ্মণকুমার শিবানীপ্রসাদ মৈত্র। হাওড়া স্টেসনে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লাইনে একটি লোক্যাল ট্রেনে উঠিয়া বসিলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কোলাঘাটে রূপনারায়ণ নদীর উপরস্থ পুল পার হইয়াই গাড়ী থামিল। আমরা সেখানে গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টীমারে চড়িলাম। রূপনারায়ণের বিশাল বক্ষের উপর দিয়া আমাদের ষ্টীমার ঘর ঘর শব্দ করিয়া চলিতে লাগিল। নদীর উভয় তীরস্থ মনোহর পল্লীশ্রী আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। গোপীগঞ্জ স্টেসনে নামিবার পূর্বেই কালবৈশাখীর ঝড় তুমুল হইয়া উঠিল এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইল। সেজন্য অনেকক্ষণ জাহাজ নদীবক্ষে নঙ্গর ফেলিয়া অপেক্ষা করিল। সন্ধ্যার পরে আমরা গোপীগঞ্জ স্টেসনে নামিলাম। আমরা সেখান হইতে কর্দমাক্ত রাস্তায় হাঁটিয়া আরিট গ্রামে কাপাসদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। পরদিন উক্ত গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল আমাদের পৌরহিত্যে।

তার পরদিন পার্শ্ববর্তী খেপুত গ্রামে শিবতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি-সভা হইল। আরিট গ্রামে আহার ও বিশ্রামান্তে আমরা খেপুত গ্রামে গেলাম। উক্ত গ্রামেই ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। ক্ষিপ্ত শব্দের অপভ্রংশ খেপুত। স্থানীয় বাইশটি মৌজার সাধারণ নাম খেপুত। খেপুত গ্রামে একটি ডাকঘর, একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ও একটি রামকৃষ্ণ

---

* প্রবর্ত্তক, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ সাল

আশ্রম আছে। খেপুত রূপনারায়ণের তীরে এবং মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। উক্ত অঞ্চলে ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবীর অজস্র সুনাম আছে। দেবী মন্দির অতি প্রাচীন। নাটমন্দিরটি ধ্বংশপ্রাপ্ত এবং একেবারে নিশ্চিহ্ন। মন্দিরের সম্মুখে একটি বড় পুকুর। বিস্তৃত মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি ভগ্ন বুদ্ধমূর্তি দেখা গেল। মন্দির গাত্রে প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা আছে, "শ্রীশ্রীমাতা ক্ষিপ্তেশ্বরীর চরণে সমর্পণমস্তু। শকাব্দ ১৭০১ সন ১১৮৬, মাহ ৩১শে আশ্বিন।"

সুতরাং বর্তমান মন্দিরটি প্রায় পৌন দুই শত বৎসর পূর্বে নির্মিত। শোনা যায়, খেপুত গ্রামের চট্টোপাধ্যায় বংশের পূর্বপুরুষ রামমোহন কর্তৃক উক্ত মন্দির নির্মিত। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রা দেবী অষ্টভূজা সিংহবাহিনী মূর্তিও কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিতা। দেবীর পাদমূলে গণেশ ও লক্ষ্মী এবং বামে কালভৈরব এবং দক্ষিণে ভৈরব। পূর্বে মন্দিরের পার্শ্বে নহবৎখানা ছিল; এখন নাই। তন্ত্রমতে দেবীর পূজা হয় পঞ্চমকার দ্বারা। মন্দিরমধ্যে দুইটি পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে—একটি ঈশান কোণে, এবং অন্যটি বেদীর নীচে।

দুর্গাপূজার তিন দিন সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে এবং কালীপূজার রাত্রিতে ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবীর বিশেষ পূজা ও বলিদান হয়। দুর্গাপূজা কালে সন্ধিপূজার অভিনবত্ব আছে। অদ্যাপি দেবীর ইঙ্গিত অনুসারে বলিদান করা হয়। দেবীর ইঙ্গিত বা আদেশ মন্দিরাভ্যন্তরস্থ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ, বিশেষতঃ পূজারী, অনুভব করেন। সন্ধিপূজার সময় দেবীর দুই উচ্চ দীপদানীতে দুইটি বৃহৎ প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। পূজা সাঙ্গ হইলে পূজারী দেবীর স্তবস্তুতি আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর প্রদীপযুগলের শিখাদ্বয় উপর দিকে উঠিতে থাকে এবং ক্রমশঃ কাঁপিতে কাঁপিতে একত্র মিলিত হয়। ঠিক সেইক্ষণে মুহূর্তমাত্র এক দৈব গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা যায়। প্রদীপদ্বয়ের একত্রিত শিখা মন্দির-মধ্যস্থ প্রায় সকলেই দেখিতে পান। কিন্তু উক্ত গুঞ্জন-ধ্বনি একমাত্র পূজারী ব্রাহ্মণই শুনিতে পান। এই ধ্বনিই বলিদানার্থ দেব্যাদেশরূপে গৃহীত হয়। উক্ত ধ্বনি

শ্রবণমাত্রই পূজারী ঘণ্টা বাজাইতে থাকেন ও 'তারা' 'তারা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন এবং তখন বলিদান হয়।

পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী ভূতপূর্ব পূজারীকে সন্ধিপূজার আদেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, ঐ সময়ে দেবীর মাথা হইতে একটি ফুল পূজারীর সম্মুখে পড়িয়া যায়। এই অলৌকিক ঘটনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দেবী জাগ্রতা। কিছু দিন পূর্বে যখন লোকের আর্থিক অবস্থা আরো স্বচ্ছল ছিল তখন খেপুত ও পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামে অনেক বাড়ীতে দুর্গাপূজা হইত। সন্ধিপূজার সময় প্রত্যেক পূজাবাড়ী হইতে মন্দির পর্যন্ত রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোক দাঁড়াইয়া থাকিত। একজন মানুষের ডাক যতদূর শোনা যায়, ততদূরে এক এক জন লোক দণ্ডায়মান হইত। দেবীর আদেশ অনুভবান্তে পূজারী যখন বলিদানার্থ নির্দেশ দিতেন তন্মুহূর্তে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণ স্ব স্ব গৃহে এই সংবাদ পাঠাইতেন, একজন পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে ডাক দিয়া এইরূপ করিতেন। দেবী মন্দিরে বলিদানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য পূজাবাড়ীতে বলিদান হইত এবং এখনও হয়। সুতরাং দুর্গাপূজা খেপুত অঞ্চলে একটি দর্শনীয় ও আনন্দদায়ক উৎসবরূপে পরিগণিত।

ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবীর নামকরণ সম্বন্ধে এই প্রাচীন জনশ্রুতি প্রচলিত যে, ক্ষিপ্ত শৃগাল বা কুকুর দংশন আরোগ্যের জন্য পূর্বে মন্দিরে বহু লোক আসিত। কিন্তু এখন আর এইরূপ দেখা যায় না। অনেকে বলেন, ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুরাদির দংশন দেবীর কৃপায় এখানে অদ্ভুত ভাবে আরোগ্য হইত। কোন সন্ন্যাসী দেবী মন্দিরে যোগসাধনায় সিদ্ধি ও শক্তি লাভ করেন। দেবী তাঁহাকে একটি বীজমন্ত্র বলিয়া দেন, যাহা জপ করিয়া ঝাড়-ফুঁক দিলে দষ্ট ব্যক্তি সুস্থ হইত। হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগের নিকটবর্তী তিরোল গ্রামে যে পাগলী কালী আছেন সেখানেও পাগল লোকে আরোগ্য লাভ করে। আমি স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছি। সম্ভবতঃ ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবীর পূজা কোন দিন অঙ্গহীন হইলে পরদিন প্রস্তরময় দেবীমূর্তি হইতে প্রচুর ঘাম নির্গত হইত। দুইখানি গামছা বা একখানি বড় কাপড় সিক্ত হইত দেবীর ঘাম মুছাইয়া দিতে।

অনন্তর বিধিমত পূজা-ভোগ এবং স্তব-স্তুতি করিলে ঘাম বন্ধ হইয়া যাইত। দেবীকে নিত্যই মাছপোড়া ভোগ দেওয়া হয়। এইজন্য পূর্বে একটি জেলে মাছ দিয়া যাইত। ভাত, ডাল ও দুই তিনটি তরকারী দেবীর নিত্য ভোগ দেওয়া হয়। অনেকে বলেন, দেবীর ভোগ অতিশয় সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত হয়। যে রাস্তা দিয়া দেবীর ভোগ লইয়া যাওয়া হইত সেই রাস্তায় একটি দিব্য সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়িত। দেবীভোগের আছাঁটা চালের শুষ্ক ভাত ও ডাল খাইতে এত সুস্বাদু হইত যে, তাহা যে একবার খাইত তাহা ভুলিতে পারিত না। এখনো দেবীর ভোগে এইরূপ সুগন্ধ পাওয়া যায়; তবে সব দিন নয়; কারণ পূর্ববৎ প্রায়ই আবশ্যকীয় পূজোপকরণ জোটে না এবং পূজাও ভক্তিপূর্বক হয় না।

মদ্যাদি উপচার সহযোগে দেবীর পূজা হইত, এইকথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এইজন্য পূজারী বা অন্য কেহ দোকান হইতে মদ্য কিনিয়া আনেন এবং যে রাস্তা দিয়া আসিলে মন্দির খুব কাছে হয় সেই রাস্তা দিয়াই তিনি সাধারণতঃ আসেন। উক্ত রাস্তার পার্শ্বেই এক সদাচার সাত্ত্বিক বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ বংশের নিবাস ছিল। তাঁহারা তৎকালীন কোন জমিদারের পত্তনীদার থাকায় বিশেষ প্রতাপশালী ছিলেন। রাস্তা দিয়ে ঐরূপ মদ্যবহনের কাহিনী যখন তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল তখন তাঁহারা পূজারীকে ডাকিয়া খুব ধমক দিলেন এবং তাঁহাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া মদ্য লইয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। পূজারী ভয় পাইয়া মিথ্যা বলিয়া বসিলেন, "আমরা কেউ মায়ের জন্য মদ্য নিয়ে যাই না।" এই কথা শুনিয়া পত্তনীদার আরও অসন্তুষ্ট হইলেন এবং একদিন পূজারীকে হাতে হাতে ধরিয়া শাস্তি দিবার সংকল্প করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। সেই সুযোগ আসিতে বেশী দেরী হইল না। একদিন বেলা ১১টার সময় তাঁহাদের গুপ্তচর আসিয়া খবর দিলেন, "পূজারী স্বয়ং দোকান হইতে মদ কিনিয়া মন্দিরে যাইতেছেন এই পথ দিয়েই।" পত্তনীদারের লোকেরা সাগ্রহে পূজারীর অপেক্ষা করিলেন এবং তাঁহাকে হাতে-হাতে ধরিয়া কি শাস্তি দিবেন ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পূজারীকে একটি ঘটি হাতে লইয়া উক্ত রাস্তায় আসিতে দেখা গেল। পূর্ব পরামর্শ অনুসারে তাঁহাকে সকলে

ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘটিতে কি আছে?" সন্ত্রস্ত পূজারী ভয়ে বলিয়া ফেলিলেন, "মায়ের পূজার জন্য ঘটিতে দুধ নিয়ে যাচ্ছি।" সমবেত সকলে ঘটি দেখিতে চাহিলেন এবং দেখিয়া অবাক্ হইলেন যে, ঘটিতে সত্যই দুধ আছে; বাস্তবিক পক্ষে ঘটিতে মদ্যই ছিল। এরূপ বাক্‌সিদ্ধ সত্ত্বগুণী ব্রাহ্মণই পূর্বে দেবীর পূজা করিতেন।

রমাকান্ত সিদ্ধ নামক এক সাধক ব্রাহ্মণ পূর্বে দেবীর পূজক ছিলেন। একদা তিনি বর্ধমান রাজবাড়ীতে যাইবার পথে নৌকায় নদী পার হইতেছিলেন। তখন দেখিলেন, নদীর স্রোতে একটি চিংড়ী মাছ ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি ভাসমান চিংড়ী মাছটীকে ধরিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া লইলেন; এবং যথাসময়ে বর্ধমান রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। উল্লিখিত রাজসভায় অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচার হইল। মহারাজ তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাহিলেন। ইহাতে সভাস্থ অন্যান্য পণ্ডিত ঈর্ষান্বিত এবং তাঁহার দোষাবিষ্কারে তৎপর হইলেন। ইত্যবসরে এক পণ্ডিত রমাকান্ত সিদ্ধের চাদরে বাঁধা চিংড়ী মাছটি দেখিয়া সেদিকে মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তখন মহারাজ কৌতূহলবশে রমাকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত মশায়, চিংড়ী মাছটী চাদরে বেঁধে এনেছেন কেন?" রমাকান্ত ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া উত্তর দিলেন, "মহারাজ, এটি চিংড়ী মাছ নয়, এটী মায়ের পূজার অর্ঘ্য! আপনাকে আশীর্বাদ করবার জন্য নিয়ে এসেছি।" মহারাজ বিস্মিত হইয়া পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "তবে শীঘ্র আমাকে আশীর্বাদ করুন এবং দেবীর নির্মাল্য আমায় দিন।" সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, চিংড়ী মাছ অন্তর্হিত এবং তৎপরিবর্তে সদ্য পূজার পুষ্প-বিল্বপত্র ও আতপ তণ্ডুল সমন্বিত অর্ঘ্য! রমাকান্ত তাহাই দিয়া মহারাজকে আশীর্বাদ করিলেন। বর্ধমান মহারাজ রমাকান্তের বিভূতি দেখিয়া আনন্দিত ও আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং দেবীর সেবার জন্য ৩৬৫ বিঘা জমি দান করিলেন।

বর্তমান পূজারী শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্য

সংক্ষেপে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। রমাকান্ত সিদ্ধ ছিলেন তাঁহারই সুযোগ্য পূর্বপুরুষ। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত অলৌকিক ঘটনা অন্নদাপ্রসাদের প্রকাশিত বিবরণে পাওয়া যায়। রমাকান্ত বেদান্তে সুপণ্ডিত এবং যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। কালীকান্ত নামে তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলেন। কালীকান্ত মহা মূর্খ ছিলেন, মন্ত্রাদি জানিতেন না এবং দেবীর পূজাদি করিতে পারিতেন না। রমাকান্ত যখন বয়োবৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইলেন তখন কালীকান্ত একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার দেহান্তে দেবীর পূজা করিবে কে? আমাকে দীক্ষা-দানান্তে পূজা শিখিয়ে দিন। আমি মায়ের পূজা করবো।" এই কথা শুনিয়া পিতা পুত্রকে বলিলেন, "তুমি ত অজ্ঞ, মূর্খ। তুমি পূজার মন্ত্রাদি শিখিতে পারিবে না। তোমার মনে যাহা উদয় হইবে তাহা বলিয়া ভক্তিভরে দেবীর পূজা করিবে।" পিতার অনুমতি পাইয়া পুত্র একদিন দেবীপূজা করিতে অগ্রসর হইলেন এবং পূজাকালে দেবীর জীবন্ত জাগ্রত ভাব অনুভব করিলেন। ভোগ নিবেদনকালে দেবীর করালমূর্তি দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন ও মন্ত্রাদি ভুলিয়া গেলেন। সেইজন্য দেবী অজ্ঞ পূজক কালীকান্তকে গ্রাস করিলেন।

রমাকান্ত তখন স্বগৃহে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। কালীকান্ত বহু পূর্বে মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়াছেন, এখনও আসেন নাই জানিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন এবং অবিলম্বে প্রত্যাদেশ পাইয়া সমস্ত অবগত হইলেন। তিনি দ্রুতপদে মন্দিরে যাইয়া দেবীকে স্তব-স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন,

"ত্বং পরা পরমা শক্তি, ত্বমেব হরবল্লভা।
ত্রৈলোক্যোদ্ধারহেতুঃ ত্বমবতীর্ণা কলিযুগে ॥"

পরে দেবীকে এই কাতর প্রার্থনা করিলেন, "মা, আমার একটি মাত্র পুত্র; সেও আপনার কালগ্রাসে পড়িয়াছে। আমার বংশ নাশ হইলে আপনার পূজা করিবে কে?" বৃদ্ধ ভক্তের প্রার্থনায় দেবী প্রসন্না হইলেন এবং যাচিত বর তাঁহাকে দিলেন। উক্ত বর গ্রহণ কালে রমাকান্ত বলিয়াছিলেন, "সর্বত্র জয়মিচ্ছন্তি পুত্রাদেকাৎ পরাজয়ঃ।" অর্থাৎ লোকে সর্বত্র জয় ইচ্ছা করে; কিন্তু একমাত্র পুত্রের নিকটই পরাজয় চায়। রমাকান্ত দেবীকে পুনরায় প্রার্থনা

করিলেন, "আমার পুত্র জ্ঞানী, বিদ্বান ও সিদ্ধ হউক।" "তথাস্তু" বলিয়া দেবী কালীকান্তকে গ্রাসমুক্ত করিলেন। দেবীর প্রসাদে কালীকান্ত পুনর্জীবন লাভান্তে সুপণ্ডিত হইলেন এবং পিতাকে বেদান্ত বিচারে পরাস্ত করিলেন।

লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতের অভীষ্ট দেবী ছিলেন নিকুম্ভিলা। শোনা যায়, শক্রবধার্থ ইন্দ্রজিৎ অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিয়াছিলেন। উক্ত দেবীকে রাবণও যুদ্ধজয়ের আকাঙ্ক্ষায় মদ্য মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মূর্তি—এই পঞ্চোপচারে তান্ত্রিক বিধানে ভক্তিভরে আরাধনা করেন। সেইজন্য নিকুম্ভিলা দেবী লঙ্কেশ্বরী দেবী নামে অভিহিতা। ত্রেতাযুগে রাম অবতারে রাবণ সীতাদেবীকে হরণপূর্বক লঙ্কাপুরে রাখেন। লঙ্কেশ্বরী রাবণের প্রতি সুপ্রসন্না থাকায় রামচন্দ্র রাবণ-বধে অসমর্থ হন। তিনি ভক্তবীর হনুমানকে সীতা উদ্ধারার্থ লঙ্কায় প্রেরণ করেন। হনুমান লঙ্কায় যাইয়া দেখেন, রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ দেবীপূজার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত। হনুমান স্বীয় মূত্র দ্বারা যজ্ঞকুণ্ড ভাসাইয়া দেন এবং লঙ্কেশ্বরীকে উত্তোলনপূর্বক লঙ্কা নদীতে নিক্ষেপ করেন। সাগর দেবীকে স্বীয় গর্ভে স্থান দানার্থ উচ্ছলিত হইয়া লঙ্কানদী প্লাবিত করেন। দেবী সমুদ্রগর্ভ হইতে জোয়ারের জলে ভাসিতে ভাসিতে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদীর চন্দ্রেশ্বর নামক দহে ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবী নামে আবির্ভূতা হন। দীর্ঘকাল খেপুতে এই প্রবাদ প্রচলিত।

দুর্গাদাস নামে এক জেলে চন্দ্রেশ্বর দহে রোজ জাল ফেলিয়া মাছ ধরিত এবং সেই মাছ বাজারে বিক্রয় করিয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিত। দৈবযোগে সে একদিন চন্দ্রেশ্বর দহে জাল ফেলিয়া আর জাল টানিয়া তুলিতে পারিল না। কোন বড় জলজন্তু তাহার জালে পড়িয়াছে ভাবিয়া সে শঙ্কিত হইল এবং চন্দ্রেশ্বর তীরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দেবী স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন, "আমি জলজন্তু নই, আমি ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবী। আমি এখানে আবির্ভূতা হইব। তুমি শীঘ্র হুগলী জেলার অন্তর্গত সোনাটিকুরি গ্রামে যাইয়া সিদ্ধ সাধক রমাকান্তকে ডাকিয়া আন। সে যদি তোমার জালের দড়ি ধরিয়া টানে তাহা হইলে আমি উত্থিত হইব।" এদিকে রমাকান্ত ধ্যানে অষ্টভুজা দেবীমূর্তির

দর্শন লাভ করেন। ভাগ্যবান জেলে দুর্গাদাসের আহ্বানে তিনি চন্দ্রেশ্বরে আসিয়া জালের দড়ি ধরিয়া টানেন এবং ক্ষিপ্তেশ্বরী মূর্তি লাভ করেন।

ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে খেপুত গ্রামের চুরাশী বৎসর বয়স্ক তান্ত্রিক জ্যোতিষাচার্য শ্রীষড়ানন আগমবাগীশের মুখে নিম্নোক্ত পৃথক বিবৃতি পাওয়া যায়। খেপুত গ্রামে বহু পূর্বে ফিঙ্গে রাজা নামে এক রাজা ছিলেন। উক্ত রাজা কোন দেশ হইতে স্বীয় সপ্ত তরী লইয়া ফিরিতেছিলেন। তিনি কোন স্থানে দেখিলেন, নদীর চড়ায় বসিয়া একটি সুন্দরী রমণী কাঁদিতেছে। রাজা নৌকা হইতে তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী উত্তরে বলিলেন, "চন্দ্রেশ্বর দহের নিকটে আমার শ্বশুরবাড়ী। আমি সেখানে যাবার চেষ্টা করছি ; কিন্তু যেতে পারছি না। তাই এত কাঁদছি। আপনি যদি দয়া করে আমাকে নৌকায় তুলে নিয়ে ওখানে নামিয়ে দেন, বড় ভাল হয়।" অসহায়া নারীর অনুরোধে রাজা সম্মত হইলেন এবং তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। পরে ভোগী রাজার মনে উক্ত নারীসম্ভোগের অশুভেচ্ছা জাগ্রত হওয়ায় সপ্ততরীর মধ্যে ছয়টি তরী নদীগর্ভে আশ্চর্যভাবে ডুবিয়া গেল। ইহাতে রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং নারীকে সন্দেহ করিলেন। ফিঙ্গে রাজা নারীর পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু পারিলেন না।

যথাসময়ে চন্দ্রেশ্বরে নৌকা উপস্থিত হইলে নারীকে নামাইয়া দেওয়া হইল। নৌকা হইতে নামিয়া নারী অদৃশ্য হইলেন। সুতরাং রাজা তাঁহার পরিচয় জানিবার আর অবসর পাইলেন না। উক্ত রাজার কোটালের বাড়ী ছিল পার্শ্ববর্তী নিশ্চিন্তপুর গ্রামে। রাজার যে গরুগুলি ছিল তাহাদের দেখাশুনা করিত অনেক গোয়ালা এবং গোয়ালাদের মধ্যে যে প্রধান সেও ছিল নিশ্চিন্তপুর গ্রামবাসী। কোটাল উক্ত গোয়ালাকে "গরুগুলি কত দুধ দেয়" এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। গোয়ালা বলিল, "ভাই, কয়দিন ধরিয়া একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। অদূরে যে বেতবন দেখা যায়, গরুগুলি ঐ বেতবনে ঢুকে এক স্থানে দাঁড়িয়ে হুড় হুড় করে দুধ ঢেলে দেয়।" এই কথা শুনিয়া কোটাল কৌতূহলী হইয়া উক্ত স্থানে গেলেন এবং অদ্ভুত ব্যাপারটি

প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইলেন। পরদিন তিনি বহু লোক সঙ্গে লইয়া উক্ত স্থানে গেলেন। কুলীরা তাঁহার নির্দেশমত মাটি খুঁড়িবার সময় টের পাইল, কোদালের ঘা কোন পাথরে বা লোহায় পড়িতেছে। পুনঃ পুনঃ আঘাত লাগিয়া একই প্রকার আওয়াজ শোনা গেল। তখন চারি দিকে মাটি কাটিয়া দেখা গেল, তথায় এক স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ বিরাজমান। সকলে 'জয় বিশ্বনাথ' বলিয়া প্রণাম করিল এবং শিবলিঙ্গ তোলার জন্য সচেষ্ট হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তাহারা শিবলিঙ্গ তুলিতে পারিল না। শিব ঠাকুর তাহাদিগকে স্বপ্নাদেশ দিলেন, "আমাকে তোলার চেষ্টা বৃথা। আমাকে আট আঙুল বাইরে রেখে বাকী অংশ মাটি দিয়ে ঢেকে দাও। এখানে মন্দির নির্মাণপূর্বক আমার পূজার ব্যবস্থা কর। আমার নাম কালিঙ্গীনাথ ভৈরব। আমার ভৈরবী চন্দ্রেশ্বর নামক স্থানে আছেন। তাঁকেও নিয়ে এসে এখানে প্রতিষ্ঠান্তে পূজা কর।"

অবিলম্বে লোকজন চন্দ্রেশ্বরে ছুটিল এবং সন্ধান করিয়া দেখিতে পাইল অষ্টভুজা প্রস্তরময়ী বারাহী মূর্তি। অত লোক চেষ্টা করিয়াও সেই মূর্তিকে মাটি হইতে তুলিতে পারিল না। চারি দিকে সাড়া পড়িয়া গেল। অসংখ্য নরনারী দেবীকে দর্শন করিতে সেখানে আসিল। দুই চার দিন পরে একটি সরল কিশোর সামান্য চেষ্টায় দেবীকে মাথায় করিয়া লইয়া আসিল। এখন যেখানে ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবী মন্দির অবস্থিত সেখানে আসিয়াই বালক বাহিত মূর্তির ভার অসহ্য বোধ করিল এবং দেবীকে নামাইতে বাধ্য হইল। পরে উক্ত স্থানে দেবীর জন্য সামান্য কুটির নির্মিত ও পূজার ব্যবস্থা হইল। পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর গ্রামের ব্রাহ্মণরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেবীর পূজক হইলেন। অচিরে দেবীর মহিমা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন খেপুত গ্রামের ব্রাহ্মণরা দেবীর পূজারী হইতে চাহিলেন। ইহা লইয়া উভয় গ্রামের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেশ বিরোধ সৃষ্টি হয়। একদিন ফরিদপুর গ্রামের ব্রাহ্মণরা বহু লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র সহ মন্দির আক্রমণ করিলেন এবং দরজা ভাঙ্গিয়া দেবীর ঘট লইয়া গেলেন। সেই পূজারী ব্রাহ্মণগণই দেবীর মন্দির নির্মাণ এবং পূজা-ভোগাদির জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি করেন।

ফরিদপুর গ্রামবাসী ভূতপূর্ব পূজারী নিম্নোক্ত প্রাচীন প্রবাদের কথা বলেন। এখন যেখানে ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবীর মন্দির বিদ্যমান সেখানে একটি তান্ত্রিক যোগী বাস করিতেন। সেই যোগীই দেবী সাধনায় সিদ্ধ হন। তাঁহার নিকট পূজারীর পূর্বপুরুষ গঙ্গারাম সার্বভৌম যোগ শিক্ষা করিতে যাইতেন। যোগী দেহত্যাগের পূর্বে উক্ত সার্বভৌমকে দেবীর সেবাপূজার ভার দিয়া যান। সার্বভৌম বহু বৎসর দেবীর পূজক ছিলেন। তিনি বার্ধক্য হেতু অশক্ত হওয়ায় এবং বিশেষভাবে তাঁহাদের বৃহৎ বংশে প্রায় জন্মাদি অশৌচ ঘটায় দেবীপূজার ভার বর্তমান পূজারীর পূর্বপুরুষদের উপর ন্যস্ত করেন। এইরূপে বর্তমান পূজারীরা দেবীপূজার সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হন।

এক সময়ে গঙ্গারাম সার্বভৌম দুর্গাসপ্তমী দিবসে দেবীপূজার্থ বিবিধ দ্রব্য, বাদ্য ও ছাগবলি প্রভৃতি লইয়া আসেন। পাছে পূজারী গঙ্গারাম পুনরায় দেবীপূজার অধিকার লাভ করেন—এই ভয়ে তৎকালীন পূজারীগণ সার্বভৌমকে মন্দিরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলেন এবং নিজেরা পূজা করিতে অগ্রসর হন। সার্বভৌম পূর্ববৎ সেদিন পূজা করিতে চাহিলেন। কিন্তু গ্রামস্থ পূজারীরা তাঁহাকে সেই সুযোগ আর দিলেন না। তিনি বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "যদি আমি সত্যই মাকে ডেকে থাকি তবে মা আমার পূজা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন এবং দেবী আমার বাড়ীতে গিয়েই আমার পূজা নেবেন।" আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন দেখা গেল, সার্বভৌমের গ্রামে মুনমনীর দহে দেবীঘট ভাসিতেছে। সেই হইতেই ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবী মন্দিরে ঘটে পূজা প্রচলিত হয়।

এই ধ্যানে ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবীর পূজা হইয়া থাকে—

ওঁ গৌরীদেহাৎ সমুৎপন্নাং ত্বাং স্বাতিকে বরপ্রদাং
সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপাং শুভাশুভনিবর্হনীং।
ধারয়ন্তীং ভুজৈর্বাণং মুসলং শূলচক্রকং
শঙ্খং ঘণ্টাং হলঞ্চৈব পরশুঞ্চাষ্টাভিঃ করাং॥

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহাসরস্বতীর যে ধ্যান প্রদত্ত তাহা ক্ষিপ্তেশ্বরীর ধ্যানবৎ। সুতরাং ক্ষিপ্তেশ্বরী অষ্টভূজা, সিংহারূঢ়া, সত্ত্বগুণা ও সরস্বতীরূপা। তিনি অষ্টভূজে মুসল, বাণ, শূল, শঙ্খ, ঘণ্টা, হল ও পরশু ধারণ করেন।

আমরা ক্ষিপ্তেশ্বরী সম্বন্ধে এই সামান্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেবতাকে প্রণামান্তে মন্দির ত্যাগ করিলাম। পূর্বে তমলুকে বর্গভীমা দেবী এবং আসানসোলের সমীপে কল্যাণেশ্বরী দেবী প্রভৃতি দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। এই সব দেখিয়া মনে হয়, প্রাচীন বাংলা শক্তি সাধনার পীঠস্থান ছিল। আমরা ফিরিবার সময় গোপীগঞ্জ হইতে কোলাঘাট পর্যন্ত মোটর লঞ্চে অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিলাম এবং বেলুড়ে আসিতে কোন কষ্ট হয় নাই।

---

## চার

# ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ *

ভারতের অন্যতম মহাকাব্য মহাভারতেই শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও দ্রষ্টব্য সাহিত্যিক আলেখ্য পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণই মহাভারতের প্রধান নায়ক এবং কুরুক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ সারথী। তাঁহার ব্যাপক প্রভাবে এই মহাকাব্য বহু শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মহাভারতের প্রকৃত অংশ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পদ্মনাভ মহাপুরুষের মুখ-পদ্ম-বিনিঃসৃতা। কবিগণ সত্যাই বলিয়াছেন, গীতা সুগীতা কর্তব্যা, কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।"

'হরিবংশ' এবং 'বিষ্ণুপুরাণ' মহাভারতের অনেক পরে রচিত। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থদ্বয় খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভে উৎপন্ন। উভয়ের রচনা-কাল বহু দূরবর্তী নহে। নিঃসন্দেহে প্রাচীন প্রথা ও আখ্যান অবলম্বনে এই গ্রন্থদ্বয় লিখিত।

* শ্রীসুদর্শন, ভাদ্র, ১৩৬০ সালে প্রকাশিত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা পুরাতন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের মূল্য সমধিক। পালিগ্রন্থ 'মহাবংশে' বুদ্ধদেবের বিস্তৃত জীবনী প্রদত্ত। নিশ্চয়ই 'হরিবংশ এবং মহাবংশে'র উৎপত্তি একই সময়ে, অন্ততঃ একই শতকে। বিষ্ণুপুরাণে রস-নৃত্য ও লীলা-নাট্য বিশদ ভাবে বর্ণিত। কিন্তু উহাতে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তৎসমুদয় পারমার্থিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর আলোকে পঠিতব্য। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে অন্যান্য অংশ বর্ণনায় উ াতে কষ্ট-কল্পনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু মহাভারতে কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনায় সেই কষ্ট-কল্পনা স্থান পায় নাই। ধর্মগুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণের কার্যাবলী বিষ্ণু পুরাণে সংক্ষেপে বিবৃত।

কবি মাঘের 'শিশুপালবধ' কৃষ্ণ-বিষয়ক বৃহৎ কাব্য গ্রন্থ। কোন কোন পণ্ডিতের মতে উহার জন্মকাল অষ্টম শতক। ইহার নাম হইতেই জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের হস্তে শিশুপালের মৃত্যু-ঘটনা ইহাতে মহাকাব্যের ভাষায় বর্ণিত। শ্রীবেদান্ত দেশিকের 'যাদবাভ্যুদয়' এবং রাজচূড়ামণি দীক্ষিতের 'রুক্মিনী পরিণয়' কাব্য যথাক্রমে চতুর্দশ ও সপ্তদশ শতকে রচিত। এই কৃষ্ণ-কাব্যদ্বয় সংস্কৃতে লিখিত এবং দুষ্প্রাপ্য তথ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহারা প্রথম শ্রেণীর কাব্যের সমকক্ষ হইতে পারে না। ইহারা সুদূর দক্ষিণ ভারতে উৎপন্ন। তামিল বৈষ্ণব-কবি আলোয়ারগণের সঙ্গীতে কৃষ্ণ-ভক্তি প্রকটিত। ভাগবতোক্ত কৃষ্ণ-চরিত্রই আলোয়ারগণ গ্রহণ করিয়াছেন। তামিল আলোয়ার বিষ্ণুচিত্ত কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-লীলা ভক্তিভরে বর্ণিত। তাঁহার পালিতা কন্যা অণ্ডাল স্বরচিত 'তিরুঁপ্পবৈ' নামক তামিল গ্রন্থে বৃন্দাবনে গোপাল কৃষ্ণের মনোহর চিত্র দিয়াছেন। উহাতে মাত্র ত্রিশটী শ্লোক আছে। উক্ত ভক্তি-কাব্য সম্বন্ধে দক্ষিণ ভারতে এই প্রবাদ প্রচলিত যে, পৃথ্বী দেবী সেই ব্যক্তির ভার বৃথা বহন করেন যে ক্ষুদ্র তিরুপ্পবৈ কাব্য পড়ে নাই। অণ্ডালের 'নাচিয়ার তিরুমোজী' গ্রন্থে যে সকল সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে তৎসমুদয় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রচিত। মৎপ্রণীত 'সাধিকামালা' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে অণ্ডালের প্রচুর পরিচয় প্রদত্ত।

রাজা কুলশখর আর এক প্রসিদ্ধ আলোয়ার ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শৈশব

সম্বন্ধে তাঁহার কতিপয় ভাব-গম্ভীর কবিতা আছে। তন্মধ্যে একটী কবিতায় দেবকীর বিলাপ চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণিত। দেবকীর পরিতাপ এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের গর্ভধারিণী হইয়াও দুর্ভাগ্যবশে মাতৃত্বের আনন্দ হইতে বঞ্চিতা। কুলশেখরের 'মুকুন্দমালা স্তোত্র' সংস্কৃতে রচিত ও বাইশ শ্লোকে সমাপ্ত। কুলশেখরের কৃষ্ণ-ভক্তি সুগভীর। তৎরচিত মুকুন্দমালা স্তোত্রের সপ্তম শ্লোকে আছে—

নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যৎভ.ব্যং তৎভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুসারৈ।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
তৎপাদাম্বুজ-যুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

আর এক আলোয়ার তিরু মঙ্গায়ী 'সদ্গোপ' নামে পরিচিত। তিনি অসংখ্য কবিতার রচয়িতা। তাঁহার অধিকাংশ কবিতায় কৃষ্ণ-চরিত্র ও কৃষ্ণ-ভক্তি বিবৃত। দ্বাদশ আলোয়ার সকলেই কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যামুনাচার্য্যের প্রপিতা নাথমুনি আলোয়ারদের চার হাজারতামিল স্তোত্র সংগ্রহ করিয়া ছিলেন।

ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও রাসলীলাদি সবিস্তারে বিবৃত। শ্রীমদ্ভাগবতের মত সংস্কৃত ধর্ম কাব্য আর নাই। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ইহা পরবর্তী যুগে রচিত এবং ইহার রচনা কাল একাদশ শতকের পূর্বে নহে। সর্বপ্রথম রামানুজের গ্রন্থাবলীতে ইহার উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। ইহা বৃন্দাবনবিহারী বংশীধারীর মনোহর লীলানাট্যের অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ। ভাগবত-মাহাত্ম্যে আছে, "ইহা নিগম-কল্পতরুর, বেদবৃক্ষের গলিত ফল। এই সুরসাল সুপক্ক ও সুমিষ্ট ফল শুকদেবের মুখে অমৃত দ্রবসংযুত হইয়াছে। ইহা রসের আলয়, ভক্তির উৎস এবং পানযোগ্য।" ফল আবার পানীয় হয় কিরূপে? কিন্তু ভাগবত-ফল পানযোগ্য। কারণ, অন্য ফলের ন্যায় ইহাতে আঁটি ও খোসা নাই। ইহা শুধু অমৃত রসে পরিপূর্ণ। ভাগবতের উপমাও অনুপম। দশম স্কন্ধোক্ত রাস-পঞ্চাধ্যায়ের প্রারম্ভে পূর্ণচন্দ্রের বর্ণনা

অতি সুন্দর। পূর্ব গগন ভালে পূর্ণচন্দ্রোদয় কিরূপ? সুদীর্ঘ প্রবাসের পর প্রিয় পতি যখন গৃহে প্রত্যাগত হন বিরহ-বিধুরা প্রিয়া প্রিয় পতির গণ্ডযুগলে কুঙ্কুম রঞ্জিত করেন। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, ভাগবত সর্বোত্তম লোকপ্রিয় সংস্কৃত ধর্মকাব্য।

বাংলার ভক্ত-কবি জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক সংস্কৃত কাব্য। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের জন্মস্থান। মাঘী সংক্রান্তিতে প্রত্যেক বৎসর তথায় মেলা হয়। স্যার এডুইন আরনল্ড সত্যই বলিয়াছেন যে, 'গীত-গোবিন্দ' সংস্কৃত কাব্যাবলীর চূড়ামণি। জয়দেবের ছন্দ-মাধুর্য্য ও কাব্য-প্রতিভা ইহাতে সমান ভাবে সম্মিলিত। জয়দেব ভগবান্‌শ্রীকৃষ্ণের এই বর্ণনা দিয়াছেন—

চন্দন-চর্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালিন্।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডযুগস্মিত-শালিন্॥

লীলাশুকের 'শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত' আর একটী অমূল্য সংস্কৃত কাব্য। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও বাল্যলীলা মধুর ছন্দে রচিত। ইহাতে রাধিকা ও গোপিকাগণের কার্য্যাবলী প্রধানতঃ বিবৃত। শ্রীকৃষ্ণ পালিতা মাতা যশোদার সহিত শৈশবে যে মধুর লীলা করিতেন তাহা লীলাশুকের লেখনীতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতে'র একটী শ্লোকে আছে—

মাতঃ কিং যদুনাথ দেহি চষকং, কিং তেন পাতুং পয়ঃ।
তন্নাস্ত্যদ্য কদাস্তি বা নিশি নিশা, কাবান্ধকারোদয়ঃ॥
আমীল্যাক্ষিযুগং নিশাপ্যুপগতা, দেহীতি মাতুর্মুহুঃ
বক্ষোজাংশুককর্ষণোদ্যতকরঃ কৃষ্ণঃ সঃ পুণাতু নঃ॥

অনুবাদ—শিশু কৃষ্ণ যশোদাকে ডাকিলেন, মা। উত্তর—কি বাবা যদুনাথ? কৃষ্ণ—পাত্রটি আমাকে দাও। মাতা—কি জন্য? প্রশ্ন—দুগ্ধপানের জন্য? উত্তর—এখন না। প্রশ্ন—তবে কখন? উত্তর—রাত্রে। প্রশ্ন—রাত্র কি? উত্তর—যখন অন্ধকার উদিত হয়। তখন শিশুকৃষ্ণ চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিয়া বলিলেন, 'রাত্রি হয়েছে, এখন দাও মা।' এই বলিয়া তিনি অনবরত

মাতৃবক্ষের বস্ত্র টানিতে লাগিলেন। তিনি আমাদের রক্ষা করুন। ইহাতে এই ইঙ্গিত প্রদত্ত যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যাতব্য বা বেদিতব্য নহে। অর্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাতে এই ইঙ্গিত প্রযোজ্য। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের দ্রষ্টা কেবল অর্জুন নহেন। সকল ভক্ত-সাধকই সাধনার সমাপ্তিতে উক্ত দর্শন লাভে ধন্য হন। শুধু রাধিকা প্রমুখ গোপিকাগণের সহিত যে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছিলেন তাহা নহে। রাসলীলার যাথার্থ প্রেমমূলক ক্রীড়া। তাহা ভক্ত-ভগবানের মধ্যে অনন্ত কাল ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। নিত্য রাস সারা বিশ্ব ব্যাপিয়া যুগে যুগে চলিতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের কিঞ্চিৎ পূর্বে বাংলায় জয়দেব এবং মিথিলায় বিদ্যাপতি আবির্ভূত হইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অপূর্ব সঙ্গীতে প্রচার করেন। ডাঃ জে. ই. কার্পেণ্টার বলেন, "প্রেমের উদয় ও বাণী, প্রিয়-প্রিয়ার মিলন ও বিদায় এবং মিলনানন্দ ও বিরহবেদনা বর্ণনায় তাঁহারা সমস্ত শিল্প-প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছেন। আকাশ অনন্তের উৎকৃষ্ট প্রতীক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে 'নবীন-মেঘ-সন্নিভ' বলা হয়। কৃষ্ণভক্তের নিকট বৃন্দাবন মানচিত্রে অঙ্কিত যমুনা-পুলিনস্থ গ্রামমাত্র নহে। ইহা ভক্ত-হৃদয় বা মানব মন, যথায় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য প্রেমলীলা ও ভক্তের সহিত প্রেমালাপ করেন।" বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং রাজার নিকট 'অভিনব জয়দেব' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার ও মৃত্যু হয় যথাক্রমে ২৪১ এবং ৩২৯ লক্ষ্মণ সম্বতে। বাঁকুড়া জেলার ছাৎনা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৩২৫ শকে চণ্ডীদাস ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতা দুর্গাদাস বাগচী বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। চণ্ডীদাস বিশালাক্ষী দেবীর পূজারী ছিলেন এবং মন্দির-দাসী রজকিনী রামমণির সহিত মধুর ভাব সাধন করেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য নিধি। ১৩৯৯ শকে চণ্ডীদাস বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করেন। উক্ত তীর্থে তাঁহার সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান।

রাজস্থানের মীরাবাই, আগ্রার অন্ধ কবি সুরদাস, মহারাষ্ট্রের নামদেব ও তুকারাম, গুজরাটের নরসিং মেহতা এবং আসামের শঙ্করদেব প্রভৃতি ভক্ত কবি স্ব স্ব প্রদেশীয় সাহিত্যে কৃষ্ণ-লীলা প্রচার করেন। মীরবাইর কৃষ্ণ-সঙ্গীত মধুর রসের উৎস। মীরাবাই ঊনবিংশ শতকের পূর্বে ভারতের নারী-কবিরূপে প্রখ্যাত। সুরদাসের 'সুরসাগরে' মথুরায় আগমন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত। আসামের ধর্মগুরু শঙ্করদেব এবং তৎসম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট **আসামীয় সাহিত্যে** শ্রীকৃষ্ণের স্থান সর্বোচ্চ। তৎপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরসমূহে কৃষ্ণ-মূর্তির পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগ্রন্থ ও বাণীরূপ ভাগবৎ পুরাণ সচন্দন পুষ্পে পূজিত হয়। শংকরদেবের 'উদ্ধব-সংবাদ', 'কীর্তন', 'ভাগবৎ পুরাণ', 'রুক্মিণী হরণ', 'অনাদি পতন', 'গুণমালা', 'কালীয় দমন', 'কেলী গোপাল', 'পত্নী প্রসাদ' ও 'পারিজাত হরণ' প্রভৃতি আসামীয়া গ্রন্থাবলী অপূর্ব ও অমূল্য কৃষ্ণ-সাহিত্য। ভাগবতের দশম স্কন্ধের সারাংশ 'উদ্ধব-সংবাদে' প্রদত্ত। কীর্তন গ্রন্থে প্রধানতঃ কৃষ্ণ চরিত্র সুরযুক্ত সঙ্গীতে রচিত। 'ভাগবৎ পুরাণে' চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম ও নবম স্কন্ধ-চতুষ্টয় ব্যতীত অবশিষ্ট অষ্ট স্কন্ধ আসামীয় পদ্যে লিখিত। দ্বারকারাজ কৃষ্ণের সহিত রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর সহিত বিবাহ 'রুক্মিণী হরণ' গ্রন্থে বিবৃত। 'অনাদি পতন' গ্রন্থে ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ অবলম্বনে সৃষ্টি-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত। 'গুণমালা' গ্রন্থে শ্রীমদ্‌ভাগবতের সংক্ষিপ্তসার প্রাঞ্জল আসামীয় ভাষায় লিখিত। শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবও আসামীয় ভাষায় কৃষ্ণসাহিত্যের অমর স্রষ্টা।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যবৃন্দ এবং তৎসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব কবিগণ কর্তৃক রচিত কৃষ্ণ-সাহিত্য ও কৃষ্ণ-সঙ্গীত ভাবে ও ভাষায় অতুলনীয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'বিদগ্ধ মাধব' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং শ্রীজীব গোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভ' সংস্কৃতে রচিত। এই সকল গ্রন্থ কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনায় পর্য্যবসিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও লোচনদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ কর্তৃক বাংলায় কৃষ্ণ-সাহিত্য সৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলা

ভাষার অমূল্য সম্পদ্। কাশীরাম দাসের বাংলা মহাভারত পয়ার ছন্দে এবং বঙ্গদেশে কৃষ্ণলীলা প্রচারার্থ সৃষ্ট। উক্ত মহাভারতে আছে—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কাশীরাম দাস কাটোয়ায় আবির্ভূত হন। কাটোয়া সহরের একটি হাই স্কুল তাঁহার নামে স্থাপিত হইয়াছে। উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাতেও মহাভারতের অনুবাদ পাওয়া যায়।

গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের লেখা হইতে জানা যায়, কৃষ্ণপূজা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতীয় জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। ডাক্তার কীথ নির্দেশ করেন, কৃষ্ণাখ্যান জৈনগণ কর্তৃক গৃহীত এবং কৃষ্ণজন্ম অনুসারে মহাবীরের জন্ম-বৃত্তান্ত লিখিত। ডাক্তার ম্যাকনিকল বলেন, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা হইতে মহাবীর সম্প্রদায় গণতন্ত্র ও বিশ্বপ্রেম শিক্ষা করিয়াছেন। ফরাসী মনীষী সেনার্টের মতে বৌদ্ধ ধর্মে কৃষ্ণপ্রভাব প্রবলভাবে সক্রিয় হইয়াছিল। বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ ভগবদ্গীতার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত। সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' গীতার নিকট ঘনিষ্ঠভাবে ঋণী। ভগিনী নিবেদিতা বলেন, "কৃষ্ণ ভাব ও কৃষ্ণনাম হিন্দুজাতির মজ্জাগত হইয়াছে। গোপাল কৃষ্ণের মধুর লীলা হিন্দু নারীগণের নিকট অতি প্রিয়। কন্যাকুমারী হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতীয় ধর্মের অস্থি-মাংসে কৃষ্ণভাব প্রবিষ্ট। কৃষ্ণের বাণীরূপ গীতার মত সম্পূর্ণ, সংক্ষিপ্ত ও সুমহৎ ধর্মগ্রন্থ জগতে আর নাই। কৃষ্ণপূজা ব্যতীত কোন ধর্ম ভারতে স্থান পাইবে না"।

**সমাপ্ত**

# —স্বামী জগদীশ্বরানন্দের—

## কয়েকখানি পুস্তক সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রের অভিমত

১। কিশোর গীতা—১২৫ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

(ক) উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাসিক 'বিশ্ববাণী'র ১৩৫৮ কার্তিক সংখ্যায় নিম্নোক্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়।—

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ সম্পাদিত ও অনুদিত ভগবদ্গীতা ইতিপূর্বেই ধর্মবিশ্বাসী ও শাস্ত্রানুরাগী পাঠকদের মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অল্পবিস্তর ব্যুৎপত্তি না থাকিলে পাঠকদের মধ্যে উহার মর্মভাব বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ কিশোর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে উহার ভাব গ্রহণ আরও কঠিন। সেইজন্য গীতার ভাবরাশিকে কিশোর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার আরও সহজ সরল ভাষায় কয়েকটী অধ্যায়ে গীতার বিভিন্ন দিক ও তত্ত্বকে ব্যাখ্যান করিয়াছেন। এই বইখানির বিভিন্ন অধ্যায় নির্বাচনে ও গীতার এক একটি ভাবকে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করার ব্যাপারে সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের একটী অভিনব পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এই সমস্ত ব্যাখ্যানগুলি সহজ, সরল ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। শুধু বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই নয়—প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও যাঁহারা গীতার ভাবরাশি জানিবার জন্য উৎসুক, অথচ ব্যাপক অধ্যয়নের সুযোগ সুবিধা নাই—তাহাদের নিকট বইখানি বিশেষ সহায়ক হইবে। বইখানি ধর্মানুরাগী পাঠক সমাজে প্রশংসনীয় হইবে।

(খ) কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ১৯৫১ খ্রীঃ ৭ই অক্টোবর রবিবার উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

The Gita contains the essence of Hinduism ; and its teaching, if it can be impressed on young minds, will pay dividend hundred-fold in the formation of character and rich spiritual life afterwards. The problem is how to do it. It is only Swami Jagadiswarananda who can do it and he has done it. The great little book has impressed us very much. We hope, the school-authorities even in our secular state will prescibe this as an additional reading book.

(গ) কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরাজি দৈনিক 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ১৯:১ খ্রীঃ উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

Swami Jagadiswarananda of Belur Math believes that spiritual education should begin early. He therefore unfolds to the young mind the essential teachings of the Gita. He has made every attempt to make his interpretation as simple as possible. The volume should certainly have a warm welcome from our youths and adults as well.

(ঘ) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার মাসিক 'বাংলার শিক্ষক' এর ১৩।৮ ভাদ্র সংখ্যায় নিম্নোক্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়।—

গ্রন্থকার বেলুড় মঠের জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী। ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি উনিশ বিশ খানি গ্রন্থের রচয়িতা। তদনূদিত গীতার বঙ্গানুবাদ এখন পঞ্চম সংস্করণে চলিতেছে। এই পাঁচ সংস্করণে উক্ত জনপ্রিয় গীতার একচল্লিশ হাজার কপি মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে মূল শ্লোকের সহিত অন্বয়-মুখে শব্দার্থ, অনুবাদ ও পাদটীকাদি থাকায় উহা হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী হয় নাই। আলোচ্য পুস্তকটী প্রধানতঃ কিশোর-কিশোরীদের জন্য লিখিত।

ইহাতে সমগ্র গীতার সারমর্ম গীতার অধ্যায় অনুসারে গল্পচ্ছলে বিবৃত। যে অধ্যায়ের যেটী প্রধান বিষয় তদনুসারে সেই অধ্যায়ের নামকরণ হইয়াছে। প্রাঞ্জলতার অনুরোধে ও মূল গীতার ভাব ও ভাষা হইতে ইহা বেশী দূরে যায় নাই। মূল গীতার সহিত কিশোর-কিশোরীদের পরিচিত করিবার জন্য ইহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কয়েকটি শ্লোক অনুবাদ সহ উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত বলিয়া পুস্তকের প্রারম্ভে উক্ত মহাকাব্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত। স্বদেশে ও বিদেশে এই প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ কিরূপে সমাদৃত হইয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস 'গীতার মহিমা' শীর্ষক অধ্যায়ে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে গীতা ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সারগর্ভ উক্তিনিচয় সংগৃহীত হইয়া একটী অতিরিক্ত অধ্যায়রূপে প্রকাশিত। জটিল তত্ত্বকে সহজবোধ্য করিবার জন্য কোথাও কোথাও শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যানের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। উপনিষৎ ও ভাগবতাদি প্রসিদ্ধ শাস্ত্র হইতে বাক্যোদ্ধারপূর্বক গীতার সহিত উহাদের নিবিড় সংযোগ প্রদর্শিত।

মূল গীতার উপক্রমণিকারূপে এই গীতা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছোটদের জন্য বাজারে যে দুইটী গীতা দেখা যায় তদপেক্ষা ইহা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। হাই স্কুলের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে উহা দ্রুত পঠনের বিশেষ উপযোগী। গীতোক্ত তত্ত্ব ও তথ্যের অপূর্ব সমাবেশ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে দর্শনীয়। গীতা-ধর্মের প্রচারোদ্দেশ্যে উহা নিঃসন্দেহে বিশেষ সহায়ক হইবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত হইলেও উহা পাঠে বয়স্কগণ ও বয়স্কাগণও উপকৃত হইবেন। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ-পটে পার্থ-সারথী এবং গ্রন্থ-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ চিত্রিত।

(ঙ) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'হিমাদ্রি' ১১ই ভাদ্র, ১৩৬০ (২৮শে আগষ্ট, ১৯৫৩) শুক্রবার লিখিয়াছেন—

"গীতা ভারতীয় অধ্যাত্ম জ্ঞানের অমৃত ভাণ্ড। স্বয়ং পুরুষোত্তম বাসুদেব ইহার বক্তা এবং দ্বাপরের শ্রেষ্ঠতম বীর অমিত ক্ষাত্রতেজসম্পন্ন কৃষ্ণসখা অর্জুন ইহার শ্রোতা। সংস্কৃত শ্লোকের দুর্বোধ্য আবরণের জন্য বর্তমান

কালের কিশোর-কিশোরীর পক্ষে এই অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করা দুরূহ হয়। অধ্যাত্ম সাহিত্যের প্রবীণ লেখক স্বামী জগদীশ্বরানন্দের প্রাঞ্জল গ্রন্থখানিকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। স্বাধীন বাংলার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইবে। জটিল বিষয়-বস্তুটী প্রধানতঃ কথোপকথন ও উপাখ্যান বর্ণনার ভঙ্গীতে পরিবেশিত হইয়াছে। মনোরম ভঙ্গীতে ও সরল বাংলায় রচিত হওয়াতে গীতার প্রাথমিক পরিচয় জ্ঞাপক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আকর্ষণীয় হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

২। **শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রসঙ্গ**—পৃষ্ঠা ২২০, মূল্য ২।০ আনা।

উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে কোন রবিবার নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়—

"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ইত্যাদি মহাপুরুষগণের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, কথোপকথন, পত্র এবং বাণী এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলি পূর্বে কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণ এই মহাপুরুষগণের জীবনের ঘটনা এবং বাণী পাঠ করিয়া শান্তি পাইবেন এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসাহিত্যে এই পুস্তকখানি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

৩। **স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভে ব্রহ্মচর্য্য**—১২০ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাসিক 'প্রবর্তক' ১৩৬০ আশ্বিন সংখ্যায় লিখিয়াছেন—

"আলোচ্য পুস্তকে শারীর বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রাদির আলোকে ব্রহ্মচর্য্য-তত্ত্ব নানা ভাবে আলোচিত। ব্রহ্মচর্য্য-বিরোধী অভিমত সকল উদ্ধৃত করিয়া সেইগুলি গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ডাক্তারগণের মন্তব্য দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। গ্রন্থে বর্ণিত বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্বন্ধে সক্রেটিসের কথোপকথন বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার সরল উপায় গুলিও গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য-প্রশস্তিতে দেশ-বিদেশের

মণীষীগণের মন্তব্য উদ্ধৃত। ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে অন্যান্য পুস্তকের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, তথ্যপূর্ণ সাহিত্যবং ইহা সুখপাঠ্য। নিয়ম-কানুনের জটিলতা দ্বারা ইহাকে দুর্বোধ্য করা হয় নাই।

অন্তিম অধ্যায়ে কতিপয় স্বাস্থ্যকর অভ্যাস লিখিত। সেগুলি পালন করিলে শরীর ধীরে ধীরে নীরোগ ও সুস্থ হয়। পরিশিষ্টে 'মন ও স্বাস্থ্য' শীর্ষক সুদীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক আলোচনাটী তথ্যপূর্ণ। পুস্তকের প্রথমে 'গ্রন্থকার ও গ্রন্থমর্ম' শীর্ষক রচনাটী পড়িলে বোঝা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ প্রচারই গ্রন্থকারের জীবন-ব্রত। 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দের সরল অর্থ বীর্য্যধারণ। শরীরস্থ এই সার পদার্থকে যতই ধারণ করা যায় ততই স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ হয়। আধুনিক বঙ্গসমাজে অনৈতিকতার স্রোত প্রবহমান এবং প্রাচীন আদর্শের প্রতি অবহেলাও ব্যাপক। দেশ, জাতি ও সমাজের সংকটপূর্ণ বর্তমান্ সময়ে এই বলপ্রদ স্বাস্থ্যপ্রদ 'মৃতসঞ্জীবনী' তুল্য গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট রহিয়াছে। গ্রন্থখানি বাংলার তরুণ সমাজে সমাদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

৪। **স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত**—১০৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা। উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাসিক 'বিশ্ববাণী' ১৩৬০ শ্রাবণ সংখ্যায় নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন :—

যে সমস্ত অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষের বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মান্দোলনের ফলে সমাজ ও জাতির মধ্যে নূতন প্রাণের ও নূতন গতির সঞ্চার হয় তাঁহাদের জীবন; চিন্তাধারা ও কর্মসাধনার যে কোন দিক দিয়াই যথার্থ বিচারের সহিত আলোচনা করা হউক না কেন, তাহাতে জিজ্ঞাসু পাঠক সমাজ অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও উপকৃত ও আনন্দিত হয়। বর্তমান পুস্তকে নব্য ভারতের অন্যতম স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-কথা এবং ভারতের জাতীয় অগ্রগতির ব্যাপারে স্বামিজীর নানাবিধ অবদান সম্বন্ধে গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ স্বামিজীর জীবন-বাণী ও কর্মসাধনা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় যে সমস্ত পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেই গুলির মধ্যে স্বামিজীর জীবন ও অবদান-রাশিকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখাইবার শক্তির শোচনীয় অভাবই

দেখা যায়। বর্তমান পুস্তকে লেখক অবশ্য সেই গতানুগতিক, মামুলী ও বিশেষত্বহীন আলোচনার পথে যান নাই। তিনি স্বামিজীর জীবন ও চিন্তাধারাকে নূতন ভাবে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সেই চেষ্টা এই গ্রন্থে অনেকাংশে সফল হইয়াছে। স্বল্প পরিসরে লিখিত হইলেও তাঁহার এই বইখানি হইতে স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। বইখানির শেষ দিকে স্বামিজীর কয়েকটী নির্বাচিত উক্তি সংকলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পাঠকেরা পূজ্যপাদ স্বামিজীর ভাবধারা সম্বন্ধে একটী আভাস পাইবেন।

৫। **Girish Ghose and His Dramas**—১৬৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩৲ টাকা। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরাজি মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯৪৯ নভেম্বর সংখ্যায় উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পরিচয় বাহির হয়।—

This is an outline of the life and work of one of the most extra-ordinary personalities the world has produced in the last century. Girish Ghose, the master poet-dramatist of Bengal, was a man of most varied and apparently contradictory experiences in the world. Commanding respect and admiration from the great ones in all fields, from East and West alike, he was as the author puts it was indifferent and assuming, idle and energetic, patient and impatient, brave and cowardly, proud and humble, furious and forgetting, discriminating and sentimental, showy and modest, beleiving and doubting, religious and worldly, godly and demoniac, passionate and dispassionate, equally moved by good and evil, fond of self-effort and at the same time dependent on divine grace. (p. 11)

Girish Ghose was undoubtedly a versatile genius; for his productions as well as his representations are fascinating. His unmatched power of reproducing

characters was the result of a deep knowledge of human psychology intuitive and experienced.

A great part of the book is dedicated to a lucid comparative study of Ghose's personality and work, and of those of the very greatest in the world's literary sphere. Shakespeare, Goethe and other giants of this colibre are elaborately dealt with. In comparing Ghose's works with those of some western masters of the pen, the author goes however too far. The rating of Ghose's baffoons, masterpieces though they certainly are, over the Shakespearean ones, seems to us abit improper and also anachronistic, as almost four centuries lie between these two dramatists. We wonder, whether Elizabathean audiences would have appreciated the nineteenth century baffoonery. Further the author deplores some of this western colleagues for dwelling on corrupt and immoral ways and social habits of their countries in a naturalistic manner. Crude though those depictions may seem their creators definitely meant to exhibit them as a deterrent, we donot surmise that Ibsen meant to propagandize incest in his **Ghosts.**

The magical transformation of the atheist into a drofound mystic, as a sequel to his contact with the Saint of Dakhsineswara finds an able description in this volume.

Another fact is the almost incredible productivity of Ghose. Seven hundred characters, all of them unique and unlike range from the prostitute to the prophet in eighty dramas. Nearly a thousand songs have been written by Ghose. Besides, he has rendered Shakespeare's **Macbeth** into Bengali in a masterful way, and has also

displayed his erudition in many other fields. Ghose's best dramas, Vilvamangal and Tapobal, have been dealt with in extenso.

An appendix gives us valuable clues of a comparative and more general kind closely connected with the subject of this book.

৬। **দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ**—১৯০ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

(ক) কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাসিক 'বিশ্ববাণী' ১৩৬০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

এই বইখানিতে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী পুণ্যশীলা রাণী রাসমণি, তাঁহার সুযোগ্য জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস এবং তাঁহাদের উভয়ের জীবন সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১২৬২—১২৯১ সাল পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই স্থানেই তাঁহার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছে। এই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী এবং তৎসংলগ্ন পঞ্চবটী তপোবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনের ক্রমিক অভিব্যক্তি, তাঁহার সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ ও নরেন্দ্রাদি শিষ্যের সঙ্গে জগদ্গুরুরূপে লীলার অসংখ্য ঘটনার জন্য আজ একটি বিশ্ব তীর্থে পরিণত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই প্রধান লীলাস্থান রাণী রাসমণির দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মহীয়সী ভক্তিমতী ও বহুবিধ জনহিতকর কর্মের অনুষ্ঠানকারিণী নারীর পুণ্য জীবন তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়কে অধিকার করিয়া আছে। রাণী রাসমণি এবং তাঁহার সুযোগ্য জামাতা ভক্তবীর মথুরানাথের আগ্রহের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার এই লীলাস্থলে বহু বৎসর কাল বিরাজ করিয়াছিলেন।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ এই গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও সেখানে তাঁহার বহু বৎসর অবস্থান প্রসঙ্গে রাণী রাসমণির ও মথুরানাথের

suppress, the symbols of evil forces counteracting that of the Divine. It is widely believed by the Hindus the chanting of the hymns on the Chandi develops in man power to resist the evils and calamities of the world. The book itself forms a part of the larger book called the Markandeya Purana.

The present volume contains original sanskrit hymns in Devanagari script with English translation of the text. The author has attempted to give in his book literal English rendering of the original Sanskrit with the hope that it will help English-speaking readers in entering into the original spirit of the sacred book. The English translation of the Text as a whole reads clear, simple and stimulating. Indians, as have poor knowledge of Sanskrit, may be benifitted by this volume. This edition of the Chandi in English should receive the attention of all it deserves.

---